ওঁ ষট্ শ্রীমদ্ গুরুবে নমঃ

ক্রম-বিকাশের পথে—

(তৃতীয় ভাগ)

গীতার পুরুষোত্তম।

(ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়

শক্তি অংশ।

ব্রহ্মচারী—সত্যানন্দ

———:*:———

প্রকাশক—স্বামী আত্মানন্দজী

প্রধান অধ্যাপক, শরৎকুমারী সংস্কৃত বিদ্যাশ্রম।

৬নং গোদৌলিয়া, বেনারস সিটী।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, কালের্গতাব্দা ৫০৩৭

মূল্য ১৲

(অর্দ্ধ অংশের মূল্য ॥৹

পাঠকগণের প্রতি কয়েকটী কথা।

আলোচিত গ্রন্থে মানুষ ও কর্ম্মের স্তরগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে ভূমিকা পাঠকগণের সুবিধার জন্য বলা যাইতেছে। আমরা গ্রন্থে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি নামক ৫টী স্তরে মানুষ, তাঁহাদের চরিত্র এবং কর্ম্ম বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি পাঠকগণ নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধব-গণের চরিত্র বিশ্লেষণে উহা প্রয়োগ করিলে এই বিজ্ঞান যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য ইহা বুঝিতে পারিবেন। কোন বিজ্ঞানই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ ভিন্ন সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুর জ্ঞান সম্যক উৎকর্ষ লাভ করে না। পাঠকগণ মনে রাখিবেন বিজ্ঞান কোন সাহিত্য গ্রন্থ নহে, বিজ্ঞান কোন মতবাদ নহে বিজ্ঞান কোন বিশ্বাসবাদও (Faith) নহে সেইজন্য বিজ্ঞানকে মানুষ আপন কর্ম্মক্ষেত্রে যত বেশী প্রয়োগ করিবে বিজ্ঞান সেই মানুষের নিকট তত স্পষ্ট প্রকাশিত হইবে।

মনোবিজ্ঞানের প্রথম প্রয়োগ ক্ষেত্র নিজের চরিত্র। নিজের চরিত্রে কোন্ স্তরের চরিত্রের সহিত বেশী মিল হয় উহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে প্রথম। পরে নিজের পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি, আত্মীয়, বন্ধু, শিক্ষক, নেতা, গুরু, শিষ্য, ছাত্র প্রত্যেকের চরিত্রে ইহার কোন স্তরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য খাপ খায় উহা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, কিছু দিন এ ভাবে (৫।৭ দিন) এ ভাবে চেষ্টা করিবার পর দেখিতে পাইবেন এক এক জন মানুষের চরিত্র এক একটী স্তরের সহিত মিলিয়া যাইতেছে, ইহাতে নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি পরিমার্জিত হইতে থাকিবে এবং নিজের যদি উন্নত লক্ষ্য থাকে তবে নিজের চরিত্রও দিন দিন উন্নতির দিকে চলিতে থাকিবে।

যাঁহারা দেশ এবং সমাজের জন্য ভাবেন তাঁহারা নেতা ও সংবাদ পত্র সেবিগণের লেখা বা বক্তৃতা গুলি এই বিজ্ঞানে ফেলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। শীঘ্রই রাজনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রে কাহার কিরূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উহা বুঝিতে পরিবেন। স্তরে ফেলিয়া বিচার করিতে শিক্ষা করিলে কাহার কর্ম্ম-লক্ষ্য কিরূপ এবং ঐ কর্ম্মের পরিণামে সমাজের কি ফল উহা অক্ষরে অক্ষরে বুঝিতে পারিবেন। প্রথম নিজের, পরে নিকটস্থ বন্ধু বান্ধবের এবং পরে দেশের জননায়কদের চিন্তা বিজ্ঞান বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। ২, ৩ মাস এই ভাবে চেষ্টা করিবার পর একজন বুদ্ধিমান লোক রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে এমন জ্ঞানে অভিজ্ঞ হইবেন যে যে কোন কর্ম্মগতির কোথায় পরিণতি উহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

যাঁহারা এই পৃথিবীর বক্ষে যুগান্তরের সূত্রপাত করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই গভীর কর্ম্ম-গতি-বিদ্ পুরুষ ছিলেন। কোন্ কর্ম্মের ফল কতদূর যাইয়া কিরূপ রূপ ধারণ করিবে ইহা যাঁহারা বুঝিতে পারেন না তাঁহারা কিছুতেই সমাজকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন না। এরূপ লক্ষণসম্পন্ন মানুষ যে সমাজের কর্ম্মধার নহেন সেই সমাজ দিন পর দিন দুর্দ্দশার পথেই অগ্রসর হইতে থাকিবে। কোন্ স্তরের কর্ম্মবিজ্ঞান সমাজকে কতটা অগ্রসর করিয়া দিতে সক্ষম এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাষ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মানুষের জীবন লক্ষ্য যে 'আত্মা' এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান লক্ষ্য যে উহার অনুকূল হওয়া প্রয়োজন ইহা বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে কর্ম্মী মাত্রকেই তেজ, অভয়, ত্যাগ আদি দৈবী-সম্পদের ভিত্তি লইয়া চলিতে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণেশ চরিত্রের লক্ষণসম্পন্ন মানুষের লক্ষণ বলা হইয়াছে এ স্তরের মানুষ অন্যায় বিরোধী, ত্যাগী, যুদ্ধপ্রিয়, উদার মনোবৃত্তি

সম্পন্ন, একটু একগুঁয়ে, চরিত্রবান, স্বদেশ প্রেমী, কষ্ট সহিষ্ণু, ন্যায় নিষ্ঠ, দৃঢ়ভাষী, সাহসী জড়বিজ্ঞানে নিষ্ঠাসম্পন্ন হন। ইঁহারা অন্ধবিশ্বাসবাদী হন না। উন্নত বিকাশের পথে এ স্তরের চরিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। বিচারক, ওভারসিয়র, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্, যুবকদের নেতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ স্তরের মানুষ বেশী পাওয়া যাইবে। ইঁহারা কঠোর হৃদয় হন্।

তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্য চরিত্রের মানুষের কথা বলা হইয়াছে। ইহারা প্রেমী, কোমল স্বভাব, হিসিবী প্রকৃতি, মেধাবী, যশস্বী, বিশ্বাসবাদী, ভাব প্রবণ হন। দুইটা বিরুদ্ধ মতের মধ্যে পড়িলে ইঁহারা উভয়েরই প্রিয় হইতে চেষ্টা করেন। লক্ষ্য হইতে আদর্শের দিকে ইঁহাদের লোক বেশী। মেয়েদের মধ্যে এ স্তরের বিকাশ খুব উন্নত বিকাশ জানিতে হইবে। মেয়েতে এ স্তরের বিকাশ থাকিলে দানশীলা হন। স্নেহশীলা মেয়ে মাত্রই এ স্তরের বিকাশ ক্ষেত্র। শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রফেসর, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, চিকিৎসক, রাজদূত, ধর্ম্ম প্রচারক, বক্তা, সংবাদ-পত্রসেবী, পুরোহিত, গায়ক, কবি, সেবাশ্রম, ধর্ম্মী, বৈষ্ণবধর্ম্ম, অহিংসাবাদী, রেলওয়ে কর্ম্মচারী, সরকারী কেরাণী ও জ্যোতিষীগণের মধ্যে এ স্তরের মানুষ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিষ্ণু চরিত্রের মানুষের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদিগকে মোটামুটী তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। (১) আসুরিক বিষ্ণু, (২) দৈবীসম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু ও (৩) অপুষ্ট বিষ্ণু।

(১) ও (২) চরিত্রের বিষ্ণু কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি সম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, গম্ভীর স্বভাব, চক্রী, মনে এবং বাক্যে দুই রকম, কথায় ও কার্য্যে দুই প্রকারের ভাব সম্পন্ন। ইঁহারা স্বভাবতঃ সন্দিগ্ধ চিত্ত হইলেও প্রায়ই কেহ উহা বুঝিতে

পারে না। সংগঠন শক্তি সম্পন্ন, ভোগী চরিত্র। মোটেই আদর্শ বাদী নহেন।

আসুরিক বিষ্ণু (২) নিষ্ঠুর হৃদয়, উৎপীড়ক, শোষক, সুবিধা বাদী।

দৈবীসম্পন্ন-সম্পন্ন বিষ্ণু—কোমল হৃদয়, সমাজ হিতৈষী, দাতা, উদার চরিত্র।

(১) ও (২) বিষ্ণু চরিত্র সম্পন্ন মানুষ রাজা, জমীদার, শাসনকর্ত্তা রাজ প্রতিনিধী, গোয়েন্দা, পুলিস কর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের মধ্যে বেশী পাওয়া যাইবে।

(৩) অপুষ্ট বিষ্ণু কোন বিকাশের স্তর নহে। নিম্নস্তরের শিব ও সুর্য্যাস্তরের মানুষ লোভ ও সঙ্গ প্রভাবে বা আসুরিক রাজশক্তির প্রশ্রয় পাইয়া বিষ্ণু চরিত্র আয়ত্ব করে। ইহারা অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির মানুষ হয়। ইহারা সমাজের সবচেয়ে বেশী ক্ষতির কারণ হয়। নির্লজ্জ, মিথ্যুক, চাটুকার, চাটকার নির্জ্জিত, অত্যন্ত স্বার্থপর। চোর গুণ্ডা ইত্যাদিরা এ স্তরের মানুষ হইয়া থাকে। নিম্নতম পুলিসদের মধ্যে এ স্তরের মানুষের সংখ্যা খুব বেশী পাওয়া যায়। যাহারা অঙ্গ-ভঙ্গী দেখাইয়া বা কথার ভঙ্গী দেখাইয়া ভিক্ষা করে তাহারাও এ স্তরের বিকাশ ক্ষেত্র হইয়া থাকে। এইরূপ লোক ভীক্ষা দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করে ও সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে শিবস্তরের মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শিবস্তরের মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। (১) নিম্নস্তরের শিব (২) উন্নতস্তরের শিব।

উভয় প্রকার শিবস্তরের মানুষই প্রাকৃতিক জীবন প্রিয়। মাঠ, বৃক্ষতল, নদীতট, বনের ধারে ইঁহারা বাস করিতে ভালবাসেন। অনাড়ম্বর জীবন প্রিয়, অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ। অল্পে তুষ্ট। ভবিষ্যতের ভাবনা কম।

নিম্ন শিবস্তরের বিকাশ-সম্পন্ন মানুষ সরল ধর্ম্মে বিশ্বাসী, প্রায়ই প্রেত-উপাসক, মোটেই বুদ্ধিমান নহে। মুটে, মজুর, পেয়াদা, দপ্তরী, চাপ্রাসী, পূজারী, রাঁধুনী, চা ওয়ালা, সাধারণ হোটেল ওয়ালা, মেথর, প্রেস কম্পোজিটার; সহিস, গাড়োয়ান, ঝাড়ুদার প্রভৃতিদের মধ্যে এ স্তরের মানুষ বেশী দেখা যায়।

উন্নত শিবস্তরের বিকাশ সম্পন্ন মানুষ ত্যাগী, যোগী, সাধক, তপস্বী ও ঋষিগণের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৃপ্ত মহাপুরুষ। গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু স্তরের মানুষ হইতে ইঁহারা বুদ্ধিমান কিন্তু এসব স্তরের সম্পদকে তুচ্ছ মনে করেন। বিকাশের পথে মানুষ মাত্রেরই একস্তরে তপস্যার বেগ আসিয়া যায়, যাঁহাদের এই তপঃবেগ অকৃত্রিম তাঁহারাই বনে, জঙ্গলে, নির্জ্জন পাহাড়ে বহু বৎসর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। তপস্যার অকৃত্রিম বেগ-সম্পন্ন মানুষই উন্নত শিবস্তরের বিকাশ-সম্পন্ন জানিতে হইবে। (সূর্য্যস্তরের অনুভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষগণকে কেহ যদি উন্নত শিবস্তরের মহাপুরুষের সমকক্ষ মনে করেন তবে বিচারে ভুল হইবে। উভয়ে বিকাশে, চরিত্রে ও কর্ম্মলক্ষ্যে অনেক ভেদ বিদ্যমান)।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে শক্তিস্তরের বিকাশের কথা বলা হইয়াছে। মহর্ষি এবং রাজর্ষি গণেশ মধ্যে অনেকে এ স্তরের সন্ধান জানিতেন। শ্রীকৃষ্ণ এ স্তরের বিকাশে শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ। যাঁহারা রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহারা এই অধ্যায়টী বহুবার পাঠ করিবেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ই এই পুরুষোত্তম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ে মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হইয়াছে। কর্ম্মিগণ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে কর্ম্মতত্ত্বও ভাল বুঝিতে পারিবেন। সাধক ও কর্ম্মিগণ গণেশ

চরিত্র আয়ত্ত করিতে পারিলে সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব অতিক্রম করিয়া শক্তিস্তরের দিকে অগ্রসর হইতে শক্তিলাভ করিবেন।

এ অধ্যায়ে প্রণবকে ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য আরও কিছু এখানে বলা যাইতেছে। ধ্বনির উত্থানে 'অ' এর তিন মাত্রা, স্থিতিতে 'উ' এর তিন মাত্রা এবং লয়ে 'ম্' এর মাত্রা ধ্বনি সহ জপ করিবার সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে (১১৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। যাঁহারা ইহা হইতেও উন্নত বিজ্ঞানে প্রণব জপ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্ন লিখিত প্রকারে জপ করিবেন।

উত্থানে (মূলাধারে, স্বাধিষ্ঠানে ও মনিপুরে একমাত্রা করিয়া) 'অ' এর তিন মাত্রা (অ-অ-অ) ধ্বনি করিবেন। স্থিতিতে (অনাহতে) 'উ' এর ধ্বনি 'অ' এর দ্বিগুণ মাত্রায় হইবে (উ-উ-উ—উ-উ উ)। লয়ে 'ম্' কারের মাত্রা উত্থানের তিন গুণ দিতে হইবে। লয়েব স্থান বিশুদ্ধাখ্য হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত 'ম্' এর ধ্বনি নয় মাত্রায় হইবে (ম-ম-ম—ম-ম-ম —ম ম-ম)। কুক্কুটের ডাকে লক্ষ্য করিলে এই মাত্রার ভাগ আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। কুক্কুটের ডাকে তিনটী ভাগ আছে। প্রথম ভাগটী হইতে দ্বিতীয় ভাগটীতে দ্বিগুণ মাত্রা হয়। তৃতীয় ভাগটি প্রথম ভাগের তিন গুণ সময় ধরিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। গ্রন্থে 'ওঁ' জপের যে বিজ্ঞান বলা হইয়াছে উহা হইতে এই বিজ্ঞানে প্রণব জপ আরও উন্নত প্রকারের জানিতে হইবে। ইহা শ্রবণ করিতে খুবই মধুর। ইতি—

গ্রন্থকার।

সূচী পত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়ের সূচীপত্র

সূচীপত্র সমাপ্ত

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
/০	১০	বি	বিরাম
১	১ (প্রথম প্যারা)	ঈশ্বরী	ঈশ্বরীয়
২	২৪	শক্তির	শান্তির
৯	৩	দেখিবে	দেখিবে
২২	৩	আবার	আমরা
৫৫	১৯	শক্তির	শান্তির
৫৬	২৫	শান্তিস্তরের	শক্তিস্তরের
৮৫	৪	কইয়া	করিয়া
১৪০	১৯	অ (অ+ই)+৺	অ+(অ+ই)+৺
১৫৫	২	সমষ্টি	সমস্ত
১৫৫	৩	সমষ্টি	সমস্ত
১৫৯	৭	অন্তর্জগৎ	অন্তর্জগৎ
১৬০	১২	ষ্টরে	স্তরে

ওঁ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।

ক্রম-বিকাশের পথে

(গীতার) "পুরুষোত্তম"

বা

পতাকা এবং কর্ম্ম-বিজ্ঞানের ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরীয় শক্তি—দুর্গা

এতক্ষণ আমরা আমাদের অন্তরস্থিত বিভিন্ন শক্তির ঈশ্বরীয় অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়াছি। সেই সব ঈশ্বরীয় শক্তি খণ্ড বা অপূর্ণ। এক শক্তির সহিত সংযোগ লাভে অন্য শক্তির সহিত বিচ্ছেদ করিতে হয়। যদিও এক শক্তি অন্য শক্তিতে লইয়া যাইতে সাহায্য করে, তবুও এক শক্তি যে অন্য শক্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের শক্তি বা ক্রিয়াবিশিষ্ট এবং স্থূল জগতে বা কর্ম্মজগতে উহারা কেমন বিভিন্ন স্বভাবের মানব চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়, তাহা আমরা মোটামুটি বুঝিয়া লইয়াছি। মানুষ যখন যেমন স্তরে আত্ম-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁহার কর্ম্মে, ভাবে এবং বিচারে সেই কেন্দ্র-শক্তির দৃঢ় বিশ্বাস দৃষ্ট হইয়া থাকে। সহজে তাঁহাদিগকে আপন দার্শনিক অবস্থা হইতে বিচলিত করা যায় না। যিনি সত্যই কর্ম্ম এবং অনুভূতির মধ্য দিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি নিম্ন স্তরে দার্শনিক অবস্থায় এবং কর্ম্মে যে দুর্ব্বলতাটুকু আছে তাহা দুই একটি প্রশ্ন দ্বারাই ধরাইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহার দল জমিয়া যায় এবং যশে ও

দলে যাঁহার মোহ আছে তাঁহাব পক্ষে উন্নত স্তরের সত্যকে গ্রহণ করা মোটেই সহজ নহে। তাহা করিতে হইলে তাঁহার দল ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় আছে। মানুষের আত্মবিকাশের পথে এই মোহ এক ভীষণ শত্রু।

কি কর্ম্মী, কি উপাসক, কি জ্ঞানী, প্রত্যেককেই ভোগের ইচ্ছা, মোহ এবং অভিমানকে ত্যাগ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, যদি মানব-কল্যাণ এবং আত্ম-কল্যাণ তাঁহার লক্ষ্য হইয়া থাকে। সত্যই যিনি আত্ম-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তিনি সত্য, প্রেম, শান্তি এবং আসুরিকতার বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তি প্রয়োগের আদর্শ গ্রহণ করিবেন। কর্ম্মীমাত্রই এইরূপে নিজের জীবন-লক্ষ্য স্থির করিবেন। নিজে এই সব দুর্ব্বলতার পরপারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অধীনস্থিত সকলকে এই ভাবে গড়িয়া লইবেন। প্রথম প্রথম নিজেকে গড়িয়া লওয়া যেমন কঠিন মনে হইবে, তেমনি নিজেকে গড়িয়া না লইলে অন্যকে গড়িয়া লওয়া সহজ হইবে না। শক্তি-কেন্দ্রই (বা আত্মার পূর্ণতম অবস্থার কেন্দ্রই) আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণতম বিকশিত অবস্থার কেন্দ্র। অভাবের তাড়না, হারাইবার ভাবনা এবং মৃত্যু বা যন্ত্রণা এখানে নাই। এখানে দাঁড়াইয়া আমরা একদিকে নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টক জীবন লাভ করি আবার অন্যদিকে কর্ম্ম করিবার বিপুল শক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকি। এখানে দাঁড়াইয়া আমরা যেমন দুর্ব্বলতাহীন হই তেমনি দুর্ব্বলতার আড়ালে সুবিধা ভোগ করিবার মত দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলি আমাদিগকে ছাড়িয়া একটু দূরেই অবস্থান করে।

আমরা না বুঝিয়া নিজেদের কর্ম্মশক্তিগুলিকে অন্যায় ভাবে নষ্ট করিয়া থাকি। আমরা অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, হিংসা ও দ্বেষকে আশ্রয় করিয়া নিজেদের স্বাভাবিক শক্তির সহজ অবস্থাকে ভুলিয়া গিয়া, দিনরাতই ব্যস্ত হইয়া থাকি। ভোগের দিকে কাল্পনিক বেগ, মোহ

এবং অভিমানকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের অশান্তি এবং উদ্বেগের কারণগুলি জীবিত থাকে। আমাদের লক্ষ্য কিরূপ অস্বাভাবিক ভাবে অসত্যের ভিত্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছে তাহা সত্যই ভাবিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের জীবন-সংগ্রামের সম্মুখে বেশীর ভাগ অশান্তিই বিষ্ণু-কেন্দ্রের দুর্ব্বলতাগুলিকে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। আমরা বাঁচি খুব বেশী হইলে শত বৎসর মাত্র; কিন্তু আমরা ভাবি ২০০।৫০০ শত পুরুষের কথা। নিজের তৃপ্তি দেখি না, নিজের নিশ্চিন্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবি না, ভাবি সেই সব কল্পনা-জগতের কথা। আমরা ভাবি যে আমাদের ছেলেরা সুখে স্বচ্ছন্দে এবং নিজেদের মধ্যে সংগঠিত ভাবে থাকে, কিন্তু আমরা নিজেরা ভাইয়ে ভাইয়ে মিশিয়া থাকিতে চাহি না। আমাদের ছেলেরা যে আমাদেরই মত একদিন নিজেদের মধ্যে মিশিয়া থাকিতে পারিবে না একথা আমরা বুঝিয়াও যেন বুঝি না। মোহ আমাদের এমনি প্রবল যে যাহা প্রত্যক্ষ সত্য তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য ভাবিয়া কঠোর ভাবে পরিশ্রম করিয়া জীবনী-শক্তি বৃথা ক্ষয় করিয়া ফেলি। আমাদের লক্ষ্য দেশ এবং সমাজে আত্ম-বিকাশ বা কর্ম্ম-বিকাশের অনুকূল না হইয়া মোহের দিকে হইবার দরুণ আমরা নিজেরাই যে প্রতারিত হইতে চলিয়াছি ইহা আমরা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারি। আমাদের এই লক্ষ্য-ভ্রান্তির দরুণ আমাদের সমাজ এবং দেশ দিন দিন অধঃপতনের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। যাহাদের জন্য ভাবিয়া আমরা এইরূপ করিতেছি সেই সন্তান সন্ততিগণই দিন দিন নিরাশ্রয় এবং দরিদ্র হইয়া চলিয়াছে। একটু সময়ের জন্য নিশিন্ত হইতে পারিলে যে কত সুখ তাহা বুঝি, কিন্তু সেই ২০০ শত বৎসর ব্যাপী সুখ-স্বপ্ন আমাদিগকে কিছু-তেই নিশ্চিন্ত হইতে দেয় না। এই মোহ-জালে আবদ্ধ সুখ-স্বপ্ন আমা-দিগকে বর্ত্তমান সুখ হইতে বঞ্চিত করে, আত্মার পূর্ণতম বিকাশের পথে

অগ্রসর হইতে বাধা দেয়; আবার সেই স্বপ্ন-জালে আবদ্ধ হইয়া এই পৃথিবীতে যে সব কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করি তাহাও লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্ম বিকাশের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে।

অভিমানকে (তামসিক অহঙ্কার বা জেদ্‌কে) জীবিত রাখিবার জন্য আমরা এমন সব কার্য্যকলাপের পশ্চাৎ ধাবিত হই যাহার পাকে চক্রে পড়িয়া অন্তর্জগৎ (চিন্তা জগৎ) তো নিষ্পেষিত হয়ই, অধিকন্তু অন্যকেও নিষ্পেষিত হইতে বাধ্য করি। এরূপ মোহ এবং অভিমানের বস্তুতঃ কোন ভিত্তি নাই। ইহা আমাদের পূর্ণ বিকাশের পথকে খর্ব্বই করে। ইহা আমাদের ভাবজগতের (মনোজগতের) এক একটী ঢেউ। ইহাদিগকে বাঁচাইয়া না রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেই স্বাভাবিক শান্তি এবং স্বাভাবিক কর্ম্মের পথ সরল হয়। সমাজের উপরও যে আমাদের দায়িত্ব আছে তাহা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিপালিত হয়। সে দায়িত্বকে পূর্ণ করিবার জন্য আমাদের নূতন করিয়া কর্ম্মের প্রোগ্রাম করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

এইদিকে একদল মানুষ মোহে এবং অভিমানে বদ্ধ হইয়া থাকিবার দরুন তাহাদের দৃষ্টিশক্তির সীমা সঙ্কুচিত বা খুব সামান্য স্থানে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়;—অর্থাৎ তাহাদের চিন্তা জগতের বৃহত্তর পরিধি খর্ব্ব হয়। তাহারা বাস্তবকে আর দেখিতেই পায় না। এই সুযোগে একদল আসুরিক প্রকৃতির লোক এই দুর্ব্বলতার সুবিধাটী হস্তগত করিয়া লয়। আসুরিক প্রকৃতির মানুষও অভিমান এবং মোহবদ্ধ, কিন্তু তাহারা বেশী বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মপ্রিয় হইয়া থাকে। তাহারা নিজেদের প্রয়োজনকে অতি সুন্দরভাবে বুঝিতে পারে। তাহাদের দোষ তাহারা নিজেদের প্রয়োজনকে কেবলই ভোগে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে; মোক্ষের স্থান তাহাদের নীতির লক্ষ্য থাকে না। এদিকে যাহারা কেবলই মোহ

এবং অভিমানবদ্ধ তাহারা নিজেদের চিন্তাটাকে কেবলই কাল্পনিক-জগতে ঘুরাইয়া বেড়ায়। ভোগ যদিও তাহাদের লক্ষ্য, কিন্তু তাহারা নিজেরা মোহান্ধ হইবার দরুণ ভোগকে নিয়মে রাখিতে পারে না। যাহা হউক দেশ এবং সমাজের প্রত্যেক কর্ম্মীই ভোগের কল্পনা, মোহ এবং অভিমানকে নিয়মিত রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

আমরা আত্মার পথে চলিয়াছি। আত্মাকে পূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি। সেই আত্মাতে আমরা প্রতিষ্ঠিত হইব, সেই আত্মার শক্তিকেই অন্তরে জাগাইয়া তুলিব এবং এই বিশ্ব-সংসারে সেই আত্মারই বিকাশ প্রত্যেক মানুষে প্রত্যেক নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করিব। স্ত্রী-পুত্রই আত্মা নহে। আত্মার ব্যাপকত্ব আরও বেশী। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম এবং রাজশক্তি সবই আত্মবিকাশের সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আজ যদি ঐ সবের ভিত্তি নষ্ট হইয়াও গিয়া থাকে, ক্ষতি নাই। আমরা অন্তরস্থিত শক্তির সহায়তায় নিজেদের পথ করিয়া লইব। সত্য, প্রেম, শান্তি এবং আসুরিকতার বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগের অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইতে পারি তবে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিব। মানুষ স্বভাবতঃই আত্ম-বিকাশের পথে চলিয়াছে, যদিও সকলে সে কথা জানে না, কিন্তু কথাটা সত্য। আমরা যেদিন এ পৃথিবী হইতে বিদায় লইব, সেদিন যেন জানিতে পারি বা বুঝিতে পারি এবং এই জগৎও যেন বুঝিতে পারে আত্মাকে বিকাশ করিয়াছি, সঙ্কোচ করি নাই।

এখানে কর্ম্মিগণকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বিষ্ণু-কেন্দ্র পুষ্ট চিন্তা হইতেই মোহ এবং আসুরিকতা আসিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের কোন্ চিন্তা-ধারা কোন্ স্তর হইতে আসিয়াছে তাহা বিচার করা প্রয়োজন। বড়লোক বা নামী লোকের কথা শুনিয়াই বিচলিত হইও না। বিচার করিতে চেষ্টা করিবে এই চিন্তা কোন স্তরের দান।

তাহা হইলেই পথ সহজ হইবে। সব সময়েই শক্তি-কেন্দ্রপুষ্ট চিন্তা-ধারা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে। অনেক ভাল বস্তু বিষ্ণু এবং সূর্য্য-কেন্দ্রপুষ্ট নিয়মে আবরিত আছে। কারণ ভারতে বহুদিন হইতে এই দুইটী কেন্দ্র-পুষ্ট রীতিনীতির প্রাধান্য খুব বেশী। তাই খুব সাবধানে আবরণ ত্যাগ করিয়া মূল গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে, নইলে নিজেই প্রতারিত হইবে। একই দেশ-সেবা, দেব-পূজা, লোক-সেবা, সমাজ সেবা, সাধনা এবং শিক্ষা বিভিন্নকেন্দ্রপুষ্ট মানুষ বা বিভিন্নলক্ষ্যপুষ্ট মানুষ বিভিন্ন প্রকারে দিতে চেষ্টা করিবে। তুমি তোমার লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া তাহা গ্রহণ করিবে, বা ত্যাগ করিয়া নিজের লক্ষ্যের পথ ধরিয়া নিজের কাজ করিয়া চলিবে। সর্ব্বোপরি দুটী কথা মনে রাখিও—কর্ম্ম-হীন হইও না, মৃত্যু ভয়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইও না। আমরা শক্তির কোলে আশ্রয় লইতেছি। এখানে মৃত্যুভয় রূপ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় নাই, কর্ম্মহীনতারও আশ্রয় নাই।

জ্ঞানের অংশ বা কলার কথা পূর্ব্বে (শিব অংশে) আলোচনা করা হইয়াছে। জীব যখন যেমন কলায় অবস্থান করে তখন সেই কলাকেই অন্য কলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে। ইহা সমস্ত জীবের সাধারণ এবং স্বাভাবিক মোহ। এই মোহই তাহাকে সেই কলাস্থিত মোহে আবদ্ধ করিয়া রাখে। আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জীবের স্বভাবে আরও একটী বিশেষত্ব দেখা যায়, তাহা হইল এই যে—কেহই নিজ নিজ বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। (অবশ্যই এই অসন্তুষ্টির ভাব শিব-স্তরের অনুভূতি আসিলে শেষ হইয়া থাকে)। এই অসন্তোষপূর্ণ মনোবৃত্তিই প্রত্যেকের অন্তরে এই প্রমাণ আনিয়া দেয় যে তাহার আরও উন্নত বিকাশের প্রয়োজন আছে। উন্নত কলায় বা স্তরে না আসিলে সে কিছুতেই নিম্ন কলাস্থিত জ্ঞানে এবং শক্তিতে সত্যই কি অভাব বা দুর্ব্বলতাটুকু আছে তাহা বুঝিতে পারিবে না।

শিব অংশে পঞ্চ কোষের কথা বলা হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ, (স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ) পর্য্যন্ত এক হইতে যথাক্রমে চার কলার বিকাশ। উক্ত পঞ্চ কোষের মধ্যে অন্নময় কোষ বৃক্ষে (উদ্ভিজ্জে) এবং প্রাণময় কোষ পশুতে (জরায়ুজে) বেশী পুষ্টিলাভ করিয়াছে। প্রকৃতির কোলে চারকলাপুষ্ট জীবসকল পশুর আকারে জন্মগ্রহণ করে। চারিকলা হইতে কিঞ্চিদধিককলাপুষ্ট জীব মানবাকারে জন্ম গ্রহণ করে। মানুষ যখন পাঁচ কলায় দাঁড়ায় তখন তাহারও আকার (বিশেষ করিয়া মাথার আকার) যে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তাহাও আমরা বিচার সাহায্যে বুঝিতে পারি। কিন্তু তাহার স্বভাবেই সেই পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্বভাবের সংক্ষেপ ইঙ্গিত— নিরভিমানিতা সত্যের গ্রহণ, অন্যায়ের বিরোধিতা এবং বিষয়সঙ্গজনিত বাসনার ত্যাগরূপে ধরা পড়ে। যে কোন মানুষের স্বভাবে ওরূপ বিকাশ আসিয়া গিয়াছে তাহাকেই পাঁচ কলার বিকাশস্থল বলিতে হইবে। যাহা হউক আট কলার বিকাশ পূর্ণ হইলে মানবের স্বভাবে জীবত্বের অভিমান (আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি শূদ্র, আমি চণ্ডাল আমি ইংরেজ, আমি বাঙ্গালী আমি ধনী, আমি দরিদ্র ইত্যাদি ভাব) নষ্ট হইয়া যায়। আর্য্যশাস্ত্রে ইহাকেই জীবন্মুক্তির অবস্থা বলা হইয়াছে। জীবত্বের শেষ এবং শিবত্বের আরম্ভ ৭৷৷০ কলা বিকাশের পরই আরম্ভ হইয়া থাকে। ১৫ কলা পূর্ণ হইলে শিবত্বের পূর্ণাবস্থা হয়। ইহাই পূর্ণ-জ্ঞানের অবস্থা। অর্থাৎ চারি কলার বেশী সবগুলি কলার বিকাশই, মানব শরীরে হইয়া থাকে।

কোন কোন আধুনিক পণ্ডিতের মতে মানুষের পরেও অন্য কোন আকারের জীব মানুষ হইতে উন্নত কলার বিকাশ লইয়া পৃথিবীতে আসিবে। বাস্তবিক তাহা সমর্থন করা যায় না। অন্যান্য জীব হইতে মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিলে এ কথার সুন্দর

প্রমাণ পাওয়া যায়। যে কোন মানুষ চেষ্টা করিলে জ্ঞানের সবগুলি কলার বৈশিষ্ট্যই নিজের চরিত্রে বিকশিত করিতে পারে। এ বিষয়ে মানব মাত্রই স্বাধীন, কিন্তু অন্যান্য জীবে এরূপ কোনই স্বাধীনতা নাই। অন্যান্য জীবে প্রকৃতিপ্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট কলা আপনিই বিকশিত হয়। বাধা দিয়াও সে বিকাশকে আটকান যায় না। মানবেতর জীবে প্রকৃতি-প্রদত্ত বিকাশ-বৈচিত্র্য তাহার চরিত্রে প্রতিভাত হইবেই। একটী কাকের ডিমকে আনিয়া একটা কবুতরের বাসায় কবুতরের ডিমের সহিত রাখিয়া দিলে কাকের ডিমটী ফুটিয়া ছানাটি ক্রমে বড় হইলে কাকের ডাকই ডাকিবে। কোন অজ্ঞাত-শক্তি প্রভাবে কাকের চেষ্টাই শিখিয়া লইবে। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। প্রকৃতি যেন পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছাধীন হইয়া ধরা দিয়া মানুষেরই চেষ্টার অধীন হইয়া পূর্ণ-বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মানুষ ইচ্ছা করিলে সবটাই বিকাশ করিবে। আবার মানুষ যদি ইচ্ছা না করে বা ভুল করে তবে সে কিছুই বিকাশ করিতে পারিবে না। বিকাশের পথে মানবে প্রকৃতিপ্রদত্ত এমন কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য নাই যেরূপ বৈশিষ্ট্য মানবেতর অন্য জীবে রহিয়াছে। মানুষ যেন প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাই মানুষ সঙ্গ, শিক্ষা এবং সাধনা দ্বারা পূর্ণ-কর্ম্মী এবং পূর্ণ জ্ঞানী হইতে পারে, আবার মানব সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া, কুকুর, বিড়াল, ব্যাঘ্র, সংহাদির সমাজে লালিতপালিত হইলে সেইরূপ পশুর চরিত্রই আয়ত্ত করিবে। এরূপ অবস্থায় নিজের ভাষা পর্য্যন্ত সেই পশুর ভাষায় রূপান্তরিত করিবে। মানুষ যদি নিজে ইচ্ছা করে তবে নিজের পূর্ণ জ্ঞানবিকাশের পথে যতই বাধা আসুক না কেন মানুষ তাহাকে অতি সন্তর্পনে অতিক্রম করিবে। যে কোন মানুষে গণেশ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বেশী প্রস্ফুটিত তাহাদের উন্নত বিকাশের পথে কিছুতেই বাধা দিয়া আট্‌কান যায় না।

বাধা তাহাদিগকে বেশী শক্তিশালী করিয়া দিবে। শিক্ষা, সমাজ, গুরু* এবং রাজশক্তি বিপুল শক্তি লইয়া তাহাদের বিকাশের পথে বাধা দিতে আসুক, দেখিবে সকলেই হার মানিয়াছে। মানুষ যদি নিজে ইচ্ছা করে আর মানুষ যদি নিজের দুর্ব্বলতাকে বুঝিতে পারে তবে মানুষের পূর্ণ বিকাশের পথে যতই বাধা আসুক না কেন মানুষ নিজের লক্ষ্যে কৃতকার্য্য হইবে; কারণ প্রকৃতিই মানুষকে ঐ ভাবে গড়িয়াছেন বা প্রসব করিয়াছেন। অন্যান্য জীব সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। অন্যান্য জীবের অন্তরের প্রাকৃতিক বিকাশ-বীজ প্রকৃতিই ফুটাইয়া তুলিবে। মানুষে মনোময়-কোষের বিকাশ হইবার দরুণ এই বৈশিষ্ট্য আসিয়াছে। মানবেতর অন্যান্য জীবে মনোময় কোষ প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাই বিকাশের পথে সেই জীবের নিজের ইচ্ছা-শক্তির কোনই আধিপত্য নাই। বাহিরের সঙ্গ, সমাজ সেই জীবের প্রকৃতিক বিকাশের পথে বাধা দিতেও পারে না। মানুষের বিকাশ মানুষের নিজের অধীন। অন্যান্য জীবের বিকাশ প্রকৃতির অধীন। মানুষের ইচ্ছা-শক্তিকে যদি পশুত্বের সীমার মধ্যে এমনি করিয়া আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায় যাহাতে মানুষ পশুত্ব ভিন্ন অন্য কিছু ধারণা করিতে না পারে, অর্থাৎ মানুষ যদি

* অনেকের ধারণা হইতে পারে গুরু বিকাশে বাধা দিবেন এ কিরূপ কথা? গুরু যদি গুরু-স্তরের মানুষ হন তবে কখনও বাধা দেন না, সাহায্যই করেন। কিন্তু গুরু যদি অনুভূতিতে সূর্য্য এবং বিষ্ণু-কেন্দ্রের সীমা অতিক্রম না করেন তবে বাধা শিষ্যকে সহ্য করিতেই হইবে। গুরু যে কেন্দ্রের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন শিষ্য তাহা হইতে উন্নত স্তরের দিকে অগ্রসর হইবার সময় গুরুদ্বারা প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইবেন। গুরুতে ভক্তির আবরণে মোহ শিষ্যে স্বভাবতঃই আসিয়া যায়; ঐ মোহ যদি শিষ্য না কাটাইতে পারেন তবে শিষ্য উন্নত স্তরে আসিতে পারিবেন না। লক্ষ্য ঠিক থাকিলে এবং গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতির জোর থাকিলে শিষ্য সব বাধাই অতিক্রম করিতে পারিবেন।

নিজের অন্তরে (ইচ্ছার কেন্দ্রে) পশুত্বকেই বরণ করিয়া লয় তবে মানুষ পশুই হইয়া যাইবে। প্রকৃতির শক্তি নাই যে প্রকৃতি তাহাকে মানুষ-রূপে গড়িয়া লয়। মানুষের শাসন-যন্ত্র যদি শক্তি-স্তরের আদর্শে গঠিত থাকে, মানুষের সমাজকে যদি বিষ্ণু-কেন্দ্রের উন্নত আদর্শে স্থাপিত করিয়া দেওয়া যায় এবং মানুষের শিক্ষা যদি মানুষের বিকাশের অনুকূল হয় এবং মানুষে যদি গণেশ-কেন্দ্র পুষ্টির কোন প্রকার পথ থাকে তবে মানবসমাজে অসীম সুখের যুগ আসিবে। শিক্ষার বিকাশও মানুষে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বিকাশ। মানব-স্বভাবে এসব আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে—মানুষ প্রকৃতির কোলস্থিত অন্যান্য জীবের মত জীব নহে। মানুষের কর্ম্মশক্তি এবং জ্ঞান-শক্তি বিকাশে অসীম শক্তি মানুষের হাতেই রহিয়াছে। মানুষের সমাজে পশুর মত স্বভাব বিশিষ্ট মানুষও রহিয়াছে। আবার বুদ্ধ, শঙ্কর, রাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মত মহাপুরুষও রহিয়াছেন। মানুষের নিকট এই পৃথিবীতে যদি অন্য কোন আকারের জীব আরও উন্নত বিকাশ লইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয় তবে একথা আপনারা জানিয়া রাখুন যে মানুষ সেই উন্নত বিকাশের সর্ব্ব সম্পদই আয়ত্ত করিয়া লইবে। আর মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই উন্নত সৃষ্টিকে মানুষ নিজ বুদ্ধি এবং কর্ম্মশক্তির বলে ধ্বংস করিয়া দিয়া প্রকৃতির স্পর্দ্ধাকে খর্ব্ব করিয়া দিবে। অভয়, তেজ, ত্যাগ, অহিংসা আদি দৈবী সম্পদ এবং গণেশ, সূর্য্য বিষ্ণু, শিব ও শক্তি আদি ঈশ্বরীয় সম্পদ (বা শক্তি সম্পদ) মানুষে বিকশিত হইয়াছে, এসব শক্তি আয়ত্ব করিয়া মানুষ অসীম শক্তিশালী হইয়াছে। সুতরাং মানুষের চক্ষের সামনে প্রকৃতি যত বড় বিকাশই মূর্ত্ত করুন না কেন তাহার আকারটি মানুষের মত করিয়াই গড়িতে হইবে। আমরা স্পষ্ট বুঝিতেছি প্রকৃতি মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়াছেন, তাই অন্য কোন আকারের উন্নত বিকাশ এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বকে রক্ষা করিয়া হইবার পন্থা নাই।

মানুষ নিজের বিকাশের পথে নিজে কণ্টক প্রস্তুত করে। সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিবস্তরের মোহ মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। মানুষের অন্তর্জগতে দুইটী শক্তিশালী কেন্দ্র রহিয়াছে; তাহার একটী সেইস্থান যেস্থানে প্রাণময় কোষ মনের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে,—অর্থাৎ মনের ভোগমুখী গতির মূলস্থানটী (মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৯ চিহ্নিত এবং ১ চিহ্নিত কেন্দ্র দেখ)। আসুরিক প্রকৃতির মানবগণ এইস্থানের তৃপ্তিকেই আদর্শ করিয়া লয়। ইহাকে আমরা ভোগবাদ আদর্শ কেন্দ্র নাম দিব। দ্বিতীয় স্থানটী আনন্দময় কোষ যেস্থানে মনের কেন্দ্রে সংযুক্ত হইয়াছে সেই স্থান (মস্তিষ্ক-কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ১ চিহ্নিত কেন্দ্র এবং ১০ চিহ্নিত রেখা দেখ)। ইহা শক্তি-স্তরের আদর্শের কেন্দ্রস্থান। এই স্তরের কর্ম্ম-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব প্রকার নীতি গড়িয়া লইতে হয়। মানুষ ভুল করে সূর্য্যস্তরের কর্ম্ম-শক্তিকে ভিত্তি করিয়া সমাজ এবং রাজনীতির ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইয়া। মানুষ ভুল করে বিষ্ণু-স্তরের কর্ম্ম শক্তিকে ভিত্তি করিয়া সমাজ এবং রাজ শক্তিকে নিয়মিত করিতে যাইয়া। বিষ্ণু-স্তরের ভিত্তি পর্য্যন্ত মোহ এবং অভিমান থাকিবেই। কাজেই এসব ভিত্তি ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে শক্তির কোলে আশ্রয় লইতে হইবে।

যদি জন্মান্তরবাদী বা অধ্যাত্ম-বাদী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় তবে শক্তি-স্তরকে ভিত্তি করিতে হইবে। বাস্তবিক অধ্যাত্ম-বাদ বলিতে শক্তি-স্তরের অনুকূল আদর্শের ভিত্তিকেই জানিতে হইবে। সূর্য্য এবং বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট চিন্তা ভাববাদের অন্তর্গত। শিব-কেন্দ্রপুষ্ট চিন্তা শান্তিবাদের অন্তর্গত। কর্ম্মক্ষেত্রে ভাববাদ এবং শান্তিবাদ সব সময়েই দুর্ব্বলতার আশ্রয়, ইহার চেয়ে ভোগবাদ ভাল। ভোগবাদ, ভাববাদ, শান্তিবাদ এবং অধ্যাত্ম-বাদ এই চারিটী স্তরের আদর্শকে বুঝা প্রয়োজন। গণেশ-কেন্দ্র আদর্শ সব সময়ই শক্তিস্তরের আদর্শের

সহায়ক হয়। আবার গণেশ-কেন্দ্রের আদর্শকে ভিত্তি করিলে সমাজ ধীরে ধীরে শিব-স্তরের পথে অগ্রসর হইবে। আদর্শ শক্তি-স্তরই হইবে। সহায়ক সব চেয়ে বেশী "গণেশ"। অবশ্যই শক্তি-স্তরের আদর্শকে ধরিতে পারিলে সব স্তর হইতেই উপযুক্ত সহায়তা পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ধর্ম্ম স্তরকে গুরুগণ কর্ম্মের দিক দিয়াও শান্তিবাদের অন্তর্গত করিয়া ফেলিয়াছেন। ধর্ম্মের লক্ষ্য শান্তি, কিন্তু ধর্ম্ম-স্তরের বা গুরুগণের কর্ম্ম-লক্ষ্য তাহা নহে। ভারতে চিরদিনই গুরুগণ শক্তি-স্তরের বিকাশকে মানব চরিত্রে মূর্ত্ত করিবার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন বিকাশে সাহায্য করাই গুরুর কর্ম্ম, শান্তিতে আকর্ষণ করিলে মানুষের বিকাশ জড়ত্বে পরিণত হয়। এখন ধর্ম্ম বলিয়া মানুষে যাহা বুঝে তাহা সূর্য্য-স্তরের ভিত্তিতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উপাসনা পথের ভিত্তি ছিল "গায়ত্রী-উপাসনা" (শক্তি-উপাসনা)। দীক্ষা-গুরু সেই শক্তিকেই প্রত্যক্ষ করিবার পথ শিষ্যকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেন। তাহাই ছিল—তান্ত্রিক-দীক্ষা। সেই সব সাধনার শক্তিশালী ভিত্তি ছিল বলিয়াই ভারতে সেরূপ শক্তিশালী বীরের আবির্ভাব হইত। অতীত যুগের ভারতীয় বীর রাজগণের শরীর গঠন সম্বন্ধে যাহারা আলোচনা করিয়াছেন তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন বর্ত্তমান সময়ের রাজগণের শারীরিক গঠন তাহাদের তুলনায় কত শক্তিহীনতার পরিচায়ক। শক্তিশালী সাধনাই ছিল তাঁহাদের শক্তি সংগঠনের প্রধান সহায়। এখন তাহা কোন অজ্ঞাত গুহায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিবে? ভাবের কথা না হইলে তাহা এখন আর ধর্ম্ম-কথাই হয় না। বড় বড় নামী যোগী ও ত্যাগীর নাম ছেলে বেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। প্রথম প্রথম হয়ত খুব বড় সাধকই হইবেন ভাবিয়া বসিয়াছিলাম কিন্তু কিছু দিন পর দেখা যায় শক্তিশালী সাধনার কথা দেশকে শুনাইবার কাজ ছাড়িয়া দিয়া খোল-করতাল বাজাইয়া ভাবাবেশ দেখান বা

সমাধি লাগান এবং একদল শিষ্য করিয়া কেবল টাকা যোগাড়ে মন দেন। আজ কাল অনেক স্থলে দুর্গা, কালী আদি শক্তি-পূজায় পর্য্যন্ত ভাবাবেশ ঢুকিয়া গিয়াছে। যাহা চিরদিন সাধকগণের শক্তি-স্তরের অত্যন্ত গোপনীয় সাধনাঙ্গ-পূজা ছিল তাহাও আজ ভাবের বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। যাহা হউক শক্তি-স্তরই গায়ত্রীর স্বরূপ, এই গায়ত্রীই আর্য্য সন্তানের উপাসনার ভিত্তি। বাল্যকালেই ইহার সহিত পরিচয় দিবার বিধান আর্য্য সমাজে চলিয়া আসিতেছে। দীক্ষার সময় গুরু সেই শক্তি-স্তরের দিকে শিষ্যকে আরও অন্তরঙ্গ ভাবে আকর্ষণ করিতে থাকিতেন। এখনও ঐরূপ আদর্শ যাহাতে গৃহীত হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এতো অধ্যাত্মবাদের ভিত্তির কথা ; কিন্তু যদি ভোগ-বাদ লক্ষ্য থাকে তবে এতদূর অগ্রসর হইতে হইবে না। মনের ভোগ-মুখী কেন্দ্রটীকে জীবনের লক্ষ্য স্থাপন করিতে হইবে। শিক্ষা এবং সমাজকে সেই ভোগের সুবিধার জন্য নূতন ছাঁচে গঠন করিতে হইবে। নীরেট নিষ্ঠুর হইয়া জগতকে ভোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে শিব-স্তরের শান্তি-সম্ভারকে অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপদে বিবেকের নির্দ্দেশকে পদাঘাত করিতে হইবে। মিথ্যা, ছলনা ও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে হইবে। একটী আত্ম-বিকাশের ভিত্তি (শক্তি বা অধ্যাত্মবাদ), অন্যটী ভোগবিকাশের ভিত্তি। কোনটী চাও স্থির কর। যদি অধ্যাত্মবাদই লক্ষ্য হইয়া থাকে তবে সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব সকলকেই লইতে পারিবে, কিন্তু ঐ সব কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতাগুলিকে ছিন্ন করিতে হইবে ("রক্তাম্বুজাসনং" সূর্য্য-স্তর, "সরসিজাসনং" বিষ্ণু-স্তর, "পদ্মাসীনং" শিব-স্তর এবং "সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াম্" শক্তি-স্তর ; ধ্যানাংশগুলি পাঠ করিয়া লও)। সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব দুর্ব্বল স্তর। এখানে অবস্থান করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। হয় মনের ভোগমুখী গতির কেন্দ্রে আত্ম-সমর্পন করিয়া পৃথিবীকে ভোগ কর

অথবা শক্তি-স্তরে দাড়াইয়া ভোগ এবং মোক্ষ দুইই লও। এক কথায় হয় রাবণ হইয়া ভোগ কর অথবা শ্রীকৃষ্ণ হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মী হও। কর্ম্মহীন হইয়া ভাবজগতে বেড়াইয়া আর দুই চারটা লীলার কথা শুনাইয়া দিন কাটাইলে চলিবে না। অধ্যাত্ম-বাদের ভিত্তিতে যদি ভাববাদের আবরণ লাগাও তবে তাহার ফলে তুমি দুর্ব্বল হইবে। আর একদল আসুরিক প্রকৃতির লোক শক্তিশালী হইয়া তোমার বাঁচাকে নরক ভোগের সমকক্ষ করিয়া দিবে। তুমি বাঁচিয়া নরক ভোগ করিবে মাত্র। তোমার জীবনের আদর্শ গ্রহনের পূর্ব্বে তোমাকে সাবধান করিয়া দেওয়ার জন্য এই ইঙ্গিতটুকু দেওয়া হইল। এবার চল আমরা শক্তি-স্তরে প্রবেশ করিব।

আমাদের অন্তরস্থিত সর্ব্ব শক্তির সমষ্টিকে "দুর্গা বা শক্তি" বলিয়া জানিতে হইবে। ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, দৈবী, আসুরিক যত প্রকারের শক্তি প্রকৃতির মধ্যে বা যে কোন জীবের মধ্যে পাওয়া যায় সকলের শক্তি এই মূল শক্তিতে ধৃত আছে। আমরা জ্ঞানের ১৫ কলা পূর্ণ করিয়া ষোড়শ কলাতে এই শক্তিস্তরে আসিতে পারি। আমাদের আত্মা বলিতে এই স্তরকেই বুঝা যায়। ইহাই ঈশ্বরত্বের অবস্থা। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব আমাদের অন্তরের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডশক্তির কেন্দ্র বা পীঠ মাত্র। উহারা এই মূল শক্তি সংযুক্ত খণ্ড ঈশ্বরীয় শক্তি। ঐ সব ঈশ্বরীয় শক্তিতে এই মূল শক্তির খণ্ডবিকাশ মাত্র রহিয়াছে।

যে সব সাধক এই শক্তির স্তরে আসিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে "হংস" অবস্থার সন্ন্যাসী বলা যায়। এই স্তরকে ঈশ্বরত্বের পূর্ণাবস্থার স্তরও বলা যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসী এবং কর্ম্ম-যোগীকে একই স্তরের মানুষ বলিয়াছেন। এ স্তরের অনুভব সম্পন্ন মহাপুরুষে পূর্ব্ববর্ণিত সমস্তগুলি ঈশ্বরীয় শক্তির অনুভূতির জ্ঞান আছে। আবার এ স্তরে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মিগণে পূর্ব্ববর্ণিত সমস্তগুলি ঈশ্বরীয় শক্তির কর্ম্ম-বিকাশ

যুগপৎ অবস্থিত আছে, কিন্তু তত্তৎ শক্তির দুর্ব্বলতাগুলি থাকে না। তাই তাঁহারা যে কোন স্তরের কর্ম্ম-বিকাশ সম্পন্ন কর্ম্মিগণকে পরিচালিত করিতে পারেন। বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে প্রকৃত কর্ম্মযোগী স্তরের মানুষ এবং প্রকৃত জ্ঞানীস্তরের মহাপুরুষের কার্য্য কলাপের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। কেহ থাকিলেও বা হইলেও তাঁহাদের জীবন চরিত্র অনভিজ্ঞ লেখকগণ এমন সব বিকৃত উপাদানে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন যে তাহা পড়িয়া বুঝাও যায় না। কর্ম্ম-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জীবন চরিত্র প্রকাশ না হইবার দরুন কর্ম্মিগণকে এবং সাধকগণকে নানাপ্রকারে অকারণ শক্তি ক্ষয় করিতে হইতেছে। সচরাচর যে সব জ্ঞানী মহাপুরুষদের নাম শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের অধিকাংশই সূর্য্য-স্তরের অনুভূতির উপর কোন খবর রাখেন না। লোকে আবার তাঁহাদিগকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগী বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। আসুরিকতার বিরুদ্ধে অভিযানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিতই প্রকৃত কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম-লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য, তাহা খুব কমই দেখা যায়। প্রকৃত কর্ম্মযোগী এবং প্রকৃত জ্ঞানীর (শিব বা শক্তি-স্তরের জ্ঞানীর) লক্ষ্য একই প্রকারের হইয়া থাকে। জ্ঞানিগণ জ্ঞানে প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মের ইঙ্গিত দিবেন। প্রকৃত কর্ম্মীও সেরূপ কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। পাঠকগণ জ্ঞানী এবং কর্ম্মীর এই সামঞ্জস্য যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন তবে গীতা এবং যোগবাশিষ্ঠ্য রামায়ণ আলোচনা করিবেন। গীতায় (১৫ শ অধ্যায়) ক্ষর-পুরুষ, অক্ষর-পুরুষ এবং পুরুষোত্তমের কথা আছে। পুরুষোত্তমের যে সব লক্ষণ আছে তাহা এই শক্তিকেন্দ্রে আসিলে অনুভব করা যায়। স্থূল-জগৎ, দৈব-জগৎ এবং জ্ঞান-জগৎ যে শক্তির আশ্রয়ে যুগপৎ অবস্থিত সেই শক্তিই পুরুষোত্তম নামে গীতায় স্থান পাইয়াছে। গীতার বক্তা "শ্রীকৃষ্ণ" এই শক্তি-স্তরে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ ছিলেন। তাই অর্জ্জুনের সামাজিক চিন্তাপুষ্ট হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বেশ নিপুণতার সহিত ছিন্ন করিয়া

দিয়া অর্জ্জুনের কর্ম্মকে দুর্ব্বলতাহীন করিয়া দিয়াছিলেন। চিন্তাশীল পাঠকগণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন অর্জ্জুন দৈবী-সম্পদ সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র পুষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সমাজ-কেন্দ্র পুষ্ট অতি সুন্দর বিচারের যোগ্য ভিত্তি দাঁড় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গণেশ, সূর্য্য এবং বিষ্ণু কেন্দ্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়া কিছুতেই অর্জ্জুনের সে বিচার ভিত্তিকে ছিন্ন করা যাইবে না। শ্রীকৃষ্ণ শক্তি-স্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রত্যেকটী সংশয় ছিন্ন করিয়াছিলেন। এরূপে একদিন রাম এবং বশিষ্ঠের মধ্যে বিচারের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাম শিবকেন্দ্র পুষ্ট বিচারের ভিত্তি স্থাপন করিয়া বশিষ্ঠদেবকে যে সব প্রশ্ন করিয়াছিলেন সেই প্রশ্নোত্তরেই যোগবাশিষ্ঠ্য নামক মহাগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। এখানে রাম বৈরাগ্য এবং তপস্যার পথকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন। সংসারের অনিত্যতা এবং মনের চঞ্চলতার বেগ তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। অর্জ্জুনও সমাজ এবং স্বজাতি ধ্বংশ অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভোজনকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শক্তি-কেন্দ্র পুষ্ট চিন্তার নিকট কাহারও বিচারভিত্তি দাঁড়ায় নাই। গীতার কথা ভারতের ঘরে ঘরে আলোচিত হয়। যোগবাশিষ্ঠ্যের কথা পণ্ডিত এবং সাধু-সমাজে অত্যন্ত সমাদরে আলোচিত হইয়া থাকে। ইদানীং প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ গীতা এবং ঐ যোগবাশিষ্ঠ্য প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু রাম এবং অর্জ্জুনের মত কর্ম্মী এবং বশিষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের মত গুরু সমস্ত ভারতে একটীও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ইহার কারণ প্রত্যেকেই (গুরু এবং কর্ম্মী) সূর্য্য বা বিষ্ণু-কেন্দ্রের চিন্তার মধ্য আবদ্ধ। গুরু যদি শক্তি-স্তরের খবর না রাখেন তবে শিষ্য কি করিয়া রাম বা অর্জ্জুন হইবেন? গীতায় এবং যোগবাশিষ্ঠ্যে কর্ত্তব্যের কথা আছে, দায়িত্বের কথা আছে, গুরু-ভক্তির কথা, বীরত্বের কথা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগেরও

বহু কথা আছে, ভারতের ঘরে ঘরে সে সবের বিস্তারিত আলোচনাও হইয়া থাকে ; কিন্তু আলোচনা হয় না কেবলই শক্তি-স্তরের কথা, তাই আজ সহস্র বৎসরের ইতিহাস দেশপ্রেমী ভারতবাসীকে কেবলই হতাশ-সাগরে নিমগ্ন করে। বীর রাজগুণের সমর-নৈপুণ্য, বীরত্ব সবই ভাব-প্রবণতায় ভাসিয়া গিয়াছিল। বিদেশী আক্রমণকারীদের ছলনার নিকট সেই সমর-বিক্রম ভারতকে বাঁচাইতে পারে নাই। গুরুদের চরিত্রে হয়ত ত্যাগ, সংযম, শিষ্য-স্নেহ, সাধন-শক্তি, তপঃ-শক্তি, স্বদেশ-প্রেম, অতি-মানবতা সবই আছে ; নাই কেবল শক্তি-স্তরের সন্ধান। তাই তাঁহাদের মুখ হইতে যাহা বাহির হয় তাহা গীতা নহে—তাহা ভাবাবেশ, ধ্যান-ভাব এবং শান্তি-ভাব মাত্র। তাই গীতা বুঝিবার পূর্ব্বে বা বলিবার পূর্ব্বে শক্তি-স্তর বুঝা প্রয়োজন। সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব-স্তরের কর্ম্মী এবং জ্ঞানী কখনও দুর্ব্বলতাহীন হইতে পারেন না। যাহা হউক ঈশ্বরত্বের পূর্ণাবস্থাই পুরুষোত্তম। ইহাই মানবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পূর্ণতার অবস্থা।

(অর্জ্জুন শক্তি-স্তরের আদর্শ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামহ, মাতুল, গুরু এবং শিক্ষকগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেও, অধিক কি যুদ্ধক্ষেত্রে সকলকে বধ করিলেও তাঁহাদের উপর সর্ব্বদা শ্রদ্ধা এবং ভক্তির ভাব হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় বহু যুবক পাশ্চাত্য সাম্যবাদ গ্রহণ করিতে যাইয়া বহুস্থানে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করেন না। কোন কোন স্থানে তাঁহারা গুরুজনকে অপমানও করিয়া থাকেন। গুরুজন নীতি বিরুদ্ধ আচরণ করিলে বিনয়ের ভিত্তি নষ্ট না করিয়াও তাহার প্রতিবাদ এবং প্রতিকার করা যায়। যুদ্ধ করিতে হইলেই যে নিতান্ত ছোট মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাহা যে কোন উন্নত আদর্শের জীবন-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আদি

মহাবীরগণ অর্জ্জুনের বিরুদ্ধ পক্ষে থাকিলেও অর্জ্জুনের বিজয়-ইচ্ছাই করিয়াছিলেন। শিষ্য যে কোন মতবাদ গহণ করিয়া নিজের, দেশের এবং দশের মঙ্গল করিতে পারিলে গুরু তাহাতে গর্ব্বই অনুভব করেন। শিষ্য সাম্যবাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়া গুরুকে অপমান না করিলেও তাহার কর্ম্ম-লক্ষ্য খর্ব্ব হইবে না। পাশ্চাত্য সাম্যবাদ এবং ' ভারতীয়) অধ্যাত্মবাদের নজরে ছোট বড় নাই। কিন্তু ভারতীয় সমাজ-স্তরের আদর্শে ছোট বড় ভাব রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়—সমাজ-স্তরের আদর্শে এরূপ ছোট বড় ভাব সমাজের শোভাই বর্দ্ধন করে। যাহা হউক সাম্যবাদ ব' অধ্যাত্মবাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সমাজ-স্তরের আদর্শের ভিত্তিতে পদাঘাত করা চলে না। আবার যাঁহারা আত্মোন্নতি করিতে চান তাঁহারাও গুরুর সঙ্গে সাম্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করিতে গেলে ভুল করিবেন। অনুভব-সম্পন্ন গুরুর সেবা করিয়াই জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। সেখানেও অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে প্রথমে গুরুর সঙ্গে বন্ধুর মত ভাব অবলম্বন করিলে জ্ঞান লাভে বিঘ্ন আসিবে। সময় হইলে গুরু নিজেই, শিষ্যের সহিত সাম্য ভাবের ব্যবহার করিয়া থাকেন।)

সূর্য্য, বিষ্ণু, গণেশ এবং শিব আদি অনুভূতির কেন্দ্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া কেহ যেন সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি করেন না। সাম্প্রদায়িকতা আমাদের লক্ষ্য নহে। আমাদের লক্ষ্য বিকাশ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে উপরি উক্ত সমস্তগুলি শক্তির বিকাশ-বীজ আছে। বিকাশের স্তরগুলিকে প্রাচীন ঋষিগণের আদর্শ অনুযায়ী আমরা ঐ ভাবে সাজাইয়াছি মাত্র। ইহাতে সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রশ্রয় নাই। মানুষ মাত্রই ইহা অবলম্বন করিয়া আত্ম-বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। শক্তি-স্তর সমস্ত মানবের কর্ম্ম-লক্ষ্য হউক: আমরা এইরূপই ইচ্ছা করি। ঐ স্তরকেই—আপন আপন আরাধ্য দেবতা গণেশ, সূর্য্য,

বিষ্ণু, শিব ও শক্তি (বা আল্লা, গড্, জিন, বুদ্ধ, আত্মা, ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম) বলিয়া জানিতে হইবে। এমন অনেক স্তোত্র প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় যাহা পড়িলে শক্তি-স্তরের আভাষই বুঝিতে পারা যাইবে। সাধক নিজে যে স্তরে প্রতিষ্ঠিত নহেন তিনি সেই স্তরের অনুভূতির ভাব লইয়া কখনও স্তোত্র রচনা করিতে পারেন না। ইহাতে বুঝা যায় সাধনায় নিষ্ঠা থাকিলে সাধক মাত্রই অনুভূতির গভীরতায় ধাপে ধাপে শেষকালে শক্তি-স্তরে আসিয়াই ক্ষান্ত হইবেন। পূজা-পদ্ধতি বা পূজা-ক্রম বিচার করিলেও এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। যে কোন দেবতার পূজাই করা হউক না কেন প্রথম গণেশ, তাহার পর ক্রমে সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তির পূজা করিয়া তবে নিজের অভিষ্ট দেবতার পূজা করিতে হয়। অর্থাৎ সাধকগণ অন্তঃকরণস্থিত বিভিন্ন শক্তি-পীঠগুলিকে অনুভব করিতে করিতে যখন একেবারে শক্তি-স্তরে আসেন—তখনই তিনি সেই পূর্ণ-শক্তির স্তরেই নিজের অভিষ্ট দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। এই শক্তি-স্তরকে যাঁহার যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারেন। যে কোন নামের ঈশ্বর বলিতে আমরা এই শক্তির স্তরকেই জানিব। কেহ অনীশ্বর বা অনাত্মার নাম দিয়া যদি এই শক্তি-স্তরকে বুঝিতে চাহেন তাহাতেও আমাদের কোন ক্ষতির কারণ নাই। কারণ আমরা চাই পূর্ণ-বিকাশ-স্তরের কর্ম্মী। দোকান চালান যাহাদের লক্ষ্য তাহারা ব্যবসার ফন্দি আঁটিবার জন্য সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু—কর্ম্মী তাহা করিতে পারেন না। যাঁহার কর্ম্মে এবং স্বভাবে যে স্তরের কর্ম্ম-লক্ষণ বুঝা যাইবে আমরা তাঁহাকে সেই স্তরের কর্ম্মী বলিয়া মানিয়া লইব। আমাদের লক্ষ্য কর্ম্ম, সুতরাং আমরা কোন স্তরেরই নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইব না। সাধকগণ জানিয়া রাখুন শক্তি-সাধনার মধ্যেই শক্তি-স্তরের সন্ধান বেশী পাওয়া যাইবে।

দুর্গা-ধ্যান * অবলম্বন করিয়া এই স্তরের অনুভূতি এবং কর্ম্ম-বিজ্ঞান প্রকাশ করা হইবে। পরে এ স্তরের অন্যান্য কথারও আলোচনা করা হইবে। এ স্তরের জ্ঞানী এবং কর্ম্মী একই স্বভাববিশিষ্ট। যাঁহারা ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহারা এই শক্তি-স্তরের তূরীয় অংশের অনুভূতি লাভ করিয়াই শরীর ত্যাগ করেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে কাহাকেও আত্ম-পরিচয় দেন না। খুব অল্প লোক তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া থাকেন। শক্তি-স্তর বাস্তবিক কর্ম্মীরই স্তর। কর্ম্মী মাত্রেরই এই শক্তি-অধ্যায়টী বিশেষ মনোযোগসহ পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহাই ভারতের কর্ম্ম-নীতির কুঞ্জি (চাবি)। যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা পঞ্চ দেবতার স্তরগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। গণেশ, সূর্য্য, দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু এবং শিব-স্তরের প্রাকৃতিক জীবনের বিশেষত্বগুলি নিজের চরিত্রে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিবেন। জীবনের ভিত্তি অতি সুন্দরভাবে গড়িয়া লইবেন। নিজের সঙ্গিগণকেও সেই উপাদানে গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। ইহা ভিন্ন কল্পনার স্কিম্ (কর্ম্ম-পদ্ধতি) লইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলে নিজের সঙ্গিগণ দ্বারাই প্রতারিত হইতে হইবে।

কালাভ্রাভাং=কাল রঙের মেঘের মত আভা (জ্যোতি) যাঁহার (এমন স্ত্রী)। (ইহা কালী দেবীর গায়ের রঙ্)।

(অন্তর্নিহিত অর্থ) এরূপ অনুভূতি এই স্তরের অনুভূতির বিশেষত্ব। ইনি তূরীয়া শক্তি। যাঁহার সহজ অর্থ প্রকাশহীন শক্তি। শিবের স্তরে যে জ্ঞানের পূর্ণাবস্থার (মহত্তত্ত্বের) অনুভূতির কথা আছে, উহাই

---

*দুর্গা-ধ্যান :—কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ রবিকুল ভয়দাং মৌলী-বদ্ধেন্দুরেখাং।
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈ রুদ্বহন্তিং ত্রিনেত্রাং॥
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবন মখিলং তেজসা পূরয়ন্তিং।
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণাবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

এ স্তরের আবরণ স্বরূপ। সাধক জ্ঞানের পূর্ণ কলায় (১৫ কলায়) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই অমাকলার (অন্ধকার কলার) জ্যোতিতে সমস্ত জ্ঞানের বিলয় অনুভব করেন। এখানে কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতির কথা বলা হইল। জ্যোতি বলিতে আমরা সব সময়ে প্রকাশ শক্তিকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এই কৃষ্ণ-জ্যোতি প্রকাশ-শক্তি-সমন্বিত নহে। ইহা ঘোর অন্ধকারের মত সর্ব্বগ্রাসী জ্যোতি। এই জ্যোতির এমনই প্রভা যে ইহা সমস্ত দৃশ্যকে আকর্ষণ করে এবং গ্রাস করে। যে কোন স্থানে জ্যোতি (তেজ) আছে সেই কেন্দ্রেই অন্ধকার অবস্থান করে। আলো এবং অন্ধকার একই কেন্দ্র হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্যোতি বলিতে আলো এবং অন্ধকারের সংমিশ্রন একই তেজ সত্বাকে জানিতে হইবে। অন্ধকার অংশটী বেশী সূক্ষ্ম এবং দ্রুতগতি বিশিষ্ট। তাই যে কোন স্থানে জ্যোতি আসিয়া পড়ে সেই স্থানেই অন্ধকার (ছায়া) দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতির অংশটী কোন বস্তুর সংঘর্ষে বাধা প্রাপ্ত হয়। সেই বাধা প্রাপ্ত স্থানটাই আলোকিত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার অংশটী সেই বস্তুর ঘনত্বকে ভেদ করিয়া বিপরীত দিকে চলিয়া যায়; তাহাই ছায়া বলিয়া খ্যাত। আলোর অংশ স্থূল বলিয়া বস্তুর ঘনত্বকে ভেদ করিতে পারে না, কিন্তু অন্ধকার অংশটী সূক্ষ্ম হইবার দরুণ যে কোন বস্তুর ঘনত্বকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। অব্যক্তের (অন্ধকার-তত্ত্বর) আশ্রয়ে মহত্তত্ব (প্রকাশ তত্ত্ব) অবস্থিত। এই মহত্তত্ত্বের আশ্রয়ে সমস্ত সৃষ্টি রহিয়াছে—একথা শিব-অংশে বলা হইয়াছে। যাহা হউক আমরা আমাদের অন্তঃকরণের (এখানে অন্তঃকরণ নামই প্রদান করিলাম; ইহা বাস্তবিক বিজ্ঞান-ময় কোষের শেষ স্তরের অনুভূতির কথা) যে কেন্দ্রে মহত্তত্ত্ব বা জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ অবস্থাকে অনুভব করি, সেই কেন্দ্রেই অব্যক্ত-তত্ত্ব বা শক্তির এই তূরীয় অংশ অনুভূত হয়। শান্তির কলা বৃদ্ধি করিতে

করিতে, অথবা অন্তরস্থিত শান্তিকে ভোগ করিতে করিতে আমরা মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হই। আবার শান্তির কলা কম হইয়া যখন রজোগুণের আধিক্য হয় তখন আবার জীবাত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হই। মহত্তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই কৃষ্ণ-কলার অনুভূতিতে আসিতে হয়। চেষ্টা করিয়া ইহা লাভ হয় না। অন্তরস্থিত প্রকৃতির ক্রিয়াগুলিকে দর্শন করিবার শক্তি, ভোগ করিবার শক্তি এবং প্রবেশ করিবার (আত্ম-সমর্পণ করিবার) শক্তি অর্জ্জন করিয়া এই সব তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হয়। মহত্তত্ত্বই আমাদের অনুভূতির শেষ কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রে স্থিত হইতে পারিলে অব্যক্তের অনুভূতিও পাওয়া যাইবে। একই কেন্দ্রস্থিত হইয়া মহত্তত্ত্ব এবং অব্যক্ত-তত্ত্ব অনুভব করিতে হয়। সেই পূর্ণ শান্তির বোধটাই অব্যক্তের কৃষ্ণবর্ণ বোধে বিলয় হইতে থাকে। শান্তির ভোগও ভোগ এবং এক প্রকার বন্ধন বিশেষ। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে (শক্তিস্তরে) অবস্থিতি লাভ হইলে ইহা বুঝা যাইবে। এই শান্তির বোধও এক প্রকার ক্রিয়া-স্বরূপ। এই ক্রিয়াকে ভোগ করিয়া সাধক পূর্ণ হইয়া যান বা মহৎ হন। পরে অনুভূতির আরও গভীরতায় আরও সূক্ষ্ম স্পন্দনের মধ্যে চলিয়া যান। এই স্পন্দনগুলির আর কোনই বোঝা নাই। এখানে আসিলে সাধক একবারে নির্বিষয় হইয়া যান। যাঁহারা অন্তরস্থিত একটা কেন্দ্রের অনুভূতিতে আত্মদান করিয়া কিরূপে অন্যান্য আন্তর ও বাহির্জগৎস্থিত ভাবরাশির দ্রষ্টা হইয়া অবস্থান করিতে হয় ইহার বিজ্ঞান বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা এসব অনুভূতির কথা বুঝিতে পারিবেন না।

গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে এক এক প্রকারের অনুভূতির উপাদান পাওয়া যায়। যে সাধক যে কেন্দ্রপুষ্ট তাঁহার স্বভাবে সেই কেন্দ্রের বিকাশ খুব স্থিরভাবে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—"সত্য" গণেশ কেন্দ্রস্থিত অনুভূতির প্রধান অংশ।

এই অংশে যাঁহার দৃঢ়তা জমিয়া যা। এমন সাধক অন্তরে বাহিরে যত প্রকার সংঘর্ষেই আসুন না কেন সব স্থানে একই সত্য বজায় রাখেন। তিনি তখন অন্তরকে গোপন করিয়া বড় হইবার চেষ্টা করেন না। ব্রহ্মচারীর শরীর, কামের পীড়নে হয়ত ব্রত ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু সে কথা প্রয়োজন মত গুরুর নিকট প্রকাশ করিতে ভয় বা সঙ্কোচ আসিবে না। তিনি নিজের আত্মাকে গণেশ কেন্দ্রস্থিত ঐ সত্যাংশের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন, তাই বাহিরে ভিতরে কোনস্থানেই তিনি আর মিথ্যা অবলম্বন করেন না। এরূপ প্রত্যেক কেন্দ্রেরই বৈশিষ্ট্য আছে। সাধক সেরূপ কেন্দ্রেস্থিত হইলে তাঁহার স্বভাবটী এবং আন্তর দৃষ্টিটী সেইরূপ উপাদানে মিশিয়া যায়। এরূপ যাঁহারা এই অব্যক্তের অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই গীতা বর্ণিত ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেন। আমাদের এই শক্তির ধ্যানে সে কথা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ; ক্রমে জানিতে পারিবেন।

এখানে পাঠকগণের সুবিধার জন্য পর পৃষ্ঠায় মস্তিষ্ক-কেন্দ্র পরিচয় চিত্রখানা প্রদত্ত হইল। পাঠকগণ ইহার পরিচয়-অংশ পাঠ করিয়া লইবেন।

চিত্র পরিচয়—

১। মনের কেন্দ্র। মানবাত্মা এই কেন্দ্রটীতেই বেশী সময় অবস্থিত থাকে। ইহা কর্ম্ম-কেন্দ্র। ইহা অত্যন্ত চঞ্চলতার কেন্দ্র। পুরাণাদিতে ইহাকেই ব্রহ্মা বলা হইয়াছে।

২। সূর্য্য-কেন্দ্র। ইহা ভালবাসার কেন্দ্র। প্রেম বোধের কেন্দ্র। শিক্ষার কেন্দ্র, অনুসন্ধিৎসার কেন্দ্র। ভাবের কেন্দ্র। মাতৃত্বের কেন্দ্র (যতক্ষণ কামের বেগ থাকে ততক্ষণ মাতৃত্বের পূর্ণাবস্থা আসে না। শিবের স্তরের অনুভূতি আসিলে কামের বেগ থাকে না)।

৩। বিষ্ণু-কেন্দ্র। ইহা সুখ বোধের কেন্দ্র। স্মৃতির সূক্ষ্মভাগ

মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্র।
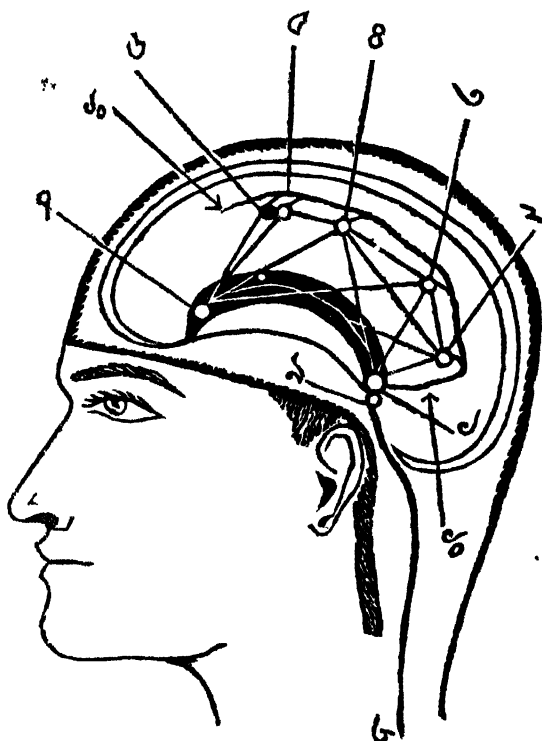
এইস্থানে অবস্থান করে (স্মৃতির লীলার ভাগ সূর্য্য-কেন্দ্রে অবস্থান করে)। ইহা সমাজ-ভাবের কেন্দ্র। ছলনা করিবার শক্তি এই কেন্দ্র হইতেই আসিয়া থাকে। ইহাই আসুরিকতার কেন্দ্র। এ কেন্দ্র যাহাদের পুষ্ট তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়াও অনুতপ্ত হয় না। এ কেন্দ্রে অনুভূতি আসিলে স্পষ্ট বুঝা যায় সত্য এবং মিথ্যা একই ঈশ্বরের আশ্রয়ে

আশ্রিত। ইহা মোহের কেন্দ্র। জীব মাত্রেরই সন্তান সন্ততির মধ্য দিয়া বাঁচিয়া থাকিবার বেগ এই কেন্দ্র হইতে আসিয়া থাকে। জীব মাত্রেরই এই কেন্দ্র শক্তির অনেক অংশ (সবটা নহে) বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

৪। শিব-কেন্দ্র। ইহা শান্তি বোধের কেন্দ্র। গভীর নিদ্রায় (সুষুপ্তিতে) জীব মাত্রই এই কেন্দ্রে স্থিতিলাভ করে। যাঁহারা এই কেন্দ্র পুষ্ট হন তাঁহারা খুব শান্ত স্বভাব হন। এই কেন্দ্র হইতেই ১, ২ ও ৩ চিহ্নিত কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে। সন্ধ্যা, পূজা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এই কেন্দ্র পুষ্ট হয়। এই কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত যোগিগণের স্ত্রী এবং বিষয় ভোগের বাসনা থাকে না।

৫। মহত্তত্ত্বের কেন্দ্র। এখানে মানবের জ্ঞান পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহা নাদ, ধ্বনি বা মন্ত্র-জগতের কেন্দ্র। ইহাকে আর্য্যশাস্ত্রে সরস্বতী দেবী বলিয়া উপাসনা করিবার বিধি আছে। ইহা পূর্ণ-বোধের কেন্দ্র।

৬। অব্যক্ত অনুভূতির কেন্দ্র। শক্তি ধ্যানে এই কেন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ইহা ঘোর অন্ধকার বোধের স্বরূপ।

৭। গণেশ-কেন্দ্র। সত্য, ত্যাগ, অন্যায়-বিরোধিতা এই কেন্দ্র হইতে আসিয়া থাকে। এই কেন্দ্র-পুষ্ট মানবই গণ-শক্তির নেতা হইতে পারেন। এই কেন্দ্র যাঁহাদের পুষ্ট তাঁহারাই জ্ঞানী এবং প্রকৃত জন-হিতৈষী হইতে পারেন। ইহা শূন্য বোধের কেন্দ্র।

৮। ইহা মেরুদণ্ড মধ্যগত সুষুম্না-পথ। এই পথে জীবমাত্রেরই জীবনী-শক্তি বিচরণ করে। মস্তিষ্ক এবং এই পথই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিবাস স্থান।

৯। প্রাণ-কেন্দ্র। এই কেন্দ্র হইতেই জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার শক্তি বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। এই কেন্দ্রের নিজের কোন

স্বাধীন কর্ম্ম-শক্তি নাই, কিন্তু এই কেন্দ্রস্থিত শক্তি জীবমাত্রকেই বহন করিয়া বেড়ায়। জীবের শরীরের শক্তি বলিতে এই কেন্দ্র-শক্তিই বুঝিতে হইবে। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি জীবের স্থূল শরীরটী আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন রাখে। এই প্রাণ-শক্তিই স্থূল শরীরকে নিজ শক্তি বলে উঠাইয়া-চালাইয়া লইয়া যায়।

স্ত্রী-পুরুষ মিলনে যে সুখ তাহা এই প্রাণ-কেন্দ্রেরই তৃপ্তি জানিতে হইবে। ইহাই সাধারণতঃ কাম নামে খ্যাত। অনেকে মাতা ও সন্তানমিলন সুখকেও কাম আখ্যা প্রদান করিতে চাহেন। আমাদের পাঠকগণ জানিয়া রাখিবেন উহা ঠিক কথা নহে। ২ চিহ্নিত কেন্দ্রটী মাতৃভাব ও সন্তান ভাবের স্থান। কামের মিলন পশু-স্তরের সুখ, কিন্তু স্নেহ দৈব-স্তরের সুখ। যে সব স্ত্রী উন্নত বিকাশসম্পন্ন নহে তাহারা স্নেহে এবং কামে সব সময়ে যথাযথ ভাবের সমন্বয় রাখিতে পারে না। পিতা ও কন্যার স্নেহমিলনকেও অনেকে কাম বলিতে চাহেন। তাহাও ঠিক নহে। উন্নত-অনুভূতির স্তরে প্রতিষ্ঠিত না হইবার দরুণ ভাব-জগতে কিছু কিছু মিশ্রিত ভাবের গোলমাল আসিয়া থাকে ইহা সত্য। সেই কারণেই স্নেহের সহিত কাম ভাবের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতে পারে। তাহা হইলেও কাম এবং স্নেহ এক বস্তু নহে। কাম মানুষকে পশুত্বের পথে লইয়া যায়। স্নেহের বিকাশ থাকিলে মানুষ উন্নত স্তরে প্রবেশের পথ পায়। স্নেহের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষমাত্রই কামের পীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। (সূর্য্য-অংশ পাঠ করুন)। এ সম্বন্ধে আমরা বেশী কথা বলিতে চাহি না, কারণ তাহাতে সমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় আসিয়া যাইতে পারে।

পুরুষ মাত্রই সন্তান-ভাব, পতি-ভাব এবং পিতৃ-ভাবের ক্ষেত্র। স্ত্রী-মাত্রই সন্তান-ভাব, পত্নী-ভাব এবং মাতৃ-ভাবের ক্ষেত্র। সূর্য্য কেন্দ্রের প্রাবল্যে সন্তান ভাব, বিষ্ণু কেন্দ্রের প্রাবল্যে পতি বা পত্নী

ভাব এবং শিব-কেন্দ্রের প্রাবল্যে পিতৃভাব মাতৃভাব জানিতে হইবে। বয়সের সঙ্গে এই ভাব গুলির ক্রমে বিকাশ হইতে দেখা যায়। বাল্য-কালে সন্তানভাব প্রবল হয়। যৌবনে মনুষ্য মাত্রই স্ত্রী-পুরুষ মিলন ভালবাসে, কিন্তু সেই সময় সন্তানের কথা মনে আসে না। আবার একটু বয়স বৃদ্ধি হইলেই সন্তানের জন্য ব্যস্ত হয়; সন্তান না থাকিলে যেন তাহাদের মন তৃপ্ত হয় না। পতি যদি সন্তানের স্থানই অধিকার করিতে পারে তবে সন্তানের প্রয়োজন কি? আবার সন্তানের সঙ্গে যদি কামসূত্রই বিদ্যমান্ তবে পতি থাকিতে সন্তানের কামনা কেন?

অন্তঃকরণে এরূপ ক্রম-বিকাশ ধারা বিচার করিলেও একথা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে কাম ও স্নেহ এক বস্তু নহে। এতো বহির্জগতের কথা। আমরা ক্রম-বিকাশের পথে পূর্ণ বিকাশের স্তরে যাইতে চাই। সেই পথে মানুষ গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতি প্রথম পান। তখন প্রথম-টায় সত্যে পরে সংযমে দৃঢ় নিষ্ঠা হয়। ইহার পর সূর্য্য-কেন্দ্রের অনুভূতি আসিলে সাধক মাত্রই বালকের মত সরল স্বভাববিশিষ্ট হন। ভগবান যে কত স্নেহের সাগর তাহা এ স্তরে বুঝা যায়। সেই স্নেহ-স্পর্শে স্বভাবতঃই সরলভাব আসিয়া যায়। বিষ্ণু-স্তরের অনুভূতি আসিলে প্রভুত্বশক্তি বৃদ্ধি হয়, অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তি এই স্তরের দান। ইহার পর শিবের স্তরের অনুভূতি লাভ হয়। এই স্তরের অনুভূতি আসিলে সাধক সমস্ত জীবের পিতৃস্থানে স্থিত হন। ইহাই গুরুর স্তর। জীবে আন্তর প্রকৃতির বহির্বিকাশে জীবমাত্রই এক সময়ে সন্তান, পরে পতি বা পত্নী এবং তাহার পর পিতা বা মাতা হন। আবার অনুভূতির পথেও ক্রমোন্নতিতে সূর্য্য-স্তরে বালকের মত স্বভাব-বিশিষ্ট হন। বিষ্ণু-স্তরে পূর্ণ বিকাশ হইলে অন্তঃকরণের উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তি অর্জ্জন হয়। আবার শিব-স্তরের অনুভূতি আসিলে সাধক মানুষমাত্রেরই গুরুস্থানে স্থিত হন।

কেহ কেহ মানুষের মনের উপাদানকে কেবল কামেরই বিকাশ-স্থল বলেন। মানুষের মন যদি কেবল কামেরই বিকাশ স্থল তবে মানুষ সংযমশক্তি কোথা হইতে পায়? হইতে পারে মানুষ মাত্রেই স্ত্রী-সংস্পর্শে (স্ত্রী হইলে পুরুষ সংস্পর্শে) কামের স্বাভাবিক উত্তেজনা অনুভব করে। এ কথাও উন্নত অনুভূতি আসিলে খাটে না। কিন্তু একথাও সত্য যে মানুষ কামের উত্তেজনায় মনুষ্যত্বকে বলিদান দিয়া পশুর মত চেষ্টায় আত্মহারা হয় না। ইহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় মানুষের মনে ঐরূপ সংযমশক্তিও রহিয়াছে। এই সংযমশক্তি গণেশ-কেন্দ্র হইতে আসিয়া থাকে। সংযম বিবেকেরই অংশ।

এই সংযমশক্তি মানুষের এতটা প্রবল নহে যাহাতে মানুষ কামকে সব সময় নিয়মিত রাখিতে পারে। মানুষ যতক্ষণ গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু কেন্দ্রের অনুভূতি লাভ করে নাই, ততক্ষণ মানুষের বিবেক যতই শক্তিশালী হউক না কেন কাম দমনে তাহার পূর্ণ শক্তি নাই। সাময়িক সংযম মাত্র সে করিতে পারে। কামের প্রভাব বিষ্ণু-কেন্দ্র পর্য্যন্ত রহিয়াছে। অনুভূতিতে গণেশ-কেন্দ্র-স্থিত হইলে সাধকে এই শক্তিটুকু হয় যে বাহিরে প্রত্যক্ষে কোন কামের বস্তু দেখিলে তাহাতে আকৃষ্ট হইবে না। আবার কোন স্ত্রী বা পুরুষ বিশেষে যেখানে মাতৃ, পিতৃ বা সন্তান ভাব আসিয়া গিয়াছে সেখানেও কামের উত্তেজনা তাহার আসিবে না। তাহা হইলেও কাম সম্বন্ধে সাধক নিরাপদ নহে। তখনও মানসক্ষেত্রে সময় সময় কামের রূপক ছবি খেলিবে ও সেই রূপক-ছবির নেশা সাধককে আকর্ষণও করিবে। সূর্য্য-স্তরের অনুভূতিতে স্থিত হইলে সাধকের কামের উত্তেজনা একেবারেই দেখা যাইবে না (কিন্তু কাম এখানেও থাকে)। এখানে রাগাত্মিকা ভক্তির স্তর। এখানে তিনি বালক বা বালিকাভাবে (সখ্য, দাস্য, বাৎসল্যাদিভাবে) এমনই তন্ময় থাকেন যে কামের উত্তেজনার গন্ধও থাকিবে না। কামের

উত্তেজনা না থাকিলেও কামের বীজ সাধকে থাকে। ভাবের বেগ তখন এতই প্রবল হয় যে কামের উত্তেজনার সময়ই হয় না। তখন লোক বিশেষে সন্তান, দাস্য, সখ্যাদির আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবলভাবে থাকিবে। অর্থাৎ কাম না থাকিলেও মোহ থাকিবে। ইহার পর বিষ্ণু-স্তরের অনুভূতি আসিলে সাধক সুখবোধের কেন্দ্রে স্থিত হন। বিষ্ণু-কেন্দ্র ভোগ জগতের কেন্দ্র। সুতরাং সাধক এখানে সব সময়ে নিরাপদ নহেন। সময় সময় কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে কামের এবং মোহের উত্তেজনা আসিয়া সাধককে অভিভূত করিয়া দিবে তাহা বলা যায় না। যাঁহারা সাধক তাঁহারা সময় মত সবই জানিতে পারিবেন বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই।

শিবের স্তরে আসিলে সাধকের কামের উপর পূর্ণ দখল হয়। যখন বালকভাবের অনুভূতি (সূর্য্য-কেন্দ্র) ততক্ষণ কাম নাই। আবার যখন গুরুর ভাব বা পিতৃভাব (শিব-কেন্দ্রের অনুভূতি) তখনও কাম নাই। মনেব্‌কেন্দ্রে এবং বিষ্ণু-কেন্দ্রে কামের বেগ আছে। যাহারা বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতগণ লিখিত মনোবিজ্ঞান পাঠ করিয়া কাম দমনে হতাশ হইয়াছেন তাঁহারা আশ্বস্ত হউন। মানুষের মন সব সময়েই কামে মাখা নহে। স্ত্রী সংস্পর্শে পুরুষ এবং পুরুষ সংস্পর্শে স্ত্রীর মনোজগৎ সব স্তরেই নর্দ্দমার কাদাগোলা জলের মত অস্পৃশ্যরূপ ধারণ করে না। ইহার উপরে মানুষ সহজেই দাঁড়াইতে পারে। পশুত্বের পরপারেও মানুষের গতি ও স্থিতি আছে। গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতি আয়ত্ব হইলে কাম দমন করা খুব কঠিন নহে। গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতি লাভ করা খুব সাধনসাপেক্ষ কাজ নহে। ইচ্ছা চাই চেষ্টা চাই, আর দৃঢ়তারও প্রয়োজন।

১০। ইহা একটী রেখার মত করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহাকে আমরা শক্তিরেখা নাম দিতেছি। এই শক্তি-স্তরে আত্মবুদ্ধি আসিলেই

সাধক ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। এস্থানে দাঁড়াইয়া সাধক ইহাই বুঝিতে পারেন যে কর্ম্ম অনাদি ও অনন্ত। কর্ম্মই জীবের ও ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ। কর্ম্মের বাহিরে কেহই যাইতে পারে না। আদি, মধ্য ও অন্ত সবই কর্ম্মময়। ইহা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ইহাই আত্মার সর্ব্বোত্তম বিকাশের ক্ষেত্র। এখানে দাঁড়াইয়া কর্ম্মিগণ একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারেন। এই শক্তি-স্তর হইতেই শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য ও গণেশাদি কেন্দ্রগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। এই শক্তিই পরস্পরের সংযোগ সাধন করিতেছেন। এই শক্তি-স্তর অর্থে পুরুষ-প্রকৃতি-স্তর বুঝিতে হইবে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং তুরীয় সকল অবস্থাই পুরুষপ্রকৃতির অধিনায়কত্বে যেন আপনি আপনি হইয়া চলিয়াছে। সাধক এই স্তরে না আসিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন না। এই ঈশ্বরের দৃষ্টির সামনে সব (সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও প্রলয়) হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য যে কর্ম্মহেতু কোন দোষগুণ ইঁহাতে স্পর্শ করে না। সাধকগণ এ স্তরে আসিলে বুঝিতে পারিবেন গণেশাদি কেন্দ্রশক্তির সর্ব্ববিধ উপাদান এখানে আছে, কিন্তু কোন কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতা এ স্তরে নাই।

কটাক্ষে রিকুলভয়দাং—চক্ষের চাহনিতে অরি সকল ভয় পায়।

অরিকুল অর্থে অসুর সকল। আত্মবিকাশে বাধাদানকারী ভোগী মানব। আইন দ্বারা, শাস্ত্রের বচন দ্বারা, শস্ত্র দ্বারা, কূট নীতি দ্বারা, চালাকি দ্বারা, স্বর্গের লোভ দেখাইয়া বা শোষণ দ্বারা যে কোন প্রকারে নিজের এবং আপন বংশের বা দেশের ভোগের সুবিধা করা এবং অন্যের ও অন্যের বংশের বা দেশের আত্মবিকাশের পথকে রুদ্ধ করা বা কণ্টকাকীর্ণ করিবার চেষ্টাই আসুরিকতা। এরূপ কর্ম্মে যাহারা লিপ্ত আছে এমন দুষ্ট প্রকৃতির মানুষই অরিকুল বলিয়া খ্যাত।

মানুষ সহজে শরীর রক্ষার উপাদান (অন্ন) এবং মস্তিষ্ক পুষ্টির

উপাদান (দুগ্ধাদি) আহার করিতে পাইবে। বাস করিবার জন্য শুষ্ক স্থানে আলো বাতাস ও জলের অনুকূল স্থানে গৃহ পাইবে। মানুষ মাত্রেই শিক্ষার সুযোগ ভোগ করিতে পাইবে। মানুষ মাত্রই সমাজের চক্ষে সমান হইবে। এরূপভাবে মানুষের শাসন, সমাজ এবং শিক্ষাযন্ত্র স্থাপিত হওয়া চাই। ইহার অন্যথায় বহু লোকের আত্ম-বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। ভোগের সুবিধার জন্য একদল মানুষ এই প্রাকৃতিক নীতির অপলাপ করে ইহারাই অরিকুল বলিয়া খ্যাত।

সত্য, ত্যাগ, প্রেম, শান্তি, তেজ প্রভৃতি দৈবীসম্পদই মানুষকে আত্ম-বিকাশে সাহায্য করে। যাহারা এই সব দৈবীসম্পদ অবলম্বন না করিয়া দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ এবং পারুষ্য নামক আসুরিক সম্পদগুলি অবলম্বন করিয়া থাকে তাহারাই অরিকুল বলিয়া খ্যাত।

দম্ভ—যে কোন নিরীহ, নির্দ্দোষ মানুষের উপর শক্তিশালী মানুষের অন্যায় অত্যাচারকে দম্ভ-প্রসূত বলা যায়। যাহারা দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ তাহারা নীতির নিকট মাথা নত করে না।

দর্প—নিরীহ, নির্দ্দোষ ও শান্ত মানুষের উপর বার বার অন্যায় অত্যাচার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করাকে দর্প বলা যায়।

অভিমান—প্রেমের স্পর্শহীন মানুষই অভিমানী। নিজেকে, নিজের বুদ্ধিকে বড় মনে করিয়া বা পাশব বলে নিজেকে শক্তিশালী মনে করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিককে হেয় করিবার মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষই "অভিমানী"। এই অভিমানকে আশ্রয় করিয়াই অন্যান্য আসুরিক সম্পদগুলি বাঁচিয়া থাকে।

ক্রোধ—নিজের ভোগের তৃপ্তির জন্য নীতিবিরুদ্ধ উপায়ে কিছু পাইবার চেষ্টাকে কাম বলে। এই কামের চেষ্টায় বাধা পাইলে ক্রোধের উদ্দীপন হয়। শক্তিশালী লোকের ক্রোধের সম্মুখে নিরীহ লোকের যে দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয় তাহা কেবল ভুক্ত ভোগী

জানেন। অনেক দুষ্ট লোক তেজস্বীর তেজোদ্দীপনাকে ক্রোধ বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়া তেজস্বীর নিন্দা করিয়া থাকে। নীতি বিরুদ্ধ অন্যায় এবং আসুরিক আচরণের প্রতিবাদ বা প্রতিশোধের উদ্দীপনাকে তেজ বলিয়া জানিতে হইবে। তেজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈবীসম্পদ কিন্তু ক্রোধ মানুষের চাণ্ডাল-বৃত্তি।

পারুষ্য—নির্দ্দোষ এবং নিরীহ লোকের উপর শক্তিশালীর নিষ্ঠুর আচরণকে পারুষ্য বলে। "আমার অত্যাচার করিবার যথেষ্ট শক্তি আছে, তাই অত্যাচার করিতেছি"। যাহাদের কর্ম্মে এরূপ মনোবৃত্তি বুঝা যায় তাহারাই পারুষ্য নামক আসুরিক-সম্পদসম্পন্ন মানুষ।

এখানে বলা প্রয়োজন উপরোক্ত আসুরিক ভাবগুলি বিষ্ণু-কেন্দ্র হইতেই আসিয়া থাকে। বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট মানুষ খুবই শক্তিশালী হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ শক্তিশালী না হইয়া ইহাদের সম্মুখে দাঁড়ান ঠিক হইবে না।

যিনি যত শক্তিশালী তাঁহার চাহনি তেমনই শক্তিশালী হইয়া থাকে। নিম্ন স্তরের ভোগী মানুষ হইতে নিঃস্বার্থ কর্ম্মিগণের চাহনি তেজঃপূর্ণ। এই সব কর্ম্মিগণের আবার অন্তরস্থিত শক্তির ইতর বিশেষে চাহনির ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট আসুরিক শক্তি-সম্পন্নগণের চাহনি খুব শক্তিশালী হইয়া থাকে। ইহার কারণ ইহারাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সত্য, দান, সাধনা, তপস্যা ও নিঃস্বার্থ কর্ম্ম প্রভাবেই বিষ্ণু-কেন্দ্র পুষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যিনি নিজের অন্তরে যতটা শক্তিমান্ তাঁহার চাহনি ততটাই শক্তিশালী হইয়া থাকে। অন্তরস্থিত কেন্দ্রশক্তির দৃঢ়তা চক্ষে ফুটিয়া উঠে। অসৎ ভাবদুষ্ট কর্ম্মিগণ সেই সব চক্ষের সংস্পর্শে আসিবা মাত্র নিজে নিজের অন্তরে লজ্জিত হইয়া পড়ে। কেহ বা উন্নত স্তরের চাহনি সংস্পর্শে কাম্য বস্তুর বাধা আসিবে ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে।

গণেশ-কেন্দ্রপুষ্ট চাহনি ত্যাগ-ভাব উদ্দীপক। সূর্য্য-কেন্দ্রপুষ্ট চাহনি প্রেমপূর্ণ। দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট চাহনি মধুরতা পূর্ণ ও সুখদ। আসুরিক-শক্তি সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট চাহনি নিষ্ঠুর ভাব উদ্দীপক। ছল-ধর্ম্মপরায়ণ বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট চাহনি • কুটীল। ইহারা সত্যবাদী লোকের সামনে যখন মিথ্যা কথা বলিতে থাকে (ইহারা প্রায় সব কথাই স্বার্থের সুবিধার জন্য মিথ্যার আবরণেই বলিয়া থাকে) তখন চোরের মত বার বার চক্ষু এদিক ওদিক ঘুরাইতে ফিরাইতে থাকে। চাটুকারধর্ম্মী বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট চাহনি অত্যন্ত হাল্‌কা ও নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। ইহারা বাস্তবিক সূর্য্য-কেন্দ্রপুষ্ট মানুষ। সূর্য্য-কেন্দ্রের পুষ্টি না থাকিলে চাটুকারিতা অর্জ্জন করা যায় না, কিন্তু স্বার্থের খাতিরে ইহারা আপন কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দেয় এবং বিষ্ণুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট রাজা, জমিদার ও শাসনকর্ত্তাদের পদলেহন করিয়া দিন কাটায়। অনেক রাজা, জমিদার ও শাসনকর্ত্তাও ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, কিন্তু পদে তৈল মর্দ্দণকার্য্যে ইহাদের বিশেষ আবশ্যক বোধে মুখে কিছু বলেন না। ইহারা সকলেই শিক্ষিত বা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া থাকে। শিব-কেন্দ্রপুষ্ট চাহনি সরল হইয়া থাকে। যাঁহারা অষ্টম কলাপুষ্ট শিব-কেন্দ্রপুষ্ট মহাপুরুষ তাঁহাদের চাহনি সরল, শান্ত, স্নিগ্ধ এবং একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। এ স্তরের মানুষ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহারা সর্ব্বজীবন-প্রিয় হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সূর্য্য-স্তরের কর্ম্মীর ভিত্তি প্রেমময় অরুণাভ জ্যোতি। বিষ্ণু-স্তরের কর্ম্মীর ভিত্তি সুখময় হিরণ্ময় জ্যোতি, শিব স্তরের কর্ম্মীর ভিত্তি শান্তিময় স্নিগ্ধ জ্যোতি। অসুর সকল ইঁহাদের নজরকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া চলে। অসুর ভয় পায় শক্তিস্তরের জ্যোতিকে এবং গণেশ-স্তরের জ্যোতিকে।

সকলেই জানেন যে গণেশ শক্তিরই পুত্র। গণেশের মধ্যে শক্তির বিকাশ থাকার দরুণ অসুর গণেশের দৃষ্টিকেও ভয় পায়। সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব-কেন্দ্র-শক্তির সহিত যখন গণেশ-কেন্দ্র-শক্তি সংযুক্ত হয় তখনই এই সব স্তরের কর্ম্মিগণ আসুরিকতার বিরোধী হইয়া থাকেন। অসুরগণ তখন সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব-স্তরের কর্ম্মিগণের কটাক্ষে ভীত হইয়া থাকে। এই ভীতির লক্ষণ পলায়ন নহে, শক্তিশালী আক্রমন।

যাঁহারা শক্তিস্তরে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মী তাঁহাদের অনুভূতির দার্শনিক ভিত্তি কৃষ্ণবর্ণ সর্ব্বগ্রাসী জ্যোতি। শক্তিস্তরের প্রথম অনুভূতি এরূপ জ্যোতিতে অনুভূত হয়। শক্তির অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, আকার, প্রকার অবস্থিতি এবং বিস্তৃতি সবই কৃষ্ণ-জ্যোতির আকারে অবস্থিত। জ্ঞান ক্ষেত্রে (মহত্তত্ত্বের অনুভূতির কেন্দ্রে) জ্ঞান-শক্তির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন নাদ (ধ্বনি, অ, আ, ই, ঈ * ইত্যাদিকে ধ্বনি বলে) স্বরূপ (এই নাদের অনুভূতির বোধকে স্ফটিকের সহিত তুলনা করা যায়); অব্যক্ত-ক্ষেত্রে সেইরূপ দেবীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতি স্বরূপ। এই শক্তিকে বুঝিবার জন্য সাধক যে শক্তিটুকু নিয়োজিত করিবেন অনুভূতির কেন্দ্রে তাহাই কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতিতে নিমগ্ন হইবে। সাধকের তখন আর প্রেমের নেশা (সূর্য্য) নাই, সুখের স্মৃতিও কাটিয়া গিয়াছে (বিষ্ণু), শান্তির মোহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (শিব), সমাধির

* এই ধ্বনিগুলির কোন্‌টী কোন্‌ অঙ্গ স্বরূপ তাহার আভাষ তন্ত্রে আছে। সাংখ্যের ২৪টি তত্ত্বের মত এই ধ্বনিগুলিকে তত্ত্বরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়। এই ধ্বনিগুলিই সৃষ্টির একেবারে সূক্ষ্মতম উপাদান। এই ধ্বনিগুলিই শক্তি। ইহারা ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে এই স্থূল বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছে। জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে এই ধ্বনিগুলিই অবস্থিত। এই পুস্তকে এই ধ্বনি-বিজ্ঞান আলোচনা করিবার সুযোগ আসিবে কিনা তাহা আমরা এখনও বলিতে পারি না।

শেষ স্তরও (মহত্তত্ত্বের কেন্দ্র) আজ অব্যক্ত আধারে নিমজ্জিত। আজ শক্তিসাধকের সাধনার পূর্ণাহুতি হইল।

সাধক! এস তোমায় আজ প্রাণ ভরিয়া আদর করি। আজ তুমি শক্তিমান্ হইলে। একদিন তুমি ভোগ-সম্পদ (পার্থিব) আহুতি দান করিয়াছিলে মা তোমার নিকট প্রেম-সম্পদরূপে আসিয়াছিলেন। যে দিন তুমি প্রেম-সম্পদ আহুতি দান করিয়াছিলে সেদিন মা তোমার নিকট সুখ-সম্পদরূপে আসিয়াছিলেন। আবার একদিন তুমি সুখ-সম্পদকে আহুতি দান করিয়াছিলে বলিয়া মা তোমার নিকট শান্তি-সম্পদরূপে আসিয়াছিলেন। যে দিন তুমি সেই শান্তি-সম্পদে নিজের ক্ষুদ্র অভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলে (শিবের প্রণাম—"নিবেদয়ামি চাত্মানং" স্মরণ কর) সেই দিন তুমি জ্ঞানের পূর্ণ-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলে। আজ চাহিয়া দেখ সমাধির যে শেষ মোহ তাহাও কাটিয়া গিয়াছে। সেই "জ্ঞান-সম্পদ" আজ মায়ের অব্যক্ত করাল-বদনে ডুবিয়া গিয়াছে। তাই অসুর তোমার কটাক্ষে ভীত। অসুরের আয়ত্বে বাস করিয়া যতক্ষণ তুমি ভাবিবে—এটুকু আমার ধন, এটুকু আমার সম্পত্তি—অর্থাৎ যতক্ষণ সম্পত্তি রক্ষার মোহ তোমার থাকিবে ততক্ষণ অসুর নিশ্চিন্ত। আজ তুমি তোমার সমস্ত সম্পদ আহুতি দিয়াছ, তাই অসুর শঙ্কিত। আজ তোমার জ্ঞানের ভাণ্ডার পর্য্যন্ত মা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই তুমি প্রকৃতই শক্তিমান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছ শীঘ্রই মা তোমার নিকট কর্ম্ম-জগতের পূর্ণ বিকাশটী হইয়া দেখা দিবেন; তুমি পুরুষোত্তম হইবে। যখন তোমার প্রেমে, সুখে, শান্তিতে এবং জ্ঞানে মোহ ছিল, ততদিন তুমি প্রভূত সম্পত্তিশালী ছিলে। কর্ম্ম করিতে তোমার ভয় হইতেছিল, সে সম্পত্তি কমিয়া যাইবে ভাবিয়া। আজ সে নেশা কাটিয়াছে, তুমি কর্ম্ম করিতে সর্ব্ব শক্তিমান্ হইয়াছ। তুমি সত্যই শক্তি-সাধক, তাহা শেষ পরীক্ষায়

তুমি উত্তীর্ণ হইলে। এবার তুমি পুরুষোত্তমে (মানব-শ্রেষ্ঠ) প্রতিষ্ঠিত হইলে।

মানুষ যদি দুর্ব্বলতাহীন হয় তবেই অসুরকুল ভীত হয়। অসুর তখন বুঝিতে পারে এবার আমায় চিনিয়াছে। শক্তি-স্তরের কর্ম্মী কখনও অসুরকে ক্ষমা করেন না। তিনি জানেন ক্ষমার নামে অসুর নূতন সুবিধা অর্জ্জন করিতে চায়।

মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাঃ—মুকুটে রেখামাত্র চন্দ্র অবস্থিত।

মস্তকে চন্দ্র থাকার কথা শিব-স্তরে আলোচনা করা হইয়াছে। চন্দ্রটীই বুঝাইয়া দিবে সেই স্তরের অনুভূতিটী কত কলার জ্ঞান প্রকাশ করে। মহত্তত্ত্বের অনুভূতিকে ১৫ কলাপুষ্ট পূর্ণিমার চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। চন্দ্রের প্রকাশ-অংশে ১৫ কলা এবং অপ্রকাশ অংশে ১৫ কলা অবস্থিত। এই রেখামাত্র চন্দ্র-কলা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। ঐ তিথিতে শেষ রাত্রে অতি সামান্য সময়ের জন্য এই চন্দ্র পূর্ব্বাকাশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিবের স্তরের অনুভূতি অষ্টকলা জ্ঞানের আধার। মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে ১৫ কলা জ্ঞানের অনুভূতি হইয়া থাকে। ইহাই পূর্ণিমার চন্দ্র বলিয়া পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। পূর্ণিমার বাদ কৃষ্ণপক্ষে এই চন্দ্রমাই কলায় কলায় বিলীন হইয়া চতুর্দ্দশীতে এক কলায় দাঁড়ায়। দেবীর ধ্যানে এই চতুর্দ্দশীর চন্দ্রকে "ইন্দুরেখা"-রূপে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই রেখামাত্র চন্দ্র (বা জ্ঞানের অনুভূতি) অবস্থিত থাকিয়া সাধকের জ্ঞান-রাশী বিলীন হইয়া যায়। ইহাই তুরীয়-শক্তির অনুভূতি। ইহাই অব্যক্তের অনুভূতি বলিয়া সাধকগণ জানিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অব্যক্তের নিজস্ব কোন অনুভূতি নাই। অনুভূতি জ্ঞান-ক্ষেত্রেই (মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে) হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানই বিলীন হইয়া যখন অতি সামান্য অবশিষ্ট থাকে তখনই সাধককে অব্যক্ততত্ত্বের অনুভূতিতে স্থিত বলা যায়।

ঐ রেখামাত্র জ্ঞানটুকু না থাকিলে অনুভূতিই থাকে না। অনুভূতি এবং জ্ঞান একই কথা জানিতে হইবে।

সাধক! মায়ের ধ্যানে নিজের জীবন-লক্ষ্যের কথা আজ বুঝিয়া লও। তুমি কোথায় কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া আছ তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। তুমি কোথায় যাই'ত চাও এবং কি করিতে চাও ভাবিয় দেখ। অসুর! তুমিও ভাব একি করিতেছ? তুমি তোমার নিজের শরীরের তৃপ্তির জন্য এ কি করিতেছ ভাব। তুমিই বা কেন এমনভাবে বদ্ধ হইয়া ছোট হইয়া থা'কবে। তুমিও এস, বিকাশের পথ ধর। তুমি কর্ম্মীর আদর্শ গ্রহণ কর। তুমি লক্ষ মানুষের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে সুধু অন্নের জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতে বাধ্য করিতেছ কেন? মানুষকে বিকাশের পথ করিয়া দাও। মানুষের জীবন-সংগ্রাম সহজ হইয়া উঠুক। মানুষ বিকাশের কথা ভাবুক।

মানুষ! তুমি হয়ত বৃক্ষরূপে একদিন পৃথিবীকে ভোগ করিতে আসিয়াছিলে। বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে তোমার হয়ত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার চেষ্টা জাগ্রত হইয়াছিল তাই তুমি কীটের রূপ ধারণ করিয়াছিলে। কৃমি-কীট হইয়াও সুখে ভোগ করিতে পার নাই বলিয়া আবার পক্ষীরূপে আসিয়াছিলে। পাখী* হইয়াও তৃপ্তি পাও নাই।

* কোন কোন পণ্ডিতের মতে পশুর পর পাখীর উদ্ভব হইয়াছিল। পশুর পর যদি পাখীর উদ্ভব হইয়া থাকে হউক, ইহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু পাখীকে যেন কেহ পশুকলা হইতে উন্নত কলাপুষ্ট জীব মনে না করে। কোন্ শ্রেণীর জীবে কত কলার বিকাশ আমরা মাত্র তাহারাই আলোচনা করিতে যাইতেছি। বাস্তবিক কোন্ জীবের পর কোন্ জীব আসিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। স্ত্রী এবং খাদ্যই ক্রম-বিকাশের ভিত্তি নহে। ওরূপ ভাবে ক্রম-বিকাশ সাজাইলে নিশ্চয় ভুল হইবে। অন্তর্বিকাশের উপর ক্রম-বিকাশ বেশী নির্ভর করে। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা স্থানান্তরে আমরা করিতে চেষ্টা করিব)। যাহা হউক প্রাণময় কোষ-পুষ্ট জীবে চার কলার বিকাশ আছে। বৃক্ষে প্রাণময় কোষের এক

পশু হইয়াছিলে, তাহাতেও তৃপ্তি পাইলে না। ঘাত-প্রতিঘাতে অতিষ্ঠ হইয়া মানুষ হইলে। মানুষ হইয়া ভোগ করিয়া সুখী হইবে ভাবিলে, দেখিলে ভোগেও সুখ নাই। মনের চঞ্চলতা তোমাকে বিচলিত করিল। ধীরে ধীরে ত্যাগের অভ্যাস শিখিয়া কতকটা ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সূর্য্য ও বিষ্ণু-কেন্দ্র পর্য্যন্ত আসিলে। দেখিলে সে সুখ সে শান্তি স্থায়ী হইল না। তখন নিজের অভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়া শিব হইলে, শান্তির স্বরূপ হইলে। সে শান্তিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের বিকাশের কেন্দ্রে আসিলে। আজ দেখিতেছ সেই জ্ঞানও অব্যক্ত-শক্তির আধারে বিলীন হয়। তাই আর কেন—বৃথা কেন অত্যাচার অবিচারের জাল পাতিতেছ? অন্তরের দিকে নজর ফিরাইয়া দাও। এমন এক সাধারণ নিয়ম তোমার চরিত্রে ফুটাইয়া তোল যাহার সংস্পর্শে শাসন-যন্ত্র, সমাজ-তন্ত্র ও শিক্ষা-ধারা প্রত্যেক স্তরের মানুষকে ক্রম-বিকাশে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। কাহাকেও যেন কেহ বদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারে। দেখিতে

কলার বিকাশ ধরা হইয়াছে। স্বেদজসৃষ্টিতে প্রাণময় কোষের দুই কলার বিকাশ মানা হইয়াছে। অণ্ডজে তিনকলা এবং জরায়ুজে চার কলার বিকাশ মানা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাণের তমোগুনের প্রাধান্য উদ্ভিজ্জ, প্রাণের তমঃ+রজে স্বেদজ, প্রাণের রজঃ+সত্ত্বে অণ্ডজ এবং প্রাণের সাত্ত্বিক অংশ পুষ্ট জীবই জরায়ুজ (পশু)। তমোগুণ-প্রধান জীব একটু জড় হয়। রজো-গুণ প্রধান জীব একটু চঞ্চল হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ প্রধান জীব একটু শান্ত হইয়া থাকে। বড়ো স্তরের জীব কেবল চঞ্চলই নহে, উহারা বেশী বুদ্ধিমান্, কর্ম্মী এবং সঙ্ঘ-ধর্ম্ম প্রিয় হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে পশু হইতে পাখীর মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ বেশী। পশুগণ মানুষের খুব নিকটস্থ জীব। পশুর সঙ্গে মানুষের যতটা ভাব-বিনিময় সহজ পাখীর সঙ্গে ততটা সহজ নহে। মানব-সমাজেও তামস্ এবং সাত্ত্বিক স্তরের (শিব-স্তরের) মানুষ হইতে রাজস্-স্তরের মানুষ (গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু) বেশী বুদ্ধিমান্, কর্ম্মপ্রিয় এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে। ঋষি স্তরের মানুষ কর্ম্মী স্তরের মানুষ হইতে বেশী বিকশিতই হইয়া থাকেন।

পাও না কি— আজ মানুষ সত্য কথা পর্য্যন্ত বলিতে পথ পাইতেছে না? আজ বিচার ক্ষেত্র, রাজ-দরবার পর্য্যন্ত সত্যের মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া মানুষকে মিথ্যা বলিতে বাধ্য করিতেছে! পিতা, মাতা, শিক্ষক, সঙ্গী কেহই আজ মানুষকে সত্য কথা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারিতেছে না। হায়! মানুষের সমাজের একি ঘোর অধঃপতন হইল!! সত্যকেই (সত্যই গণেশ-কেন্দ্রের প্রধান অংশ) আজ যখন অবলম্বন করিতে পারিতেছে না, পাঁচ কলার ক্ষেত্রেই যখন মানুষ দাঁড়াইতে পারিতেছে না তখন শক্তির স্তরে মানুষ কি করিয়া দাঁড়াইবে?

আসুরিক শক্তি যখন শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করে তখন তাহারা এমন ভাবে আইন বা নিয়মাদি প্রস্তুত করিয়া লয় যাহাতে মানুষে গণেশ-কেন্দ্র পুষ্টি হইতে না পারে। ইহারা সূর্য্য (শিক্ষা), বিষ্ণু (সমাজ), শিব (ধর্ম্ম) প্রভৃতির সমর্থক হয়, কিন্তু ইহাদিগকে গণেশ-হীন করিয়া প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করে। আসুরিক বিষ্ণু-চরিত্রে এবং কার্য্যে বিশেষত্ব এই যে গণেশকে পুষ্ট হইতে দিবে না। আসুরিক কর্ম্ম-বিজ্ঞানের এই কৌশল বুঝিয়া তুমি নিজের পথ সহজ কর।

শিব অংশে 'বিন্দুনাদ কলাতীতং" (গুরু প্রণাম) এর কথা বলা হইয়াছে। এই "বিন্দু" অর্থে শিবের ষষ্ঠ মুখ। ইহা আমাদের বিশুদ্ধ অভিমান। এই অভিমানই মনোময়-কোষরূপে পরিণত হইয়াছে। নাদ"-শিবের ঈশান মুখ। ইহাই মহত্তত্ত্বের কেন্দ্র, এখানে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। "কলা"-এই শক্তি ধ্যানে "ইন্দুরেখা" রূপে স্থান পাইয়াছে. এই কলাই অব্যক্তের অনুভূতি। ইহাই ২৯ কলাপুষ্ট অনুভূতি। এই অনুভূতিটুকু শেষ হইলে যাহা বাকী থাকে তিনি গুরু, আত্মা বা ব্রহ্ম।

এখানে আমরা দেখিতেছি "কালাভ্রাভাং" "কটাক্ষৈ রবিকুল-ভয়দাং" এবং "মৌলিবদ্ধেন্দু রেখাং" একই অনুভূতির কথা প্রকাশ

করিতেছে। ইহারা সবই জ্ঞানীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেও কর্ম্মীর লক্ষণে "কটাক্ষৈ রিপুকুল ভয়দাং" এর কথা আসিবে। অর্থাৎ এই স্তরের কর্ম্মীকে সব সময়েই অসুরিক শক্তির আক্রমণ সহ্য করিতে হইবে, ইহা প্রাকৃতিক বিধান।

শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈ রুদ্বহন্তীং—শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ এবং ত্রিশূল এই চারিটী অস্ত্র (দেবী) হস্তে উর্দ্ধমুখী করিয়া ধারণ করিয়াছেন।

এই স্তরের কর্ম্ম-লক্ষণ যেরূপ হইয়া থাকে তাহার সম্বন্ধে পূর্ণ ইঙ্গিত ধ্যানের এই অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। শক্তি-স্তরের বিকাশ লইয়া যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহারা একাধারে কর্ম্মী এবং জ্ঞানী হইয়া থাকেন. কিন্তু এইরূপ কর্ম্মী দুর্লভ। বিশেষ করিয়া অনুভূতির পথে শক্তিস্তর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া খুবই অসম্ভব। কর্ম্মিগণ তাহা বলিয়া হতাশ হইবেন না। বিতর্ক সাহায্যে এই স্তর বুঝিয়া লইয়া এই স্তরের আদর্শ-গ্রহণ করিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় এই শক্তি-স্তরের সাধনা ও কর্ম্মাদর্শ বর্ত্তমান সময় সমস্ত ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধমত, শাঙ্কর এবং পরে বৈষ্ণব মত ভারতের বুকের উপর বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ মত এবং শাঙ্কর মত বিশেষভাবে শিব-স্তরের শান্তি এবং ত্যাগ প্রধান ধর্ম্ম মতের সমর্থক। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেমপ্রধান (সূর্য্য) মতকে সমর্থন করে। এ দিকে সমাজ সম্পূর্ণরূপে স্মার্ত্তকারদের হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান ভিত্তি "বিষ্ণু-স্তর"। বিষ্ণু-স্তরের কাজ হইল সমাজকে ভাগ করা এবং একদল মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা। একমাত্র কর্ম্মপ্রধান বা শক্তি-ভাবোদ্দীপক সাধনা তন্ত্রেই আছে। তান্ত্রিক সাধনার প্রধান অংশ "শক্তি-সাধনা"। তাহার প্রচার একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা স্মৃতির চর্চ্চা করেন তাঁহাদের মধ্যে

শক্তি-দীক্ষার সামান্য অবলম্বন এখনও আছে। স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের এবং জ্যোতিষিগণের বংশ পরম্পরায় কোথাও সামান্য তান্ত্রিক সাধনার বীজ আছে। প্রাচীন বৈদ্যচিকিৎসকগণও তন্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা রাখিতেন। এখন অনেক স্থানের শাস্ত্রীয় চিকিৎসকগণ ইহার খবরই রাখেন না। শক্তিশালী তান্ত্রিক সাধনা রাজকুলে এবং ঋষিকুলে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আসেবিত হইত। আজ ভারতের রাজশক্তির অধঃপতনে তাঁহাদের বংশ পরম্পরায় ইহার আদর আর নাই। শক্তিশালী তান্ত্রিক সাধনার কথা এখন আর কেহ জানিতেই পায় না। যাঁহারা বংশ পরম্পরায় গুরুগিরি করেন তাঁহারা ত সাধনার ধারও ধারেন না। সাধনশক্তি শিব-স্তরের শক্তি। এই শক্তি শিষ্য পরম্পরায় সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যদি শিষ্য প্রকৃত সাধননিষ্ঠ এবং গুরু-সেবক হয় তবেই এ শক্তি লাভ করিবে। ইহা বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হইবার শক্তি নহে। এদিকে পঞ্চমকারের পাল্লায় পড়িয়া তান্ত্রিকগণ হাবুডুবু খাইতেছেন। সে সব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া শক্তি-সঞ্চয় সহজ ব্যাপার নহে। দিব্যাচারী তান্ত্রিক সাধক নাই বলিলেই চলে। যাঁহারা মানুষ, যাঁহারা যুবক, যাঁহারা দেশের এবং সমাজের প্রাণ তাঁহারা জানেন ধর্ম্ম বলতে "জগৎ এবং কর্ম্ম মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্যই বুঝায়"। তাঁহারা জানেন ধর্ম্ম বলিতে স্মৃতি শাস্ত্রের বচন—"তোর কোন কর্ম্মে অধিকার নাই ; আমায় ধন রত্ন দে, আমায় ভূমি ঘোড়া বস্ত্র দে, আমি বংশ পরম্পরায় তোর সমস্ত বিষয়ের ও ধর্ম্মের অধিকারী, আমি তোকে স্বর্গে, পাতালে নরকে পাঠাইতে পারি ; তুই আমায় দে—ইহাই তোর ধর্ম্ম ; ইহার অন্যথা করিলে তোর চৌদ্দ পুরুষ নরকে যাইবে"। অথবা ধর্ম্ম বলিতে তাঁহারা খোল-করতাল-যুদ্ধ বুঝিয়া থাকেন। যাহা হউক ধর্ম্ম বলিতে লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে তাহাতে কর্ম্ম-ভাব এবং বীর-ভাব খর্ব্বই হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময় বীর-ভাব এবং কর্ম্ম-ভাব-প্রধান ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

"শঙ্খ"—সত্যের প্রচার। অসত্য এবং অন্যায়ের দৃঢ় প্রতিবাদকে 'শঙ্খ' বলা হইয়াছে। যথেষ্ট শক্তি অর্জ্জন করিয়া আসুরিক শক্তি বা অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণাই 'শঙ্খ'। অসুরত্ব এক বিন্দুও সহ্য করিব না—ইহাই 'শঙ্খ'। মানুষের সমাজে শিক্ষা-বিভাগ এই অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে। শিক্ষা-বিভাগ আত্ম-বিকাশের পথে ইহা অপেক্ষা বড় অস্ত্র আর গ্রহণ করিতে পারে না। সূর্য্য-স্তরের বিশেষ বিকাশ যে সব মহাপুরুষে দেখা যায় তাঁহারা জীবনব্যাপী শক্তির এই অস্ত্রই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সূর্য্য-স্তরের বিকাশ যাঁহাদের চরিত্রে অল্প তাঁহারা এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন না। এখানে বলা প্রয়োজন এই অস্ত্রটীকে কেহ সামান্য অস্ত্র বলিয়া মনে করিবেন না। যে সব আসুরিক শক্তি সমাজে ভদ্রলোকের মুখোশ পরিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করে এই বিতর্ক-অস্ত্রে তাহাদের মুখের মুখোশ খুলিয়া যায়। সূর্য্য-স্তরে দাঁড়াইয়া এই অস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া শক্তি-স্তরে দাঁড়াইয়া প্রয়োগ করিলে তাহা বেশী শক্তিশালী হইয়া থাকে। 'শঙ্খ' শক্তির একটী মাত্র অস্ত্র। সবগুলি অস্ত্র আয়ত্ব করিয়া তবে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়।

"চক্র"—সংগঠন বা সমাজ। প্রতিবাদে অসুরের শক্তি দুর্ব্বল হয়। এই দুর্ব্বলতার লক্ষণ অন্যায় আক্রমণ। যাঁহারা আক্রমণ সহ্য করিবার জন্য পূর্ব্বেই ব্যূহ (চক্র) রচনা করেন নাই তাঁহারা উহার প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা ঐ আক্রমণের সম্মুখে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেন। তাই শঙ্খের পূর্ব্বেই চক্র রচনা করিতে হয়। মৃত্যু ভয় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ চক্রের মধ্যে আসা বিড়ম্বনা মাত্র। সৈনিকের জীবনের আদর্শ যাহারা বুঝে না তাহারা এরূপ চক্রের মধ্যে আসিবে না যে চক্রের লক্ষ্য আসুরিক শক্তির বিরোধিতা করা। নেতার আদেশে যে কর্ম্মের দায়িত্ব পাওয়া গিয়াছে তাহা পালন করিতে যখন

একজন লোক এতটা দৃঢ় হইতে পারেন যাহাতে তিনি অনায়াসে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে পারেন তাঁহারই চক্রে প্রবেশ-অধিকার আছে। বহুদিন যথাযথ আজ্ঞা পালনের অভ্যাস দ্বারা একরূপ স্বভাব আয়ত্ত হইয়া থাকে। আজ্ঞা পালনের তৎপরতা যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না তাঁহারা চক্র-শক্তির মর্ম্মও বুঝিতে পারিবেন না। আত্ম-বিকাশের পথকে আসুরিক ভাব-দুষ্ট দুর্জ্জন হইতে মুক্ত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া একজন নিজের গুরু বা নেতার আদেশে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে প্রস্তুত হইবে; সঙ্গে সঙ্গে নিজের অধীনে ঐরূপ একদল মানুষকে গড়িয়া লইতে হইবে। এই ভাবেই চক্র প্রস্তুত করিতে হয়। চক্র অবশ্যই আসুরিকতার বিরুদ্ধে প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন। বিষ্ণু-কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া যখন চক্র প্রস্তুত হয় তখন ঐ চক্র আসুরিকতার বিরুদ্ধে বিনিময়ের সম্বন্ধ ছিন্ন করে। আসুরিক ভাবদুষ্ট মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সব মানুষ মানুষের আত্ম-বিকাশের পথকে রুদ্ধ করিবার জন্য জাল পাতিয়া বসিয়াছে এরূপ মানুষকে তাহারা একমুষ্টি দানার দ্বারাও সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয় না। বাস্তবিক আসুরিক ভাবদুষ্ট মানুষকে বাঁচাইবার জন্য আজ যে শক্তিটুকু ব্যয় করা হইবে তাহারই অপব্যবহার কাল দেখিতে পাওয়া যাইবে। সংগঠিত সমাজ স্বার্থপর, পর-পীড়ক এবং আসুরিক ভাবাশ্রিতকে সর্ব্বভাবে ত্যাগ করিবে। ইহাই বিষ্ণু-কেন্দ্রের চক্র-প্রয়োগ। শক্তি-স্তরের চক্র সেরূপ নহে। ইহা যুদ্ধ ক্ষেত্রের ব্যূহ। ইহার প্রথম অবলম্বন মৃত্যু। ইহার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আসু-রিক প্রকৃতির মানুষ স্বার্থের জন্য যে কিরূপ নীতিহীন আচরণ অবলম্বন করিতে পারে তাহার পরিচয় শক্তি-স্তরে দাঁড়াইয়া লওয়া প্রয়োজন। যাহারা নির্ম্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং অত্যন্ত জঘন্য ভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নহে তাহারা নিশ্চয়ই আসুরিক শক্তিকে লইয়া খোঁচাখুঁচি করিবে

না। শেষ পরিণতির জন্য প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর না হইলে পথ একবারেই সহজ হয় না। শক্তি-স্তরের চক্র এই ভাবেই গড়িতে হয়।

"ত্রিশূল"—ত্রিশূল শান্তি এবং ধর্ম্ম রক্ষার অস্ত্র। ধর্ম্ম শান্তিরই স্বরূপ। মনের ভোগমুখী গতি, মোহ এবং অভিমানকে নিয়মিত রাখিতে না পারিলে অশান্তি আসিবেই; প্রত্যেক জীবে প্রকৃতি দেওয়া একটা ধর্ম্ম আছে। বানরের বাঁদরামি করা যেমন স্বভাব বা ধর্ম্ম মানুষেরও সেইরূপ শান্তিই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। শিব-স্তরের মানুষ স্বভাবতঃই শান্ত এবং নিরীহ হইয়া থাকেন। শিব-স্তরের বিকাশই মানুষের আদি বিকাশ। সাধারণতঃ দেখা যায় শিব-স্তরের মানুষ খাইয়াই সুখী। আহার পাইলে তাঁহাদের আর কোন ভাবনা নাই। পরিশ্রম করিয়া খাওয়া এবং নিশ্চিন্ত হইয়া আহার করিতে পারিলে মানুষের যে সুখ তাহা শিব-কেন্দ্রপুষ্ট মানুষের সঙ্গ করিলে বুঝা যায়। মানব-সমাজে যতদিন সেই ঋষির মত শান্ত এবং মজুরের মত সরল কর্ম্মময় জীবন ছিল ততদিন শান্তিই ছিল। পরে নানাপ্রকার দুর্বুদ্ধির বিকাশে বহু প্রকার অশান্তির সূত্রপাত হইয়া অন্যান্য যুগের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দুর্বুদ্ধিগুলির প্রধান আশ্রয় ভোগের ইচ্ছা, মোহ এবং অভিমান। শিবের হস্তের ত্রিশূল ঐ তিনটী গ্রন্থিকে শিথিল করিবার চেষ্টা মাত্র। শিব ধর্ম্ম-গুরুকেই জানিতে হইবে। ধর্ম্মের সংগঠন নাই। সংগঠন সব সময়ই বিষ্ণু-কেন্দ্র-শক্তি। বর্ত্তমান সময় পৃথিবীর ধর্ম্মগুলি সংগঠনে আবদ্ধ হইয়া যাওয়ার দরুণ ধর্ম্মের আসল উদ্দেশ্য ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যেখানে সংগঠন সেখানে মোহ আসিবেই। সঙ্ঘকর্ত্তার যতই প্রশংসা কর না কেন তিনি বিষ্ণু-কেন্দ্রের ধন, জন, ও ভোগে আবদ্ধ হইবেনই। শক্তি-স্তরে দাঁড়াইয়া সংগঠনে মোহ আসে না; অর্থাৎ আসুরিকতার বিরুদ্ধে সংগঠনে মোহ নাই। যতক্ষণ অভিমান জীবিত আছে (যতক্ষণ রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হয় নাই) ততক্ষণ যে কোন সময় মোহ আসিতে পারে। শক্তি-স্তরের

বিচারযোগ্য ভিত্তি না থাকিলে সংগঠনে মোহ আসিবে। যুদ্ধই শক্তি-স্তরের প্রধান ভিত্তি। সেই যুদ্ধের দুইটা দিক—তাহার একদিকে আসুরিকতা ধ্বংশ, অন্যদিকে নিজের অজ্ঞানতা নাশ করা।

যাহা হউক মানুষ মাত্রই কোন না কোন ধর্ম্ম মানিয়া চলে। ধর্ম্ম মানা মানুষের যেন প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বাভাবিক স্বভাব-বৈচিত্র্য। কিন্তু গুরুদের দোষে সেই ধর্ম্মও বর্ত্তমান সময় মোহে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। গুরুতে যে শক্তি নাই শিষ্যে সে শক্তি আসা খুবই কঠিন (অবশ্য অসম্ভব নহে)। শক্তি-কেন্দ্র-লক্ষ্য পুষ্ট শিষ্যকে কোথাও আটকাইয়া রাখা যায় না ; সে শিষ্য অগ্রসর হইবেনই। মানুষমাত্রই যদি শক্তি-কেন্দ্রের আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করে তবে সমাজের বিশেষ কল্যাণ হইবে। ঋষিগণ বিভিন্ন স্তরের যে কর্ম্ম এবং অনুভূতির ভিত্তি সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পরিচয় লইয়া অগ্রসর হওয়াই ভাল। ইহাতে সমাজের উন্নত বিকাশের পথ সহজ হইবে। শিক্ষক, নেতা, সমাজকর্ত্তা এবং গুরুকে শক্তি-স্তরের আদর্শে আজই পাওয়া যাইবে না। তবে ছাত্র, সঙ্ঘ-সভা, সমাজবাসী এবং শিষ্য যদি উন্নত আদর্শ বুঝিতে পারেন তবে একদিন সবই সহজ হইবে। সুতরাং ধর্ম্ম মানার সঙ্গে আরও এমন কিছু মানার প্রয়োজন যাহাতে বিকাশের পথ সহজ হয়। একজন ধর্ম্মগুরুর শক্তি একজন সমাজকর্ত্তা হইতে অনেক বেশী এবং ব্যাপক। ধর্ম্মগুরু যদি নিজের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন তাঁহার দায়িত্ব এই মানব-সমাজে একজন সমাজ-কর্ত্তা হইতে কত বেশী। ভোগী, মোহী এবং অভিমানীকে ধর্ম্মগুরু এমন কৌশলে সংযত রাখেন যাহাতে সমাজের অনিষ্ট হইতে না পারে। ধর্ম্মগুরু সমাজ কর্ত্তাদিগকে অতি কৌশলে উপদেশ দিয়া থাকেন। সাধনা সাহায্যে বিজ্ঞানময়কোষের সন্ধান পান নাই এমন মানুষ ধর্ম্মগুরু হইলেই অসুবিধা হয়, কারণ বিজ্ঞানের

স্তরে না আসিলে ইচ্ছা, মোহ এবং অভিমান মুক্ত হওয়া যায় না। বিশেষ করিয়া কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছেন এমন শক্তিশালী সাধক না পাইলে যাকে তাকে গুরু করা কর্ম্মীর এবং জ্ঞানেচ্ছুর প্রায়ই মঙ্গলের কারণ হয় না। প্রত্যেক জীবের সঙ্গে প্রত্যেক জীবের প্রাকৃতিক সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ বিকৃত হইলে অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। কতকগুলি সমাজ ধর্ম্মের নামে প্রতিষ্ঠিত হইবার দরুণ মানুষের আত্ম-বিকাশের পথে বিশেষ বাধার কারণ হইয়া রহিয়াছে। সেই সব ধর্ম্ম ধর্ম্মের স্থানে মোহকে প্রচার করিয়া থাকে। সেগুলিকে ধর্ম্ম না বলিয়া সমাজ বলিলেই ভাল হয়। এখন ধর্ম্ম বলিতে লোকে যাহা বুঝিতেছে তাহা ধর্ম্ম মোটেই নহে। সেগুলিকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি লোক নিজেরা সুবিধা ভোগ করিতেছে এবং অন্যকে মনুষ্যত্বহীন করিয়া গড়িতে সুবিধা পাইতেছে। গুরুকে সমাজের মোহ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আত্মার কোলে এবং আত্মার আদর্শে আত্মদান করিতে হইবে। আত্মার সন্ধান মানব-সমাজকে দান করিয়া তিনি মানবকে দুর্ব্বলতাহীন কর্ম্মী করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিবেন। অসুরকে কি করিয়া দমন করিতে হয় তাহারও ইঙ্গিত তিনি দিতে থাকিবেন। গুরু সর্ব্বজীবের মধ্যে একই আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন। সুতরাং তিনি সকল মানুষের আত্ম-বিকাশের পথ সহজ করিয়া দিবেন। গুরু শিষ্যকে আত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করিবেন এবং কেমন দৃঢ় হইয়া অসুরকে ধ্বংশ করিতে হয় তাহাও শিখাইবেন। গুরু সংগঠনে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু কোন ধর্ম্মের নামে ভোগের সুবিধার জন্য সংগঠন করিবেন না। ইহাই দেবীহস্তের "ত্রিশূল"।

বর্ত্তমান সময় গুরুগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্তরে শিষ্যগণকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া শিষ্যের আত্মবিকাশে বাধা প্রদান করিতেছেন। যিনি ভগবৎ প্রেমে মত্ত হইয়াছেন (অনুভূতিতে সূর্য্য-স্তরে আসিয়াছেন।

তিনি শিষ্যকে নাচাইতে কাঁদাইতে পারিলেই সুখী হন। আবার যিনি সর্ব্বত্যাগী (অনুভূতিতে গণেশ-স্তরে প্রতিষ্ঠিত ; তিনি শিষ্যকে কৌপীন পরাইয়া ভিক্ষুকের দলে টানিতে চেষ্টা করেন। যিনি ধ্যান-যোগী (বিষ্ণু-স্তরের অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত) তিনি শিষ্যকে বৃত্তি নিরোধের হিসাব দেখাইতে চেষ্টা করেন। যিনি শান্ত অবস্থা লাভ করিয়াছেন (অনুভূতিতে শিব-স্তরে আসিয়াছেন) তিনি শিষ্যকে বুদ্ধিশক্তি, শিক্ষাশক্তি, সংগঠন-শক্তি এবং কর্ম্ম-শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া শান্তির নামে জড় বা অকর্ম্মণ্য করিতে নিযুক্ত হন। গুরু শিষ্যকে শিষ্যের অন্তরস্থিত সমস্ত শক্তির সহিত সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন,—অর্থাৎ অন্তর্বিকাশে বিশেষ সাহায্য করিবেন। অন্তর্বিকাশ ধীরে ধীরে হয়। একেবারে এবং এক জন্মে বিকাশ নাও হইতে পারে। গণেশ-স্তর হইতে তাহা আরম্ভ এবং শেষ পর্য্যন্ত গণেশই প্রধান সহায়। গুরুশক্তির বিশৃঙ্খলায় ভারতের কর্ম্মশক্তি এমন হীন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে যে তাহা ভাবিতে ভয় হয়। যাহা হউক ফলে গুরুদের অভাবে চেলাগণ কোন পথেরই হন না। শেষকালে গুরুর নামে দোকান চালাইবার চেষ্টা করিয়া বড় বড় মঠ মন্দির গড়িয়া মহান্ত হন এবং অতি ছোট বৈষয়িক সম্বন্ধে জড়িত হইয়া ঝগড়ার প্রবৃত্তি লইয়া দল গড়িতে প্রবৃত্ত হন ; কেহ বা বংশ পরম্পরায় গুরুগিরি করিবার ফন্দি আঁটিয়া নানাপ্রকার ঘৃণিত স্বার্থ-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন। সমাজেরও এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে যে কোন প্রকার উন্নত লক্ষণ বুঝিতে পারে এমন লোক অত্যন্তই কম। একদল বিদ্বেষী অন্য দল বোকা ভক্ত।

(মোহের বাহিরে দাঁড়াইয়াছেন এমন গুরু আমাদের চক্ষে খুবই কম পড়িয়াছে। ছেলের জন্য, ভায়ের জন্য আমার সম্পত্তিগুলি স্থায়ী হইয়া থাকিবে এরূপ মনোবৃত্তি প্রায় সাধকেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইঁহারা আবার অন্যের অজ্ঞানতা ভাঙ্গিবার জন্য ধর্ম্মকথা বলিতে সাহস পান, ইহাই আশ্চর্য্য! গুরু গৃহী হউন বা সন্ন্যাসী হউন জ্ঞানের পূর্ণক্ষেত্র হওয়া চাই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় গুরুগিরি এখন বাক্-চাতুর্য্যের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ চাতুর্য্যের আড়ালে ভোগও আছে মোহও আছে। সমাজের কি ভীষণ বিপদ!)

বহুদিন অবধি ধর্ম্মশক্তির উপর কলঙ্ক আসিয়া গিয়াছে। গুরুগণের নামে নানাপ্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে কোন সময়েই এরূপ ছিল না। যাহা হউক এই সব সঙ্ঘের যে লক্ষ্য কি তাহা বুঝাই যায় না। ধর্ম্মশক্তির প্রধান কর্ম্ম মানুষকে শক্তি-স্তরের সন্ধান দেওয়া অর্থাৎ মানুষ বা মানুষের রীতিনীতি যাহাতে সহজে পূর্ণ বিকাশের স্তরে আসিতে পারে তাহা চেষ্টা করা। কিন্তু কোন সঙ্ঘের মধ্যেই এরূপ কোন আভাষ নাই। কেমন একটা সং দেখাইবার চেষ্টা মাত্রই দেখা যায়।

মানুষের আত্ম-বিকাশের পথে সাহায্য করিবার জন্য সমাজে কর্ম্মের একটা বিভাগ আছে। মাতা-পিতা পালন করেন, শিক্ষক সর্ব্ববিধ জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সহিত পরিচয় করাইয়া শিষ্যের জ্ঞান উন্মেষের সাহায্য করেন। শিক্ষার পর মানুষ উপার্জ্জনক্ষম হইয়া সমাজে প্রবেশ করে, সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পালনের ভার গ্রহণ করে। সামাজিক বিকাশ সেই সময় তাহার হইতে থাকে। গুরুর কাজ ইহার একটীও নহে। গুরু তাহাকে তাহার বিকাশের মধ্যে যে সব ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে সেইগুলিই সংশোধন করিবেন। তাহাকে তাহার পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, সমাজ, দেশ প্রভৃতির বিকাশ-অনুকূল করিয়া তো গড়িবেনই অধিকন্তু আত্মার পূর্ণ বিকাশের পথে যে সব অনুভূতি শিষ্যের জন্য প্রয়োজন সে দিকেও পরিচালিত করিবেন। সংগঠন সমাজধর্ম্ম, গুরুর এত সময় কোথায় যে সংগঠনের

কথা ভাবিয়া দিন কাটাইবেন? সংগঠন-বিজ্ঞান এবং আত্ম-জ্ঞানের পথে সাহায্য করিবার কৌশল এক নহে। গুরু যে কোন সংগঠনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে সমাজের প্রকৃত উপকার হইবে। মানুষও যদি প্রকৃত ভোগ, মোহ এবং অভিমানহীন গুরু বাছিয়া লইতে পারেন তবে সমাজের বিশেষ কল্যাণ হইবে।

গুরুর কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব এ জগতের উপর অত্যন্ত বড়। দল গড়িয়া যদি তিনি মানুষকে মোহের দিকে টানিতে থাকেন তবে তাঁহার দায়িত্ব খর্ব্ব হইয়া যাইবে। দল সব সময়ে কর্ম্মিগণই গড়িবেন। গুরু ধনীকে বলিবেন বিকাশের পথে অগ্রগামী কর্ম্মীদিগকে সাহায্য বা উপযুক্ত পাত্রে দান করিতে। আবার গরীবকে বলিবেন উপার্জ্জনের পথে নিষ্ঠা রাখিতে। দোকানদারকে বলিবেন ভেজাল না দিতে, আবার খরিদ্দারকে বলিবেন দেখিয়া শুনিয়া খরিদ করিতে। সকলের আত্ম-বিকাশের পথে সব দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি প্রত্যেকটী উপদেশ দিয়া থাকেন। তিনি খবরের কাগজ না পড়িয়াও দেশের এবং দশের মঙ্গলের জন্য যাহা প্রয়োজন সেরূপ উপদেশ দিতে পারেন। সমাজের শান্তির সামঞ্জস্যের জন্য যাহা প্রয়োজন তিনি তাহা সবই বুঝিতে পারেন। এরূপ দায়িত্বের কথা না বুঝিয়া তিনি যদি একটা সঙ্ঘে বদ্ধ হইয়া যান এবং একটা প্রকাণ্ড সঙ্ঘ পালনের কথাই ভাবিতে থাকেন তবে আর্থিক চিন্তায় তাঁহাকে এতটা ব্যস্ত হইতে হইবে যাহাতে তিনি বহুস্থানে উপযুক্ত বিচার অবলম্বন করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মের নামে সংগঠনগুলির মধ্যে কিছুদিন বেশ অন্তরঙ্গভাবে মিশিলে এরূপ বহু ঘটনার পরিচয় যে কেহ পাইতে পারেন। গুরুকে কায়মনোবাক্যে শিবের স্তরের জ্ঞানীর আদর্শ অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই দেবীর হস্তের "ত্রিশূল"।

গুরুর সঙ্গ লাভ করিবার পরেই মানুষের ক্ষুদ্র অন্তকরণ ধীরে

ধীরে সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং অন্যায় ও আসুরিক বিরোধ ভাবগুলি ধীরে ধীরে হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইতে থাকে। তখন শিষ্য মুখে বড় বড় কথা না বলিয়া নীরবে সমাজের আত্মবিকাশের চেষ্টায় নিজের অকৃত্রিম চিন্তা-শক্তি একটু একটু করিয়া নিয়োজিত করিতে থাকেন এবং বিশ্বস্তভাবে কিছু করেনও। গুরু সর্ব্বপ্রথম শিষ্যকে আত্মার অমরতার এবং নির্ম্মলতার কথা শুনাইবেন। পরে শিষ্য যখন যেমন স্তরে আসিবেন তখন তাহাকে সেই স্তরের দুর্ব্বলতাগুলির নিকট সাবধান করিয়া দিয়া আরও উন্নত স্তরের সন্ধান দিতে থাকিবেন। ভোগেচ্ছায় মত্ত হওয়া, মোহে আবদ্ধ হওয়া এবং অভিমানে আত্ম-বিস্মৃত হওয়া আত্মবিকাশের পথে বিপজ্জনক এ কথা অতি সুন্দর ভাবে ধরাইয়া দিবেন। ইহাই দেবীর হস্তের "ত্রিশূল"।

ধর্ম্মের স্তরে প্রত্যেক মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে আত্মবিকাশে সাহায্য করিতে হয়। কেহ যেন দল বাঁধার মতলবের মত একটা সাধারণ মতলব (scheme) আঁটিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর না হন। আত্মোন্নতির পথে নিজের বিবেক এবং নিজের সাধনাই প্রধান সহায়। গুরু তাহার পর যাহা হয় করিতে পারেন। গুরুকে আত্মবিকাশের পথে অবিচলিত হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। সেই সঙ্গেই অন্যকে সাহায্য করিয়া চলিতে হইবে। নইলে অন্যকে সাহায্য করিতে যাইয়া নিজে শক্তিহীন হইয়া যাইবেন। ধর্ম্মের নামে দল বাঁধা ভাল নহে। যত প্রকারের ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে সব সমাজ। প্রকৃত ধর্ম্মস্তরে প্রতিষ্ঠিতগণ আকাশের মত সীমাহীন উদার এবং বাতাসের মত স্বাধীন। দল বাঁধিলে তাহা সমাজই হইয়া দাঁড়ায়। দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মহাপুরুষগণ যতই দল গড়েন ততই মঙ্গল। গুরুগণ যখন সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন তখন জানিতে হইবে গুরুর মধ্যে বিষ্ণু-স্তরের বীজ আছে। অনেক স্থানে মোহই তাহার সংগঠনের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে, তিনি যতই

সংযত হইয়া অবস্থান করুন না কেন একদিন হয়ত অবতার হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিবেন বা বংশ-পরম্পরায় গুরুগিরির পথ খুঁজিবেন। বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতি না থাকিলে এরূপ গোলমাল হইয়া থাকে। যাহা হউক গুরু সব সময়েই শিবস্তরের জ্ঞানের অধিকারী হইলেই সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। ইহাই দেবীর হস্তের "ত্রিশূল"।

"কৃপাণ"--কৃপাণ তরবারীকে বলে। এই অস্ত্রই শক্তি-স্তরের বিশেষ অস্ত্র। শক্তি-পূজায় কৃপাণকে ধর্ম্মপাল (ধর্ম্মের রক্ষক) নাম দেওয়া হইয়াছে। জীবের পূর্ণতার পথে স্বাভাবিক গতির নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে আসুরিক শক্তি বাধা দেয় বা রুদ্ধ করে। 'কৃপাণ" সেই অসুরকে ধ্বংশ করিবার অস্ত্র। "কৃপাণ" মানুষের স্বাভাবিকধর্ম্ম সত্য, প্রেম এবং শান্তিকে রক্ষা করে। "কৃপাণ" জ্ঞানীর নির্ম্মল জ্ঞান (অজ্ঞান-ছেদনকারী) এবং কর্ম্মীর হস্তের দৃঢ় অস্ত্র (অসুর ধ্বংশকারী)। শক্তি স্তরে আসিলেই জ্ঞানী পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন এবং কর্ম্মী প্রকৃত দুর্ব্বলতা-হীন কর্ম্মী হন। ইহার পূর্ব্বস্তর পর্য্যন্ত কর্ম্মী এবং জ্ঞানী উভয়েই দুর্ব্বল। এ সব দুর্ব্বলতার স্তরে প্রকৃত ধর্ম্ম পালন হয় না।

সাধক! অন্যায় দেখিলে প্রতিবাদ করিতে ভয় হয় কি? অন্যায় দেখিলে তোমার শরীরে অগ্নির উদ্দীপন হয় কি? যদি ভয় হয় তবে ফিরিয়া যাও। এখনো তোমার শক্তি-সাধনার সময় হয় নাই। যদি সত্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে তোমার ভয় না-ই হয় তবে তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিব—তুমি নিজে যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে কর (যাহা তোমার অধিকারে আছে) তাহা তুমি সকল মানবের আত্ম-বিকাশের পথকে সহজ করিবার জন্য নিয়োজিত করিতে সঙ্কুচিত হও কি? অর্থাৎ তুমি নিজে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবে তুমি কোথাও মোহে বদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাস কি না? যদি এরূপ মনোভাবও তোমার না হইয়া থাকে তবে তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা

করিব—দেখ, অন্যকে ছোট করিয়া রাখিয়া নিজেকে বড় করিতে ইচ্ছা হয় কি? (কাহারও সহিত এমন ব্যবহার ভাল নহে যাহাতে সে নিজেকে ছোট বা হীন মনে করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যাহারা দৈবী সম্পদের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে না এমন লোকের সঙ্গে অস্বাভাবিক উদার ব্যবহার করিলে সে লোক বিশেষ অনিষ্ট করিবারই পথ পাইবে।) এইরূপ মনোভাব যদি না হইয়া থাকে আর যদি তুমি উৎসাহী, অধ্যবসায়ী এবং উদ্যোগী হও তবে তুমি শক্তি সাধনায় প্রবেশ করিতে পারিবে। তুমি পূর্ণ কর্ম্মী এবং পূর্ণ জ্ঞানী হইতে পারিবে। মানুষের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহা তুমি পালন করিতে পারিবে এবং মানুষের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহা তুমি রক্ষাও করিতে পারিবে।

ভারতবর্ষের বহু স্থানে এখনও মহাষ্টমী আদি বিশেষ শক্তিশালী পর্ব্বদিনে * কৃপাণের পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার আসল মর্ম্ম বর্ত্তমান

---

* শক্তিশালী পর্ব্বদিন। শক্তিশালী পর্ব্বদিন সম্বন্ধে কর্ম্মী এবং সাধকগণের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ ঐ সব দিনগুলি শক্তি লাভের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। বর্ত্তমান সময় দেশের এই ঘোর অধঃপতনের যুগে শক্তিশালী দিনগুলি নিতান্তই হেলায় নষ্ট হইয়া থাকে। ভারতের অতীত গৌরবের যুগে শক্তিশালী দিনগুলি কত যে আদরের সহিত অতিবাহিত করা হইত তাহার কথা রামায়ণ মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণগুলি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। যে সব দিনে উৎসবাদি কর্ম্মি এবং সাধকগণকে করিতে দেখা যায় তাহা কেবলই কোন কোন মহাত্মার জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মহাত্মাদের স্মৃতিপূজার দ্বারা বালকগণকে উৎসাহ দেওয়ার বিধি প্রাচীনকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু সেই স্মৃতিপূজায় সাধক বা কর্ম্মীদের শক্তি সঞ্চয়ের কাজ বিশেষ হয়না। বর্ত্তমান সময় শক্তি পূজার দিনের যত আদর শক্তি সঞ্চয়ের দিনের তেমন আদর নাই। বহুদিন বৈষ্ণববাদ বা লীলা প্রধান ধর্ম্মের প্রাবল্যে আজ মানুষ তাহা ভুলিয়াই গিয়াছে। লীলাবাদ প্রধান ধর্ম্ম যে কেবল প্রচার করিবার কৌশল মাত্র ইহা জানা প্রয়োজন। যাঁহারা শক্তিশালী হইতে চাহেন তাঁহারা শক্তিশালী দিনে নিজের যন্ত্র এবং অস্ত্র আদির পূজা করিবেন।

সময় প্রায় কেহ অবগত নহেন। পশ্চিম দেশে কোন কোন ক্ষত্রিয়, ক্ষেত্রে এবং কায়স্থ বংশে ও রাজসম্মানে প্রতিষ্ঠিত বহু ব্রাহ্মণ বংশে ইঁহার পূজা এখনও বেশ আড়ম্বরের সহিত হইতে দেখা যায়। বঙ্গ-দেশেও ইঁহার পূজার ব্যবস্থা আছে। শিখগণের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ এই কৃপাণকে নিত্য পূজার সামগ্রী করিয়া নিজের শিষ্যগণের হাতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। নেপালী ক্ষত্রিয়গণ ও কৃপাণ ছাড়া এক পা চলেন না। দুঃখের বিষয় তাহা এক্ষনে বহুস্থানে ধর্ম্মের সংএ পরিণত হইয়া গিয়াছে। কেহ বা নিতান্ত পশুর মত ইঁহার ব্যবহার করিয়া থাকে। যে সব প্রাচীন বংশে বংশ পরম্পরায় ইঁহার পূজা হইয়া থাকে তাঁহারাও ইঁহার পূজা করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের গৌবব কাহিনী স্মরণ করিয়া মনে মনে আত্মশ্লাঘা মাত্র অনুভব করিয়া থাকেন। নিজেরা শৃগাল থাকিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের সিংহ বিক্রমের মূল্যই বা কি? ইঁহার যে কি কর্ম্ম আছে তাহা বুঝা প্রয়োজন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল একদল মানুষকে শক্তি-স্তরের আদর্শ গ্রহণ করাইয়া দেওয়া। যাহার সংক্ষেপ উদ্দেশ্য সত্যে, প্রেমে এবং নিরভিমানে নিজেকে গড়িয়া লওয়া এবং আসুরিকতার বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করা। অসত্য, অপ্রেম, এবং অশান্তিকে জগৎ হইতে দূর করিবার জন্য জীবনকে চালিয়া দিতে হইবে। ইহারই নাম "কৃপাণ"। কৃপাণ চালনার অভ্যাস করিলে মনে তেজের সঞ্চার হয়। শুধুই বেলপাতা ও ফুল চন্দনে পূজা করিলে তাঁহা পাওয়া যায় না। শক্তিশালী দিনে ইঁহার পূজা

তাঁহারা সাধক বিশেষ ভাবে জপ এবং হোমাদির অনুষ্ঠান করিবেন। যাঁহারা উৎসবাদি করিবার পক্ষপাতী তাঁহারা ঐ সব দিনেই পূজা এবং হোমাদির বাদ উৎসব করিবেন। ইহাতে জাতিকে বেশী শক্তিশালী করিবে। শক্তি শালী দিন—শারদীয় এবং বাসন্তী নবরাত্র, মাঘী পঞ্চমী, জগদ্ধাত্রী পূজার তিথি, কালী পূজার তিথি, শিব রাত্রি, জন্মাষ্টমী চৈত্র ও পৌষ সংক্রান্তি ইত্যাদি

করিয়া চালনা করিবার প্রথা ভারতের বহুস্থানে দেখা যায়। শারদীয়া বিজয়ার দিবস রাজপুতদের মধ্যে এই উৎসব বিশেষ সমারোহে হইয়া থাকে।

আসুরিক শক্তিকে বা অসুরকে ক্ষমা করা নীতিবিরুদ্ধ। সূর্য্যশক্তি জগৎকে সুস্থ রাখিতে পারে না। বিষ্ণুশক্তিও জগতের শান্তির জন্য যথেষ্ট নহে। ধর্ম্মশক্তিও দুর্ব্বল। প্রত্যেক স্তরের দুর্ব্বলতার আড়ালে আসুরিক শক্তি পুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু শক্তি-স্তরের আদর্শে সে কথা খাটে না। কারণ এ স্তরের মানুষ নিজে দুর্ব্বলতাহীন। যাহারা ভোগে বদ্ধ ; স্বজাতি, সম্প্রদায় ও স্ত্রী পুত্রাদির মোহে মুগ্ধ এবং যাহারা আপনাদিগকে বিশ্ব মানবতা হইতে স্বতন্ত্র মনে করে (অর্থাৎ যাহাদের অভিমান মলিন) তাহারা শক্তি স্তরে আসিতে পারিবে না। ত্রিশূল ভেদ করিয়া শক্তি-স্তরে আসিতে হয়। আবার ভাবাবেশের মোহ, ধ্যানাবস্থার সুখের মোহ এবং সমাধির শান্তির মোহ কাটাইয়া 'কৃপাণ অবলম্বন করা চলে।

অস্ত্রগুলিকে দেবী ঊর্দ্ধমুখী করিয়া ধারণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ দেবী অস্ত্রগুলিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। চলিত কথায় ইহাকে 'সঙ্গিনী' অবস্থা বলে। দেবী যেন যে কোন মুহূর্ত্তে রণক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত। অর্থাৎ একেবারে অনলস স্বভাবে এ স্তরের মানুষ নিজের চরিত্র গঠন করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা সৈন্য বিভাগে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ভাবনার সময় সেখানে না সর্ব্বদাই প্রস্তুত। শরীর দৃঢ়, কর্ম্মঠ ও সহিষ্ণু। আবার মন উদ্বেগ শূন্য, নিশ্চিন্ত, ভীতিশূন্য, এবং তেজ-মণ্ডিত।

শক্তি-স্তর বলিতে রাজশক্তিকেই বুঝিতে হইবে। এ রাজশক্তি অর্থে কোন রাজা বিশেষের শক্তি নহে। রাজশক্তি অর্থে মানব মাত্রেরই শাসন-বিভাগ। মানব মাত্রেরই শিক্ষা-বিভাগ বলিতে

সূর্য্য-স্তর, সমাজবিভাগ বলিতে বিষ্ণু-স্তর, ধর্ম্ম বিভাগ বলিতে শিবস্তর এবং শাসনবিভাগ বলিতে শক্তি-স্তর বুঝিতে হইবে। মানুষের অন্তরে এই সব কেন্দ্রের বিকাশ আছে বলিয়াই মানুষ বহির্জগতে ঐরূপ বিভিন্ন প্রকার বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যাহা হউক প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ঋষিগণ রাজাকে এমনভাবে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেন যাহাতে শক্তি-স্তরের আদর্শ রাজার শাসন নীতিতে ফুটিয়া উঠিতে পারে। শাসন শক্তির পরিচালকগণ যদি শক্তি-স্তরের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া আসুরিক স্তরের আদর্শ গ্রহণ করে তবে মানুষের ভীষণ বিপদ বলিতে হইবে। বর্ত্তমান সময় শাসন যন্ত্রের সংশোধনের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ "রাজশক্তির আসুরিক আদর্শ গ্রহণ"। সর্ব্বত্র শক্তিশালী রাজশক্তিগুলি মানুষকে শোষণ করিয়া একদল বা দেশ বিশেষের মানুষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য বহু প্রকার মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতবাদকে সমাজের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমাদের কথা শাসনযন্ত্র রাজাই চালান বা প্রজাই চালান অথবা অন্য যে কোন উপায়ে ইহা পরিচালিত হউক না কেন তাহাতে আসে যায় না। যতক্ষণ শাসন যন্ত্র শক্তি-স্তরের আদর্শ গ্রহণ করিবে না ততক্ষণ শক্তির প্রতিষ্ঠা হইবে না। যে ভোগে বদ্ধ, যে মোহবদ্ধ ও যে অভিমানে বদ্ধ সে রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহে। আবার ভোগ, মোহ এবং অভিমানবদ্ধ কোন সঙ্ঘও যে একটা আসুরিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে এরূপ ভরসা করাও বৃথা। যাহা হউক আমাদের কথা সমাজকে এবং মানুষকে শক্তি স্তরের আদর্শে গঠন করিবার জন্য কর্ম্মিগণ (গুরু, সমাজকর্ত্তা, শিক্ষক এবং যুবকগণ) যদি অগ্রসর হন তবেই ইহার প্রতিকার আছে, নইলে

নহে। যে রাজার আসনে বসিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া আসুরিক আদর্শকে ধরিয়া রাখিবে তাহাকে আসন হইতে উঠাইয়া দেওয়ার শক্তি কেবল শক্তি-স্তরের আদর্শগ্রাহী জন সাধারণেরই থাকিতে পারে।

শক্তি স্তরের শঙ্খ, চক্র, ত্রিশূল এবং কৃপাণের সার মর্ম্ম এই যে শিক্ষা-বিধি এবং শিক্ষক শক্তিস্তরের আদর্শে প্রস্তুত হইবে। ইহা কোন সম্প্রদায় বা দেশ বিশেষের স্বার্থের সুবিধার জন্য এবং সম্পদায় বিশেষকে বিকাশে বাধা দিবার জন্য হইবে না। সংগঠন বা সমাজ গঠন (চক্র) ভোগের জন্য ও সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধার জন্য না করিয়া সকলের আত্ম বিকাশের অনুকূল করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। মানব সমাজকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে অন্যায় হইতেই প্রতিবাদ-'শঙ্খ' চারিদিক হইতে বাজিয়া উঠে। জ্ঞানিগণ বা গুরুগণ বাছিয়া বাছিয়া কর্ম্মী এবং মুমুক্ষুগণকে সাধনা এবং কর্ম্মের পথ ধরাইয়া আত্মার ছাঁচে গড়িয়া দিবেন। সেই সব কর্ম্মী শিক্ষা এবং সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিবেন ও আসুরিকতাকে ধ্বংশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন। সেই ভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠ, নিষ্কলঙ্ক, ত্যাগী সাধকগণই ভবিষ্যৎ গুরুর আসন গ্রহণ করিবেন (ত্রিশূল)। চেষ্টা করিয়া কাহাকেও গুরু বা নেতা করিয়া প্রস্তুত করা যায় না। সে সব উপাদান লইয়া যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা সমান্য ইঙ্গিতে অন্তরকে বিকাশ করিয়া লইতে পারেন। রাজা এবং রাজবিধি শক্তিস্তরের আদর্শে প্রস্তুত করিতে হইবে। শাসন কর্ত্তাদেরও শক্তিস্তরের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। যাঁহারা শক্তি স্তরের আদর্শকে বুঝেন এমন লোকই মন্ত্রী বা রাজ-সভাসদ হওয়া প্রয়োজন। রাজশক্তির যদি কুমতলব থাকে তবে তাঁহারা তাহা হইতে দিবেন না। তখন প্রজা প্রথম শঙ্খ বাজাইবেন, পরে কৃপাণ ধারণ করিবেন। যে বুঝিয়া জানিয়া সংশোধন করে না কৃপাণ তাঁহাকে ক্ষমা করেন না। আসুরিক ভাবদুষ্ট রাজশক্তি যতটা শক্তিশালী শান্তিস্তরের

আদর্শে প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞাশক্তি তাহা হইতে বহুগুণ বেশী শক্তিশালী হইয়া থাকে। সুতরাং প্রজ্ঞাশক্তির ভীতির কারণ নাই।

অনেকে মনে করে যোগবল দ্বারা আসুরিক শক্তিকে ধ্বংশ করিয়া একটা অঘটন ঘটান যায়। এরূপ ধারনার কোন ভিত্তি নাই। প্রত্যেক কর্ম্মেরই বিজ্ঞান আছে। কর্ম্মের বিজ্ঞান জানিয়া সেই ভাবে আত্ম-গঠন করিয়া শক্তিশালী হইতে হয়। যাঁহারা আসুরিক ভাবদুষ্ট তাঁহারা কর্ম্মবিজ্ঞান জানিয়াই শক্তি অর্জ্জন করেন এবং প্রভুত্ব করেন। আবার যাঁহারা কর্ম্মযোগী তাঁহারাও শক্তিবিজ্ঞান—বুঝিয়াই শক্তি সঞ্চয় করেন এবং আসুরিক শক্তিকে ধ্বংশ করেন। যাঁহারা প্রকৃতই যোগী স্তরের মহাপুরুষ তাঁহারা ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানুষকে নূতন ভাবে জাগাইয়া দিতে পারেন। যাহা হউক নিজেকে প্রাণপনে শক্তির ছাঁচে ঢালিয়া যাইতে হইবে এবং যখন যেটুকু ক্ষেত্র পাওয়া যায় সেইরূপ কাজ করিয়া যাইতে হইবে। একটা পশুর নিকটও তাহার কর্ম্মক্ষেত্র বিদ্যমান। বড় বড় মতলব আঁটিয়া নিজের কর্ম্মশক্তি নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আসুরিক অত্যাচারে মানুষ যদি অন্তরে ব্যথিত হইয়াই থাকে তবে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবেই। শক্তিশালী কর্ম্মিগণ সে সময় জন্ম লইবেনই। ইহা প্রাকৃতিক বিধান। তুমিও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিও না। নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখ। নিজের চিন্তার দৃঢ়তা থাকিলে অতি সামান্য কর্ম্মের মধ্যেই মানুষ এমন আলো পাইবে যাহাতে সমাজ নূতন ভাবে গঠিত হইবার জন্য পথ পাইবে, ভাবিলে তাহা হইবে না।

আইন করিয়া নিয়ম করিয়া বা বড় বড় মতলব আঁটিয়া মানুষকে গড়িতে পারিবে না। রাজশক্তি যখন আসুরিক আদর্শ গ্রহণ করে তখন কেন্দ্রিয় নিয়মেই গোলযোগ করিয়া রাখে। সেই সব নিয়মকে সংশোধন করিতে না পারিলে দুই চারটা আইন বদ্‌লান না বদ্‌লান

সমান। মানুষ যখন মনুষ্যত্বের উপাদানকে ত্যাগ করিয়া হীন মনো-ভাব দ্বারা নিজেকে গঠন করিয়া লয় তখন জানিতে হইবে কেন্দ্রিয় শাসনে ভুল আছে। নইলে ঐরূপ হইতেই পারে না। মানুষকে ফাঁকি দিবার জন্য যদি কেন্দ্রিয় শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে, তখন আইন বাঁচাইয়া যে মানুষ মাত্রই সত্যকে নষ্ট করিয়া অন্য মানুষকে বঞ্চিত করিবে ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং পথ আইনের মধ্য দিয়া সহজ হইবে না। নিজে নিজের অন্তরে প্রবেশ কর। নিজের অন্তরকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেখ। মনুষ্যত্বের উপাদান সেখানে কি আছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। নিজেকে সেই প্রাকৃতিক উপাদানে প্রস্তুত কর এবং কর্ম্মক্ষেত্রে যখন যাহাকে পাইবে তাহাকেও সেই উপাদানে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা কর। কথার মধ্য দিয়া মানুষ গড়া যায় না। কর্ম্মের মধ্য দিয়া মানুষ গড়িতে হয়। নিজের দৈনন্দিন কর্ম্ম অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নিত্যই সম্পন্ন করিও। প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিও। নিত্য শরীর চালনার অভ্যাস রাখিও। সময় মত স্নান আহারের অভ্যাস রাখিও। অতি সামান্য সময়ও নিজের অন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইও। খুব শীঘ্রই তুমি বুঝিতে পারিবে। নিজেকে গড়িবার এই কয়টী প্রধান উপাদান ত্যাগ করিয়া অন্যকে গড়িতে সুবিধা হইবে না।

দেবীর হস্তের 'শঙ্খ এবং চক্র' অর্থে শক্তিস্তরে দাঁড়াইয়া বিষ্ণুশক্তির (সমাজ) অবলম্বনকে জানিতে হইবে। সূর্য্যশক্তি বিষ্ণুশক্তিরই অংশ। সুতরাং দেবীর সহিত যে সূর্য্যশক্তি সংযুক্ত রহিয়াছে ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। ত্রিশূল অস্ত্র দেবীর হস্তে থাকিবার কারণ শিবের শক্তিও যে শক্তির সহিত সংবদ্ধ তাহা বুঝা যায়। গণেশ এবং সূর্য্যের জন্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী যাঁহারা আলোচনা রাখেন, তাঁহারা জানেন গণেশ শিব এবং শক্তি অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

সূর্য্য বিষ্ণু (কশ্যপ) এবং শক্তির (আদিতির) অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সূর্য্যে কতকটা বিষ্ণু-শক্তি বিদ্যমান্। তাই সূর্য্যের প্রাণটা দুর্ব্বল। সূর্য্যকেন্দ্রপুষ্ট কর্ম্মিগণ কঠোরভাবে অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে পারে না, সহজেই চিন্তিত হন—মরিতে এবং মারিতে। সূর্য্যের অন্য অংশটা শক্তি হইতে আসিয়াছে, তাই সূর্য্য স্তরের কর্ম্মী অসুরের বিরুদ্ধে খুব স্পষ্টভাবে যুদ্ধের ঘোষণা করিতে পারেন। গণেশ শিবের পুত্র; তাই এ স্তরের কর্ম্মিগণ ভবিষ্যৎ ভাবিতে পারেন না, সহজেই কর্ম্মে নামিয়া পড়েন। গণেশে শক্তির অংশ থাকিবার দরুণ তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে অসুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। পুরাণের মতে দৈত্য এবং দেবতাদের পিতা একই কশ্যপ, কিন্তু মাতা দুইজন। সূর্য্য যে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন না ইহা তাহার পিতৃ মোহ। গণেশ শিবস্তরের মানুষকে (মজুর আদিকে) বেশী ভালবাসেন। শিক্ষা এবং সঙ্গ প্রভাবে শিব স্তরের মানুষ সহজেই অন্যায় ভাবে বিষ্ণুকেন্দ্র পুষ্ট হইয়া যায় এবং বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট স্বার্থবাদিদের মত স্বার্থেরই পিছে ধাবিত হইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। গণেশ এ কথা বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের পিছনে সহজেই ঝুঁকিয়া পড়েন। ইহাও গণেশের পিতৃ মোহেরই ফল জানিতে হইবে। দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট কর্ম্মিগণকেও গণেশ আসুরিক বিষ্ণু বলিয়া ধারণা করেন। ইহা গণেশের বিশেষ দুর্ব্বলতা বলিতে হইবে। শক্তি স্তরের কর্ম্ম-বিকাশে কোনই দুর্ব্বলতা নাই। শক্তি সকলের সমর্থক, কেবল আসুরিকতা সহ্য করেন না। ইহাই হইল 'কৃপাণের' মর্ম্ম কথা।

গণেশের দুর্ব্বলতা যতই থাকুক না কেন গণেশই প্রকৃত কর্ম্মী এবং ত্যাগী। গণেশের নিজের বিচারে দৃঢ়তা থাকিবার দরুণ যেমন সহজে গণেশ কর্ম্মে অগ্রসর হন তেমন সহজে বেশী বুঝিতে পারেন। মস্তিষ্কের

কেন্দ্র পরিচয় সম্বন্ধে যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে গণেশ-কেন্দ্রটী একদিকে, আর শিব, বিষ্ণু,সূর্য্য ও মনের কেন্দ্র অন্য দিকে। গণেশ-কেন্দ্রই জীবকে বিকাশ করিবার প্রধান সহায়, ৪ কলার পর হইতে ৮ কলা পর্য্যন্ত বিকাশ গণেশ-শক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে। যাঁহারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত গণেশ-কেন্দ্র পুষ্ট হইবেন না তাঁহারা গেরুয়া পরিহিত সাধু, সুদীর্ঘ শশ্রু মণ্ডিত মহাপুরুষই বা বিশ্ব-বিশ্রুত নামী পণ্ডিতই হন ভোগ, মোহ এবং অভিমানের পরপারে দাঁড়াইতেই পারিবেন না। জীবন্মুক্তির আনন্দ কেবল গণেশই দিতে পারেন অন্যে নহেন। পূর্ব্বে শিব অংশে বলা হইয়াছে—শিবের মস্তকে যে চন্দ্র দেওয়া আছে তাহা অষ্টমীর চন্দ্র। (শিবের মস্তকে অষ্টমী, ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশীর চন্দ্র থাকিতে পারে, তবে অষ্টমীর চন্দ্রই শিবের মস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।) গণেশের কপালে চতুর্থীর চন্দ্র আছে। আমরা গণেশকে পঞ্চম কলা পুষ্ট অনুভূতির কেন্দ্রে স্থাপনা করিয়াছি। যে কোন জীবের অন্তঃকরণে জ্ঞানের চারি কলা বিকাশিত হইয়াছে তাহাদেরই বিচার করিবার শক্তির উন্মেষ হইয়াছে জানিতে হইবে। কিন্তু চারি কলা পুষ্ট বিচার শক্তি খুবই দুর্ব্বল, সে বিচার জীবকে কুবুদ্ধির পথেই বেশী পরিচালিত করে, সেই বুদ্ধি মনের অধীন বুদ্ধি মাত্র। বুদ্ধি যখন পঞ্চম কলায় দাঁড়ায় তখন সেই বুদ্ধি মনের বিষয় ভোগের বেগকে দমন করিয়া দিবার জন্য শক্তিমান হয়। (গণেশের মস্তকে চতুর্থী, পঞ্চমী ও পূর্ণিমার চন্দ্র থাকিতে পারে)। তাই আমরা গণেশকে পঞ্চম কলা পুষ্ট অনুভূতির কেন্দ্রে স্থাপনা করিয়াছি। যাহা হউক চতুর্থী তিথি গণেশ পূজার প্রশস্ত দিন বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সূর্য্য কেন্দ্র মাতৃত্বের কেন্দ্র। সূর্য্য কেন্দ্র পুষ্ট মানব খুব স্নেহশীল হইয়া থাকেন। সূর্য্য কেন্দ্র ষষ্ঠ কলাপুষ্ট কেন্দ্র। এ জন্য যাঁহারা সন্তানের মা হইতে ভালবাসেন তাঁহারা ষষ্ঠী দেবীর

উপাসনা করিয়া থাকেন। ষষ্ঠী দেবীর উপাসনা অর্থে জীব মাত্রকেই স্নেহ করা বুঝায়। ষষ্ঠী মূর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। এই ষষ্ঠ কলাই জাগরণ কলা, তাই এই ষষ্ঠী তিথিতেই মহাশক্তি দুর্গার বোধন হইয়া থাকে। একটা জাতিকে প্রচার করিয়াই জাগাইয়া দিতে হয়। সূর্য্য-কেন্দ্রের ইহাই কর্ম্ম বৈশিষ্ট্য যাহা হউক গণেশের দোষ গণেশ জাগতিক ভোগ সমর্থন করেন না। শক্তি-স্তরে আসিলে আমরা দেখিতে পাইব ভোগে মোটেই দোষ নাই, কিন্তু আসুরিকতাই দোষের। মানবেতর সমস্ত জীবেই ভোগের স্বাভাবিক বেগ আছে। কিন্তু মানবেতর কোন জীবেই আসুরিকতা নাই। এক মাত্র মানুষই মানবকে বিকাশে বাধা দিবার জন্য জাল পাতিয়া থাকে। অন্য জীবে এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন শক্তি-স্তরের আদর্শে ভোগের বিরোধিতা না থাকিলেও ত্যাগকে অবলম্বন করিয়াই উন্নত বিকাশ হইয়া থাকে। ভোগকে ধরিয়া রাখিয়া বিকাশ (৭ কলার উপরে) আসিবে না। শক্তি-স্তরে আসিলে অবশ্য ভোগের বিরোধিতা নাই, কিন্তু ত্যাগ না থাকিলে বিকাশই আসিবে না।

ত্রিনেত্রাং—শক্তির তিনটী চক্ষু।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি সূর্য্য এবং শিবেরও তিন চক্ষু রহিয়াছে। সূর্য্য-স্তরে স্নেহের দৃষ্টি, সুতরাং সজ্জন ও অসজ্জনকে সূর্য্য একই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। সূর্য্য ভক্তি স্তর, সুতরাং সূর্য্য (সূর্য্য-স্তরের মানুষ) ঈশ্বরকেও ভাল রাখেন। সূর্য্য-স্তরের তিনটী চক্ষুতে সজ্জন, দুর্জ্জন এবং ঈশ্বর তিন দিকের নজর বুঝায়। শিব-স্তরে সাধক স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ জগতের দ্রষ্টা হন। শিব-দৃষ্টির স্থূল জগতই সূর্য্য দুই ভাগে ভাগ করিয়া দর্শন করেন। সূর্য্য-কেন্দ্রের অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সাধক যে তত্ত্বটীকে ভগবান বলিয়া মনে করেন তাহা শিব-স্তরের

দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম-জগৎ, দৈব-জগৎ বা ভাব-জগতের দর্শন মাত্র। উহা সাধকের অন্তঃকরণেরই একটা অংশ মাত্র। তাহা স্নেহময় অরুণাভ জ্যোতির একটা ব্যাপক স্পর্শরূপে ধরা পড়ে। এই দৈব-জগতই বিষ্ণুকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। সূর্য্য-স্তরে ইহার চেয়ে বেশী অনুভূতি নাই। ইহাই ভাবাবেশের অনুভূতি। ভাব, মহাভাব, রাগ, অনুরাগ, প্রেম, ভক্তি, সবই ঐ একই স্তরের কথাকে বৈষ্ণব-দর্শনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাজান হইয়াছে মাত্র। ভক্তির স্তর ক্রম-বিকাশের পথে একটী স্তর। সুতরাং ভক্তির স্তরকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিলে ভুল করা হইবে। বিকাশের পথে ইহার প্রয়োজন আছে। তবে ইহাতে মোহ থাকা বিকাশের কণ্টক। শিব-স্তরের অনুভূতিতে আসিলে স্থূল জগতের ন্যায় এবং অন্যায় আর দর্শনে ফোটে না। ন্যায়ও স্থূল, অন্যায়ও স্থূল। তাই সাধক এ স্তরে নির্ব্বিকার সমাধিস্থ থাকেন। ভাল মন্দ লইয়া মাথা চালাইবার শক্তি এ স্তরে সাধকের থাকে না। সাধক এ স্তরে আসিলে বহুদিন পর্য্যন্ত কোন কাজ কর্ম্ম করিতে পারেন না। কাঁচা নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিলে মানুষের যেমন অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে সাধকেরও ঠিক সেই অবস্থা হয়। একবার শিব-স্তরের শান্তি বোধে সমাধিস্থ হন পরক্ষণে বিষ্ণু-কেন্দ্রের সুখবোধে নামিয়া আসেন, আবার হয়ত চক্ষু খুলিয়া অত্যন্ত উদাস নয়নে এই স্থূল জগতটাও দেখিয়া লইতেছেন। বার বার শান্তির কেন্দ্রে যোগস্থ হইতে চেষ্টা করিতে থাকেন। বার বার অন্তরস্থিত শান্তি বোধরূপ অমৃতকুণ্ডে ডুবিয়া ডুবিয়া যেন কত কালের (কত জনমের) অশান্তির জ্বালা নিবাইবার জন্য তাহাতে লীন হইতে থাকেন। এই ভাবে একবার কারণ (শান্তি-জগৎ), একবার সূক্ষ্ম (দৈব্য-জগৎ) এবং একবার স্থূলে দৃষ্টিটা বদ্‌লাইয়া যাইতে থাকে। কখনও বা শান্তির কোলে সমাধিস্থও হইয়া যান। সূর্য্য ভাল এবং মন্দ কারিকে একদৃষ্টিতে দেখেন না।

কিন্তু স্নেহ উভয়ের উপরেই সমান। তাই মন্দ কারিকে ভাল করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ইহাতে সংসারের বিশেষ কল্যাণ হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে আসুরিক শক্তির সহিত পাল্লা পড়ে সেখানে বার বারই বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন। তাহা হইলেও সূর্য্যের সেই স্বভাব বদলায় না। ইহাই সূর্য্য-স্তরের মোহ। যাহা হউক সূর্য্য ভাল এবং মন্দ ভাবপূর্ণ স্থূল জগতের দ্রষ্টা। শিব-স্তরে আসিলে সাধক ভাল এবং মন্দ ভাবপূর্ণ স্থূল জগৎকে একই উদাস নয়নে দেখেন। ইহাই শিবের এক চক্ষু। দ্বিতীয় চক্ষু দৈব-জগৎ, বিষ্ণু-জগৎ বা সূক্ষ্ম জগতের উপর থাকে। তৃতীয় চক্ষুটী কারণ-জগৎ, বীজ-জগৎ বা শান্তি-জগতকে দর্শন করিবার জন্য নিবদ্ধ। স্থূল জগতের ভাল মন্দ যদি শিবের চক্ষে পড়ে তবে তাঁহারও যোগাবস্থা থাকে না। তখন তিনি শিব-স্তরের দার্শনিক ভিত্তিকে ত্যাগ করিয়া এই স্তরের কর্ম্ম ভিত্তিকে (শক্তি-স্তরের আদর্শে মানুষ গড়া) অবলম্বন করিয়া ফেলিবেন। (এখানে বলা প্রয়োজন প্রত্যেক স্তরেরই দার্শনিক হইতে কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ হন)। যে কোন মানুষ উন্নত স্তরে আসিলে তাঁহার মধ্যে দৈবী সম্পদের বিকাশ হয়। জগতের উপর আসুরিক বা অন্যায় অত্যাচার দেখিলে যে কোন দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন মানুষের অন্তরে প্রতিবাদ, প্রতিকার বা প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হইয়া থাকে। যাহারা নিতান্ত পশু-স্তরের মানুষ তাহাদের ওরূপ তেজোদ্দীপন হয় না। যাহারা পশু হইতেও ঘৃণিত নিম্ন-স্তরের মানুষ তাহারা ঐরূপ অমানুষিক অত্যাচার দর্শনে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। যোগীগণ নিদ্রিত মানুষের মত অন্যায়-গুলি দেখিতেই পান না। তাঁহাদের অন্তঃকরণের অবস্থাই এরূপ হয় যে তাঁহারা তাহা ভাবিতেই পারেন না। অন্যায় অত্যাচার দেখিলে যোগীদেরও অন্তরে প্রতিকার প্রতিক্রিয়া জাগিবেই। ইহা স্বাভাবিক। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ শান্ত-চিত্ত যোগী মহাপুরুষকে কেহ কেহ স্বার্থপর

বলিয়া অভিহিত করিয়া নিজের অজ্ঞানতার পরিচয় দেন। বাস্তবিক যোগীগণ স্বার্থপর নহেন। শান্তি-সম্পদ এরূপ যোগী মহাপুরুষগণ হইতেই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়। বিদ্বেষহীন হইয়া নিকটে অবস্থান করিতে পারিলে খুব সহজে যে কেহই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। যে যাহাই বলুক না কেন যোগিগণের ইহা ভাবিবার অবসর নাই। তাঁহাদের যোগে প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ উপকরণ তাঁহারা একস্থানে বসিয়াই লাভ করেন। যাহা হউক সকলেই যে চিরদিন যোগস্থ থাকেন, তাহাও নহে। অনেকে সংসারের মঙ্গলের জন্য কিছুদিন বাদ কর্ম্মক্ষেত্রেও নামিয়া আসেন। কর্ম্মক্ষেত্রে না আসিলেও তাঁহাদের চিন্তাদ্বারা মানুষের বিশেষ কল্যাণ সাধন হইয়া থাকে। যাহা হউক শিব-স্তরের তিন চক্ষুর কথা বলা হইল।

শক্তি-স্তরে আসিয়াও আমরা দেখিতেছি দেবীর তিনটী চক্ষু। এই শক্তি ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞান-জগতের দ্রষ্টা। এই শক্তিই পরমেশ্বরী (পরমেশ্বর বা পুরুষোত্তম) বা আমাদের অন্তরস্থিত সর্ব্ব-শক্তির সমষ্টি। আমরা আমাদের অন্তরস্থিত শক্তির অতি সামান্য অংশটুকু লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াই তৃপ্ত। এই পৃথিবীতে মানুষ যে কত লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছে তাহার হিসাব করা সহজ নহে, কিন্তু যখন আমরা মানবের রীতি, নীতি, আইন, কানুনের কথা ভাবি তখন দেখিতে পাই মানুষ অতি সামান্য শক্তিটুকু লইয়াই নিজের জীবন লক্ষ্য নিয়মিত করিয়া চলিয়াছে। মানুষের অন্তরের যে শক্তির সন্ধান ঋষিগণ বহু প্রাচীনকালে পাইয়াছিলেন তাহার খবর মানুষ যেন লইতেই প্রস্তুত নহে। মানুষ কেন যে অতি সামান্য লইয়াই তৃপ্ত ইহার কারণ কে বলিবে। বিভিন্ন স্তরে আমাদের দৃষ্টিশক্তির দার্শনিক ভিত্তি কেমন বদলাইয়া যাইতেছে তাহা যদি পাঠকগণ একটু অন্তরস্থ হইয়া বিচার করেন তবে বুঝিতে পারিবেন, মানুষ কিরূপ শক্তিশালী জীব। কিন্তু মানুষ আজ কোথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! মানুষ হয়

তো লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, কিন্তু মানুষের সমাজ আজও এমন দশাগ্রস্থ যাহা হইতে স্বাধীন বন্য পশুকে বেশী সুখী বলিয়া মনে হইবে।

যাহা হউক শক্তি-স্তরে আসিয়া আমরা শক্তিকে ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞান-শক্তির * বিকাশের দর্শনে আত্ম নিয়োজিত দেখিতে পাইতেছি। দর্শনের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। 'ইচ্ছা-শক্তি' ভোগিগণে বেশী বিকাশ পাইয়াছে। 'ক্রিয়া-শক্তি' কর্ম্মিগণে বেশী প্রস্ফুটিত। 'জ্ঞান-শক্তি' যোগিগণে সদা প্রকাশিত। প্রত্যেক মানবেই ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞানের বিকাশ রহিয়াছে। এই 'ইচ্ছা' অর্থে ভোগেচ্ছা, 'ক্রিয়া' অর্থে (নিঃস্বার্থ) কর্ম্ম এবং 'জ্ঞান' অর্থে উপলব্ধি। যে ভোগী সে

---

* শক্তি সাধনার ক্রম ধরিয়া যাঁহারা সাধনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন শক্তিকে ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং জ্ঞান-শক্তি ক্রমে উপাসনা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। অন্তরস্থিত শক্তিকে বা অন্তরকে জানার নামই জ্ঞান। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ সাধনার ক্রম এক প্রকার লুপ্ত হইয়াই গিয়াছে। বিষ্ণু-কেন্দ্র পুষ্ট চিন্তা এবং সূর্য্য-কেন্দ্র পুষ্ট ভাবের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সমস্ত প্রকার সাধন-ভাণ্ডার আচ্ছন্ন আছে। কর্ম্মী যদি শক্তি-স্তরে দাঁড়াইতে পারেন তবে তাহা আবার সঞ্জীবিত হইবে। নইলে তাহার খবর আর লইবার পথ নাই। গুরু, পুরোহিত, পণ্ডিত, শাস্ত্রকার ই বিষ্ণু স্তরের চিন্তার বাহিরে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে সব আছে, কিন্তু সমাজে নাই শক্তি-স্তরের সন্ধান। শক্তি-সাধনার ধারা যাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও অনেকস্থলে অপূর্ণ অবস্থায়ই আছে। সাধক যদি শক্তি-স্তরের লক্ষ্য লইয়া সাধনায় প্রবেশ করেন তবেই তাঁহার সাধনার শক্তি শক্তি-স্তরের বিকাশে সাহায্য করিবে। নইলে বানরের হাতে কলা দিবার চেষ্টা করিয়া কোনই ফল নাই। লক্ষ্য যাহার ছোট সে বেশী পাইয়াই কি করিবে? যে গৃহীর মত মোহবদ্ধ সে যদি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে তবে সে সন্ন্যাস বিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া মোহের কথাই ভাবিবে। যিনি শক্তি-সাধনা করিবেন তিনি সর্ব্ব প্রথম শক্তি-স্তর বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তবেই ইহার উপযুক্ত ফল লাভ হইতে পারে।

নিজের কর্ম্ম এবং জ্ঞান-শক্তিকে ভোগের জন্য প্রয়োগ করে। যিনি কর্ম্মী তিনিও নিজের ইচ্ছা-শক্তিকে কর্ম্মের সুবিধার জন্য সংযত রাখেন এবং জ্ঞান-শক্তিকে কর্ম্মের সুবিধার জন্য নিয়োজিত করেন। যিনি জ্ঞানী তিনি নিজের ইচ্ছা-শক্তিকে সংযম অগ্নিতে আহুতি দেন। কর্ম্ম-শক্তিকে জ্ঞানবৃদ্ধির পথে (সাধন এবং তপস্যার পথে) নিয়োজিত করেন। ভোগী, কর্ম্মী, এবং জ্ঞানীর উপর দেবীর সমান দৃষ্টি। এই স্তরের নিয়মগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত যাহাতে মানবে ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞানের বিকাশ নিয়মিত ভাবে সঞ্জীবিত থাকে। এই স্তরের নিয়ম এবং বিধি (আইনাদি) এমনই ভাবে প্রস্তুত হয় যাহাতে ভোগীর সুবিধাটুকুর জন্য কর্ম্মী এবং জ্ঞানীর অস্তিত্ব লুপ্ত না হইয়া যায়। আবার কর্ম্মীর সুবিধার জন্য ভোগীকে এবং জ্ঞানীকেও উৎসন্ন যাইতে হয় না। আবার জ্ঞানিগণের সুবিধার কথা ভাবিয়া ভোগী এবং কর্ম্মীকে মারিয়া ফেলিবার মত নিয়মও আবিষ্কৃত হয় না। আসুরিক শক্তির নিয়মে নিঃস্বার্থ কর্ম্ম-শক্তিকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা লক্ষিত হইয়া থাকে। ভোগ-প্রধান কর্ম্ম-শক্তিকেই আসুরিক কর্ম্ম-শক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। আবার জ্ঞান-প্রধান কর্ম্ম-শক্তিই নিষ্কাম কর্ম্ম। সাধক এই স্তরে আসিলে ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞানের সামঞ্জস্যময় জীবন লাভ করেন (শ্রীকৃষ্ণ, জনক, রাম, বশিষ্ঠ প্রভৃতির জীবন চরিত বুঝিতে চেষ্টা করুন)। শিবের স্তরে অবস্থান করিলে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ জগতের উপর সমান দৃষ্টি লাভ হয়। শিবের স্তরে ভোগের সঙ্গে মোটেই সম্বন্ধ নাই। যোগ এবং ভোগ একত্র স্থান পায় না। শক্তির স্তরে ভোগের বিরোধিতা নাই। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মিদের উপর পূর্ণ স্নেহ এবং আসুরিকতার বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের (চণ্ডীর চিত্তে কৃপা এবং সমর নিষ্ঠুরতা) বেগ রহিয়াছে। শিবের স্তরে যেমন ভোগের বেগ নাই তেমনই আসুরিকতার কথাও

শিব ভাবিতে নারাজ। ভোগে যেমন যোগ-ভঙ্গ হয় যুদ্ধের কথা ভাবিলেও যোগ থাকে না। এই "ত্রিনেত্রাং" অংশটুকু সকলে মনোযোগ সহকারে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। বিভিন্ন স্তরে আমাদের দর্শন-শক্তি কেমন বদলাইয়া যায় তাহা বুঝিতে পারিলে কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ চিনিবার খুবই সুবিধা হইবে। শক্তি-স্তরে আসিলে মানুষ প্রকৃতই মানুষ হয়।

আমাদের স্বরূপের এক প্রান্তে স্থূল শরীর অন্য প্রান্তে আত্মা। শক্তি-স্তরে দাঁড়াইলে আমরা স্থূল শরীরকে পাই আত্মাকেও পাই। শক্তি-স্তরে আমরা একদিকে আত্মাকে পাইয়া চিন্তিন্ত হই, অন্যদিকে ভোগী, কর্ম্মী এবং যোগিদিগের উপর (মানুষের উপর) আমাদের সমান নজর হয়। অন্যান্য স্তরে আমাদের দৃষ্টি-শক্তি ভাব-জগতে সীমাবদ্ধ থাকে। সকলের বিকাশের পথকে সহজ করিবার সর্ব্ববিধ উপাদান আমরা শক্তি-স্তরে বুঝিতে পারি। এদিকে আসুরিক বিকাশকেও আমরা বিশেষ ভাবে চিনিয়া লইতে পারি। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্যের পথ সরল হইয়া যায়।

সিংহ স্কন্ধাধিরূঢ়াং— শক্তি সিংহ-স্কন্ধে অধিরূঢ়া আছেন।

'সিংহ' অন্যায় বা অসুর হিংসুক তেজস্বী মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। ইহাই এই স্তরের মানুষের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। চিরদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে হিংস্র পশুর মত গা ঝাড়িয়া কেশর ফুলাইয়া অগ্রসর হন। লোকেও কথায় বলে 'পুরুষ-সিংহ' বা 'সিংহ রাশী পুরুষ'। শক্তি-স্তরের বিকাশ সেই মানুষেই আছে যিনি সিংহের মত বিক্রমশালী তেজস্বী, গম্ভীর, যুদ্ধে অনলস, প্রফুল্ল, উৎসাহী এবং জিতেন্দ্রিয় হন। এরূপ পুরুষ দ্বারাই জগতে শক্তি-স্তরের আদর্শে ধর্ম্ম সমাজ, শিক্ষা এবং কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত খণ্ড শক্তিগুলির (গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব) পূর্ণ বিকাশস্থল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শক্তির একটী

দুর্ব্বলতাও যাঁহাদের চরিত্রে নাই তাঁহারাই 'পুরুষ-সিংহ'। এইরূপ লক্ষণ সম্পন্ন মানুষই শক্তিকে জানিতে পারেন এবং আত্মার পূর্ণতম বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, অন্যে নহে।

এবার সূর্য্য-স্তরের "রক্তাম্বুজাসনং", বিষ্ণু-স্তরের "সরসিজাসনং" এবং শিব-স্তরের 'পদ্মাসীনং" এর সহিত এই "সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়া" তুলনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন মানুষ কোন্ স্তরে কিরূপ স্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকেন। অধ্যাত্মবাদী হইয়া কোন্ স্তরটী অবলম্বন করিলে মঙ্গল হইবে তাহা বুঝিতে পারিবেন। অধ্যাত্মবাদের প্রকৃত ভিত্তি "শক্তি-স্তর"। ইহা ভিন্ন আর সবগুলির ভিত্তি 'ভাব বাদের' অন্তর্গত। শক্তি-স্তরের ভিত্তি যদি নষ্ট হইয়া যায় তবে অধ্যাত্মবাদের কোন ভিত্তিই আর থাকে না। শক্তি-স্তরে দাঁড়াইয়াই মানুষ পূর্ণ-জ্ঞানী হইয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ যদি চাহেন তবে তাঁহাকে বলিব "উপনিষদ্‌গুলি পাঠ করুন"। উন্নত স্তরের উপনিষদ্‌গুলির আদি বক্তাগণের বেশীর ভাগই যে ক্ষত্রিয় রাজাগণ একথা জানিতে পারিবেন। অধিক কি আর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য গায়ত্রীর ঋষি পর্য্যন্ত মহাতেজোবীর্য্যের আধার 'বিশ্বামিত্র ঋষি'। 'ভাবাবেশ', 'ধ্যানানন্দ' এবং 'শান্তিবোধ' হইতে এই শক্তি-স্তরের 'সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং' এর প্রতিষ্ঠা যে অনেক ঊর্দ্ধে একথা তখন সকলেই জানিতে পারিবেন। 'সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং' শ্রেষ্ঠ হইলেও 'ভাবাবেশ, ধ্যানানন্দ এবং শান্তিবোধকে' কেহ যেন উপেক্ষা করেন না। কারণ ক্রম-বিকাশের পথে ইহাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। তবে কর্ম্মীর লক্ষ্য 'শক্তি-স্তর', ইহা মনে রাখিতে হইবে। আর্য্যের উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি 'গায়ত্রী' শক্তি-স্তরকেই জানিতে হইবে। আজ স্মৃতি-শাস্ত্রের (বিষ্ণু-কেন্দ্র পুষ্ট চিন্তা) ও পুরাণের (সূর্য্য-কেন্দ্র পুষ্ট চিন্তা) যেরূপ একাধিপত্য সমস্ত ভারতের সমাজ ও ধর্ম্মক্ষেত্রে হইয়া বসিয়াছে তাহাতে এই শক্তি-স্তরকে কি ভাবে সমাজে স্থায়ী কর

যাইতে পারে তাহা ভাবিবারই কথা হইয়াছে। ভেদবাদ (স্মৃতি) এবং ভাববাদ (অবতার বাদ বা পৌরাণিক বাদ) ভারতের আকাশ বাতাস ছাইয়া গিয়াছে। গায়ত্রী উপাসনা এখন উপবীত ধারণের সঙ্গেই লীন হইতেছে। শক্তি সাধনার নাম শুনিলে মানুষ শিহরিয়া উঠে।

ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তিং—সমস্ত ত্রিভুবনকে তেজ দ্বারা পূর্ণ করেন। ত্রিভুবন অর্থে ত্রিলোক। ভূ ভুবঃ স্বঃ লোক। ভূঃলোক অর্থে ভোগের স্থান 'মর্ত্তলোক', ভুবঃ লোক অর্থে 'দৈবলোক' কর্ম্মীর লোক এবং স্বঃ লোক অর্থে 'জ্ঞানলোক' বা অনুভূতির জগৎ।

আমরা যখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দাদির ভোগে লিপ্ত থাকি তখন আমরা ভূঃ লোকে অবস্থান করি। আমরা যখন জগৎ মঙ্গলকর কর্ম্মের কথা ভাবি বা করি তখন আমরা ভুবঃ লোকে বিচরণ করি। আমরা যখন আমাদের অন্তরস্থিত অনুভূতির কেন্দ্রে সমাধিস্থ বা ধ্যানস্থ হই তখন আমরা স্বঃ লোকে অবস্থান করি।

এখানে ত্রিভুবন অর্থে—ভোগীর লোক, কর্ম্মীর লোক এবং জ্ঞানীর লোক। ভোগী, কর্ম্মী এবং জ্ঞানী একই পৃথিবীতে অবস্থান করেন; কিন্তু তিনজনের ভাবধারা তিন প্রকারের। ভোগী ভোগের কথাই ভাবে। পৃথিবীকে কি ভাবে ভোগ করিবে সেই চিন্তায় ভোগীর মন বিভোর। কর্ম্মী নিজে পার্থিব সুখ চাহে না কিন্তু এই পৃথিবীটাকে সকলের জন্য স্বর্গের বা সুখের নিকেতন করিয়া গড়িতে চাহেন। কর্ম্মী মানুষের মনকে পশুর মত হীন স্তরে না দেখিয়া দেবতার মত উজ্জ্বল এবং নির্ম্মল দেখিতে চাহেন। কর্ম্মী মানুষকে পশুর মত ভোগ-বদ্ধ, মোহ-বদ্ধ এবং অভিমান বদ্ধ দেখিতে ভালবাসেন না। কর্ম্মী আসুরিকতা সহ্য করিতে পারেন না। কর্ম্মী মানুষ মাত্রেরই আত্ম বিকাশের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহেন। কর্ম্মী নিজের সর্ব্বশক্তি

সর্ব্বসম্পদকে মানবের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেন। নিজের প্রিয় শরীরটী পর্য্যন্ত জীবশিবের সেবায় ঢালিয়া দেন। কর্ম্মীর মন দৈবজগতে বিচরণ করে, ভোগ-জগতে নহে। ভোগীও কর্ম্মের কোলাহলের মধ্যেই অবস্থান করে, কিন্তু ভাবে ভোগের কথা। কর্ম্মীর সুখ ইহারা জানে না। জ্ঞানী এই পৃথিবীতেই আছেন, কিন্তু অত্যন্ত উদাসভাবে অবস্থান করেন। জ্ঞানীর মন শান্তি ও অনুভূতির জগতে অবস্থিত। শত থাকিলেও অভাব বোধের তাড়নায় ভোগীর মন আচ্ছন্ন। কর্ম্মীর যাহা কিছু আছে সবটাই মানব সেবায় নিয়োজিত করেন। মানুষের মুখে নিশ্চিন্তের হাসি দেখিবেন ভাবিয়া দিন কাটান, নিজের কথা ভাবেন না। জ্ঞানীর লৌকিক সম্পদ। আবার নাই অভাবের যাতনাও তাঁহার নাই; পূর্ণ তৃপ্তির কোলে তিনি সমাধিস্থ। ভোগী পৃথিবীকে ভোগের জন্য সুন্দর করিয়া সাজায়। কর্ম্মী মানুষকে দৈবী-সম্পদের ভিত্তিতে গড়িয়া দিয়া মানব চরিত্রকে সুন্দর এবং সুখদ করেন। জ্ঞানী শান্ত এবং পূর্ণ। কর্ম্ম-শ্রান্তির পর কর্ম্মী শান্তির প্রবাহ পাইবেন বলিয়া জ্ঞানী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন। এইরূপ ভোগী, কর্ম্মী এবং জ্ঞানীকে দেবী আপন তেজ দ্বারা পূর্ণ করেন। শক্তি-স্তরের নীতির এই বিশেষত্ব যে এই নীতির অধীনে সকলেই শক্তিশালী হয়, শক্তি-স্তরের আদর্শের বৈশিষ্ট্যে আসুরিকতার সমর্থন নাই। ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞান শক্তি-স্তরের আদর্শে তেজমণ্ডিত হয়।

ধ্যায়েৎ—ধ্যান করিতে হয়।

'ধ্যান' সম্বন্ধে বিষ্ণু অংশে আলোচনা করা হইয়াছে। শিব অংশেও এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি ইহারা যথাক্রমে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব-কেন্দ্রস্থিত শক্তি। যে কোন সময় মনকে বৈষয়িক সংযোগ হইতে মুক্ত করিয়া লইবার শক্তিকে প্রত্যাহার বলিয়া জানিবে। ইহা সম্পূর্ণরূপে গণেশ-

কেন্দ্র শক্তি। 'ধারনা' সূর্য্য-কেন্দ্র শক্তি। প্রিয় এবং সৌন্দর্য্য বোধের সহিত ইহার সম্বন্ধ খুব বেশী। সৌন্দর্য্য জ্ঞান যখন অন্তরে প্রস্ফুটিত হয় তখন যে কোন একটা বস্তুকে অন্তঃকরণ বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে। চেষ্টা করিয়া ধারণার অভ্যাসকে ধারণার সিদ্ধাবস্থা বলা যায় না। যতক্ষণ ধারনা শক্তিটা সূর্য্য-কেন্দ্র হইতে আসিবে না ততক্ষণ কোন বস্তুই মনে জাগাইয়া রাখা যায় না। ভালবাসা দান করিয়া গুরুগণ শিষ্যের অন্তরে এই শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই জন্য শিক্ষাক্ষেত্রেও ছাত্রকে ভালবাসা দান করিয়া শিক্ষা দিবার বিধানের কথা শিব অংশে বলা হইয়াছে। যে যাঁহাকে ভালবাসে তাহার জ্ঞান-সম্পদ সেই পাত্রে প্রতিফলিত হয়। যে যাহাকে ভালবাসে তাহার মূর্ত্তি তাহার অন্তরে আপনিই আঁকিয়া যায়। ইহাই ধারনার কথা। সুখবোধের অফুরন্ত প্রবাহই 'ধ্যান'। ইহা বিষ্ণু-কেন্দ্র শক্তি। মানুষ সামাজিক জীবনে এই সুখবোধের অতি সামান্য স্পর্শ মাত্র অনুভব করিয়া থাকে। এই সুখবোধের বিনিময়ে স্ত্রী পুরুষে এবং পুরুষ স্ত্রীতে আত্ম-বিক্রয় করিয়া দিয়া থাকে। বলা প্রয়োজন ইহা ধ্যানানন্দ সুখের অতি সামান্য স্পর্শ। শিব অংশে বিষ্ণু বা চিত্তকেন্দ্র সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে তাহাতে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে প্রাণময় শরীরের তৃপ্তিজনিত বহু সুখ-স্মৃতি চিত্তকেন্দ্রে জমিয়া থাকে। সাধক ধ্যানানন্দ প্রবাহে আসিলে এই সুখস্মৃতিগুলি প্রত্যক্ষে ভোগ করিতে থাকেন। ইহাকে সুখানন্দ বা স্পর্শানন্দ বলা যাইতে পারে। এ আনন্দের প্রবাহে সাধক যখন আপন অন্তরে আত্মহারা হন তখন সাধক ধ্যানানন্দে বিভোর। এই ধ্যানানন্দকে যিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন :তিনি সম্ভোগ-সুখকে জয় করিতে পারিবেন। যাঁহারা রিপুজয়ের কথা ভাবেন তাঁহারা ধ্যানানন্দ পাইতে চেষ্টা করিবেন। শুধু সংযমের বাঁধনে রিপু দমনের ক্ষমতা

আসে না, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন। 'সমাধি' শিব-কেন্দ্র শক্তি। ইহা 'কেবল শান্তির' স্বরূপ। শিব অংশে উহা বিস্তারিত বলা হইয়াছে।

প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধির কেন্দ্র ভেদ করিয়া আমরা শক্তি-স্তরে চলিয়া আসিয়াছি। ইহা চির কর্ম্মময় স্তর। এখানে ধ্যানের কথা আসিতে পারে না। তবুও দেখিতেছি 'ধ্যায়েৎ' শব্দের ব্যবহার। পাঠকগণের জানা প্রয়োজন আমরা উপাসনা কাণ্ডের ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া চলিয়াছি। উপাসনার ভিত্তি 'দ্বৈতবাদ'। বিষ্ণু-কেন্দ্রের অনুভূতি শেষ হইলে দ্বৈত-বাদ শেষ হয়। অর্থাৎ উপাস্য উপাসক ভাব বিষ্ণু-কেন্দ্র পর্য্যন্ত রহিয়াছে। ইহার পরে যোগ এবং জ্ঞানের কথা শিব-স্তরে আরম্ভ হইয়াছে। উপাসনা কাণ্ডের মধ্যে ধ্যান হইতে উন্নত স্তরের শব্দ প্রয়োগ চলে না। উপাসনা কাণ্ড সাধককে বিষ্ণু-কেন্দ্র পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়া ছাড়িয়া দেয়। সাধক মাত্রই বিষ্ণু-কেন্দ্র ভেদ না করা পর্য্যন্ত উপাসনার ভিত্তি সন্ধ্যা, জপ ও পূজাদির কাজগুলি ত্যাগ করিবেন না। তাহা হইলে পূর্ণতার পথে বিশেষ ভুল করা হইবে। মানুষ যখন মনের স্তরে থাকে তখন সে মুখে ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলুক আর সমাধির কথাই বলুক তাহা তাহার কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনের স্তরে মানুষের জ্ঞান কল্পনায় সীমাবদ্ধ। গণেশের স্তরে ঐ জ্ঞানের কথা ত্যাগে এবং শূন্যবোধের অন্তর্গত জানিতে হইবে। সূর্য্য-স্তরে বোধ প্রতিষ্ঠিত হইলে জ্ঞানের কথা ভাব ও প্রেমের কথা মাত্র। ঠিক এইরূপ উপাসনা কাণ্ডে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বা যোগের কথা ধ্যানাবস্থায় সীমাবদ্ধ। বিষ্ণু-কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া সাধক উন্নত স্তরের কথা ধ্যানের বিষয় করিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই জন্য উপাসনা কাণ্ডে ব্রহ্মেরও ধ্যান আছে। যাঁহারা সামান্য দর্শন-শাস্ত্র চর্চ্চা করেন তাঁহারা একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্রহ্মের ধ্যান করা যায় না। ব্রহ্ম ধ্যানের বিষয় নহেন।

ধ্যান সম্বন্ধে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা করা যাইতেছে। যোগ-দর্শনে বলা হইয়াছে 'ঈশ্বর-চিন্তনের নাম ধ্যান'। সাংখ্য-দর্শন এবং যোগ-দর্শনে প্রায় একই তত্ত্ব মানা হইয়াছে। সাংখ্যকার ঈশ্বর মানেন নাই। যোগ-দর্শনকার ঈশ্বর মানিয়াছেন। সাংখ্য এবং পাতঞ্জলে এইটুকু মাত্র ভেদ বিদ্যমান। সাংখ্যের আদি বক্তা মহর্ষি কপিল ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মকোটী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ শক্তি-স্তরের 'ঈশ্বরীর অংশ' ঈশ্বর-স্বরূপ বা পুরুযোত্তমের অনুভূতি পান না। তাঁহারা মহৎ তত্ত্বের অনুভূতিতে স্থিতিলাভ করিয়া অব্যক্তের (শক্তি-স্তরের তৃতীয় অংশের) অনুভূতিতে নিজের বহুজন্ম-লব্ধ জ্ঞানরাশী আহুতি দান করিয়া অব্যক্তের পরপারে চলিয়া যান। পূর্ব্বে বহুস্থানে বলা হইয়াছে যাঁহারা গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতি বা ত্যাগের পথে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হন অর্থাৎ যাঁহারা সূর্য্য এবং বিষ্ণু-কেন্দ্রের অনুভূতির উপর বিশেষ নজর না দিয়া গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতিকে দৃঢ় হইয়া অবলম্বন করিয়া শিবের কেন্দ্রে চলিয়া যান তাঁহারা পুরুষোত্তম বা শক্তি-স্তরের ঈশ্বরাংশের অনুভূতি লাভ করেন না। এইরূপ মহাপুরুষগণই ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত। সাংখ্যের আদি গুরু পূজ্যপাদ কপিলদেব ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তাই সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর মানা হয় নাই। গণেশের পথে যাঁহারা অগ্রসর হন তাঁহারা স্বভাবতঃই ভক্তি-বাদ বা ঈশ্বর বাদ প্রিয় হন না। সাধারণতঃ গণেশ-কেন্দ্র-পুষ্ট কর্ম্মীসকল ও ঈশ্বর মানিতে চাহেন না। ঈশ্বর না মানা গণেশ কেন্দ্রের একটা বিশিষ্টতা। আবার সূর্য্য-স্তরের মানুষগুলি স্বভাবতঃই ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইয়া থাকেন। ইঁহারা স্বভাবতঃই একটু ভক্তিবাদ ভালবাসেন। সুতরাং কেহ যদি মনে করেন যে ভক্তিবাদ এ পৃথিবী হইতে পুছিয়া যাইবে, তাঁহারাও ভুল বুঝিবেন। ঈশ্বর-বিশ্বাস একটা স্তরেরই

বৈশিষ্ট্য। তাই ইহা পুছিয়া ফেলা যাইবে না। পুছিতে চেষ্টা করা অদূরদর্শিতার কথা। যোগ-দর্শনের আদি গুরু মহর্ষি পতঞ্জলীদেব সূর্য্য এবং বিষ্ণু কেন্দ্রের অনুভূতির পথে পূর্ণতার দিকে গিয়াছিলেন। তাই যোগ-দর্শনে ঈশ্বর মানা হইয়াছে। যাঁহারা সূর্য্য এবং বিষ্ণু-কেন্দ্রের অনুভূতির পথে অগ্রসর হন তাঁহারা যদি কোথাও বদ্ধ না হইয়া পড়েন তবে শক্তি বা পুরুষোত্তম স্তর পর্যান্ত অনায়াসেই চলিয়া আসিবেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটী পথকেই 'জ্ঞান যোগেন (গণেশ-পথ) সাংখ্যানাং' এবং 'কর্ম্ম যোগেন যোগীনাং' রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ কপিল অত্যন্ত ত্যাগ প্রধান মহাপুরুষ ছিলেন। যোগ-সূত্র এবং সাংখ্য-সূত্র আলোচনা করিলে পাঠকগণ সব পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। যোগ-দর্শনের প্রথম সূত্র 'চিত্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ'। এখানে 'যোগ' অর্থে শিবের স্তর, এবং 'চিত্ত' অর্থে বিষ্ণু-স্তর। বিষ্ণু-স্তরের নিবৃত্তি হইলেই 'যোগ' হয়। একথা আমাদের পাঠকগণের বুঝিবার পথে কোনই অসুবিধা হইবে না। কেহ কেহ 'চিত্ত' শব্দের অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া এই উক্তি বাতিল করিতে চেষ্টা করিতে পারেন। 'চিত্ত' শব্দের যিনি যেমন অর্থই প্রদান করুন না কেন যাঁহারা অনুভূতির পথে অগ্রসর হন তাঁহারা জানেন বিষ্ণু-কেন্দ্রের 'হিরণ্ময় আবরণ' ভেদ করিতে না পারিলে যোগাবস্থা লাভ হয় না। 'কেবল শান্তিই' যোগের স্বরূপ। এই শান্তি বোধটা শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট। বিষয়ের স্পর্শে সুখ হয়। এই সুখটীর রং লোহিত বর্ণ। এই সুখস্মৃতিই আসক্তির কারণ। তাই আসক্তির অন্য নাম 'রাগ'। রাগ রং এবং লোহিত বর্ণ একই কথার নামান্তর মাত্র। অনুভূতির কেন্দ্রে শান্তিপ্রভ শুভ্রবর্ণ এবং রাগপ্রধান লোহিত বর্ণ মিলিয়া হিরণ্ময় অনুভূতি হয়। ইহাই বিষ্ণু-কেন্দ্রের অনুভূতি। অনুভূতির ঐ রাগ অংশই বিক্ষেপের কারণ। ঐ রাগগুলিই

নানাপ্রকার অক্লীষ্টা ও ক্লীষ্টা বৃত্তি উৎপাদন করিয়া সাধকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কাহাকে বা পতিতও করে। অনুভূতিতে বিষ্ণু-কেন্দ্রের ঐ লোহিত অংশ শেষ হইলে যোগাবস্থা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই শ্বেতবর্ণ শিব। এ দিকে সাংখ্যকার প্রথম সূত্রে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির কথা উঠাইয়াছেন। গণেশের পথ ত্যাগের পথ। ত্যাগ ভাব এবং শান্তিভাব গণেশ-কেন্দ্রের অনুভূতির উপাদান। ত্যাগেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সাংখ্যের ভিত্তি গণেশ-কেন্দ্র। তাই সাংখ্যে ঈশ্বরের কথা নাই। যোগ সূত্রের ভিত্তি বিষ্ণু-কেন্দ্র। তাই যোগে ঈশ্বরের কথা আছে।

ঈশ্বর কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যোগসূত্র বলেন "ক্লেশ, কর্ম্ম এবং বিপাক যাঁহাকে স্পর্শ করে না এমন যে পুরুষ তিনি ঈশ্বর"। ক্লেশ অর্থে 'দুঃখ'। এই দুঃখ অর্থে 'চিত্তের বিক্ষোভ'। কর্ম্মক্ষেত্রে নিজের মনের মত কাজ না হইলে বা কর্ম্মে বিফলতা আসিলে অনেক উন্নতমনা মহাপুরুষের এইরূপ বিক্ষোভ হইতে দেখা যায়। এই বিক্ষোভই ক্লেশ। যাঁহারা গণেশ, সূর্য্য এবং বিষ্ণু-স্তরের আদর্শ লইয়া জনহিতকর কর্ম্ম করেন তাঁহারা খুব পাকা কর্ম্মী নহেন। তাঁহারা অনেক সময় ভাবপ্রবণতার বেগ লইয়া অগ্রসর হন এবং পদে পদে বিক্ষুব্ধ হন। এই বিক্ষোভই "ক্লেশ"।

যাহাতে বার বার জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যু ভোগ করিতে হয় তাহার নাম এখানে 'কর্ম্ম'। সৎকর্ম্ম এবং অসৎকর্ম্ম উভয়েরই ফল মানবাত্মাকে ভোগ করিতে হয়। নিম্নস্তরের কর্ম্মিগণ সকাম কর্ম্ম করেন। স্বর্গের লোভে জলাশয়, মন্দির এবং ধর্ম্মশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। একটা তীর্থে যাইয়া ৫০ ঘাটে ৫০ রকমের সংকল্প লইয়া স্নান করেন। আবার দানের বেলায়ও মহাপাপীকে তাহার পাপের সহায়তার জন্য দশ বিশ রকমের স্বর্গের সংকল্প করিয়া দান করেন। এই সব কর্ম্মফলে যেমন

সুখ ও দুঃখ ভোগ করা উচিত সবই করেন এবং লোক লোকান্তরে গমন করেন। দুর্জ্জনকে দান করিয়া দুর্বৃত্তের প্রশ্রয় দিলে তাহারও ফল পাইতে হয়।

আরও এক প্রকারের কর্ম্মী আছেন যাঁহারা দেশ, ধর্ম্ম, সমাজ এবং মানব হিতের জন্য উন্নত দৈবী-সম্পদের আদর্শ লইয়া কর্ম্ম করেন। এরূপ কর্ম্মিগণ গণেশ, সূর্য্য এবং দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট কর্ম্মী। ইঁহারা ধীরে ধীরে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইঁহাদের জন্মের বেগ ধীরে ধীরে কম হইতে থাকে। অনেক সময় ভাবপ্রবণ হইয়া কর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়েন বলিয়া ইঁহারা পদে পদে বিক্ষুব্ধ হন। মোহ ও ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্ম হইবার দরুণ ইঁহারা জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইঁহাদের কর্ম্ম ইঁহাদিগকে জন্মের বেগ কম করিতে সাহায্য করে। ইঁহারা তীর্থের নামে অজ্ঞাত দুর্জ্জনকে দুষ্কর্ম্মের সহায়তার জন্য দান করা অপেক্ষা প্রত্যক্ষে সমাজের মঙ্গলকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম মনে করেন। ইঁহারা পিতার পিণ্ডদান অপেক্ষা পিতৃ সেবার বেশী পক্ষপাতী হন। ইঁহারা কর্ম্মজনিত মৃত্যু ভোগ করেন না, কিন্তু ইঁহারা ক্লেশ ভোগ করেন। এই ক্লেশ অর্থে চিত্তের ক্লীষ্টা বৃত্তির বেগ বা বিক্ষোভ। ইঁহারা নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর অন্তর্গত। কেহ কেহ ইঁহাদিগকে নিষ্কাম কর্ম্মী বলেন।

ইহা ভিন্ন এক প্রকারের কর্ম্মী আছেন, যাহারা জীবমুক্ত কর্ম্মী। ইঁহারা শিব-স্তরের কর্ম্মী। ইঁহারা যতটুকু পারেন মানুষকে বা জীব মাত্রকে বিকাশের পথে সাহায্য করেন বা শক্তিস্তরের সন্ধান দিতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের শেষ বিশ্রামের পথে অপেক্ষা করেন। ইঁহারা খুব সাবধানী কর্ম্মী। ঋষিগণ এই স্তরের কর্ম্মী ছিলেন।

আরও এক প্রকারের কর্ম্মী আছেন, যাঁহারা পূর্ণ ঈশ্বরের স্তরের কর্ম্মী। কর্ম্ম করা প্রকৃতির ধর্ম্ম ও আত্মার ধর্ম্ম, তাই তাঁহারা

কর্ম্ম করেন। ইঁহারা অহং (অভিমান হীন) ভাবের কর্ম্মী। ইঁহারা সাধারণতঃ অসুর ধ্বংশ করিতে আসেন এবং তাহা করিয়া বিদায় হন। ইঁহারা এবং শিবস্তরের কর্ম্মীরা খুব পাকা কর্ম্মী। ইঁহাদের ক্লেশ, কর্ম্ম এবং বিপাক স্পর্শ করে না। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ এবং রাম ও জনক এই স্তরের কর্ম্মী ছিলেন।

অসৎ কর্ম্মের ফলে মানুষের নরক ভোগ হয়। এরূপ নরক ভোগের নাম 'বিপাক'। যাহারা জীবকে এবং মানুষকে দুঃখ দেওয়াকেই উপাদেয় মনে করে যাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, নির্ম্মম ও শোষক এবং যাহারা অন্যের বিকাশের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করে তাহাদের বিপাক ভোগ করিতে হয়। বিকাশের পথের পথিককে অকারণ পীড়ন করিলেও বিপাক ভোগ করিতে হয়।

ঈশ্বর আছেন কিনা এরূপ প্রশ্ন সর্ব্বত্র উদিত হইতেছে। ইহার জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা বিকাশের পথে চলিয়াছি। যিনি যতটুকু পারুন বিকাশের পথে চলুন। সেখানে আস্তিক নাস্তিকের প্রশ্ন নাই। যাহার অন্তর যতটা বিকশিত তিনি ঈশ্বরের ততটুকু অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন তাঁহার কর্ম্মে ও স্বভাবে উহা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। আবার একদল আছে যাহারা অন্তরে ঘোর নাস্তিক, কিন্তু ঈশ্বরের নাম করিয়া অন্যকে বঞ্চনা করে। বিকাশের কোন কথাই ইহারা ভাবে না। আমাদের কথা দৈবী-সম্পদের অবলম্বন হওয়া চাই। যাঁহার অন্তরে মোহের দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তিনি যদি ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক নাই মানেন, তবুও তিনি শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরকে মানিয়াও ছলনা, ভণ্ডামী এবং গুণ্ডামী করিতে দেখা যায়, আবার ঈশ্বরকে না মানিয়াও সত্য, ত্যাগ ও উন্নত চরিত্রবান লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আসল কথা আমরা ভণ্ডামী, গুণ্ডামী ও আসুরিকতার বিরোধী।

ঈশ্বর না মানিলেও নাস্তিকবাদী বলিয়া অবজ্ঞা করা যায় না। সাংখ্যকার ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই বলিয়া সাংখ্য-দর্শন নাস্তিক দর্শনের অন্তর্গত কোন দর্শন নহে। সাংখ্য যতটা সত্য বলিতে পারিয়াছিলেন এমন নিখুত তৎপূর্ব্বে আর কেহ বলেন নাই। তাই সাংখ্যের আদি গুরু মহর্ষি কপিলই আদি জ্ঞানী। সাংখ্যের ভিত্তির উপর ভারতের সর্ব্ববিধ জ্ঞান-সম্পদ অবস্থিত। ঈশ্বর না মানিলেও সত্য, ত্যাগ, তেজ আদি দৈবী-সম্পদের অবলম্বন থাকিতে পারে। আবার দৈবী-সম্পদের অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর মানা অর্থে অনেক স্থলেই ছলনা ও চৌর্য্য বৃত্তির জন্য বা 'পেট কো বাস্তে'ই হইয়া থাকে। শাস্ত্র-রক্ষা অর্থে দল বিশেষের বংশপরম্পরায় স্বার্থ-রক্ষা এবং আইন রক্ষা অর্থে জাতি বিশেষের স্বার্থরক্ষা; আবার নেতা সাজিয়া ধর্ম্মরক্ষা অর্থে নিজের স্বার্থ-রক্ষা ইহা তো বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার মূলমন্ত্র। ইহার বিরুদ্ধে কেহ মনে মনে ভাবিলে পর্য্যন্ত শাস্ত্রদ্রোহী, গুরুদ্রোহী, ঈশ্বর-দ্রোহী, রাজদ্রোহী এবং ধর্ম্মদ্রোহী হইতে হয়। সত্য কথা বলা বর্ত্তমান যুগের প্রধান অপরাধ; কিন্তু সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর মানা হয় নাই বলিয়া সাংখ্যের যুগে বা আজ পর্য্যন্তও কেহ ইহাকে নাস্তিক দর্শন বলেন নাই বরং সমগ্র আর্য্য শাস্ত্রের বিচার ভিত্তি সাংখ্য। উন্নত চরিত্র যাঁহার আছে, তিনি আস্তিক কি নাস্তিক তাহার বিচার আমাদের প্রয়োজন নাই। উন্নত চরিত্রই প্রধান আস্তিকতা।

যোগ-দর্শনে ঈশ্বরের কথা আছে, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সেখানে প্রণবকেই (ওঁ) ঈশ্বর বলা হইয়াছে। প্রণব অর্থে মন্ত্রশক্তি। মন্ত্রশক্তি বুঝিতে পারিলে ঈশ্বরত্ব বুঝা যায়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য ঈশ্বর প্রণিধানের কথা যোগ-দর্শনে আছে। মন্ত্রশক্তির দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য উন্নত স্তরের মহাপুরুষের (গুরুর) ও শরণাপন্ন

হওয়া যায়। সেইরূপ ঈশ্বরত্বের স্তরে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষও বিক্ষিপ্ত চিত্ত সাধকের জন্য ঈশ্বর হইতে পারেন। ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাকের পরপারস্থিত পুরুষ ঈশ্বর। আমরা গণেশ, সূর্য্য. বিষ্ণু, শিব ও শক্তি কেন্দ্রস্থিত অনুভূতিকেই ঈশ্বর মানিয়াছি। সাধকগণ অনুভূতির ক্রম গভীরতার পথে শেষ স্তরে ঈশ্বরত্বের স্তরে চলিয়া আসেন। অনুভূতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য যোগ-দর্শনে, উপনিষদে, গীতায় এবং অন্যান্য শাস্ত্রে প্রণবকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। শুধু ওঁকার প্রণব নহে অন্যান্য বীজ মন্ত্রগুলিও প্রণব জানিতে হইবে। আমরা এই গ্রন্থের শেষ ভাগে মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পাঠকগণ সেই অংশ আলোচনা করিয়া প্রণব, ঈশ্বর, ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিবেন। এখন আমরা দুর্গা ধ্যানের অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দুর্গাং জয়াখ্যাং = জয় নামক দুর্গাকে।

অনেক প্রকারের দুর্গা বা শক্তি মূর্ত্তির কথা শাস্ত্রে আছে। দশভূজা, অষ্টভূজা, চতুর্ভূজা ইত্যাদি বহু প্রকারের দুর্গার ধ্যান আছে। বাস্তবিক দুর্গা বলিতে যে কোন শক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। দশমহা-বিদ্যার অন্তর্গত যত প্রকারের শক্তি আছে সকলেই দুর্গা বলিয়া পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। আমরা এ স্থানে যে দুর্গার আলোচনা করিতেছি তিনি সাধক সমাজে জয়দুর্গা বলিয়া পরিচিতা।

দুর্গ এবং আর্ত্তি যিনি নাশ করেন তিনিই দুর্গা। দুর্গা শব্দের সহজ অর্থ কেল্লা বা গড় (Fort) কঠোর বন্ধন। আত্মবিকাশের পথে শক্তিশালী অন্তরায়। এই অন্তরায় যাহাতে নষ্ট হয় এমন শক্তিই দুর্গা। মানুষ যদি ভোগী, মোহি এবং অভিমানীর হাতে নিজের সামান্য শক্তিও ছাড়িয়া দেয় তবে তাহার আত্মবিকাশের পথে তাহা একটা প্রকাণ্ড দুর্গ হইয়া দাঁড়াইবেই। যদি বল মানুষ ভোগী, মোহি এবং অভিমানী থাকিবেই তবে একথাও বলা প্রয়োজন যে মানুষকে সর্ব্বশক্তি

নিজেদের হাতেই তুলিয়া লইতে হইবে। ভোগী, মোহি এবং অভি-মানীকে মানুষ রাজা, গুরু, শিক্ষক বা পুরোহিতের আসন নির্ব্বিচারে ছাড়িয়া দিয়া আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ করিতে পারে না প্রত্যেক মানুষকে এমন নীতি মানিয়া লইতে হইবে যাহাতে শক্তি-স্তরের বিকাশের পথ খুব সহজ হইয়া যায়। মানুষের শাসন-বিভাগ শক্তি-স্তরের বিকাশের আদর্শ লইয়া প্রথম দাঁড়াইবে। পরে সেই শক্তির কোলে শিব, বিষ্ণু, গণেশ ও সূর্য্য আপনিই স্থান পাইবে। তখন আমরা দেখিতে পাইব শিব, বিষ্ণু এবং সূর্য্য-কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতার দ্বারা মানুষ আত্মবিকাশে বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাইব যে ঐ সব কেন্দ্রস্থিত অনুকূল শক্তি জাগ্রত হইয়া জগতে মানুষের বিকাশে সাহায্য করিতেছে।

বিষ্ণু, শিব এবং সূর্য্য-কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতাও যে তত্তৎকেন্দ্রপুষ্ট মানুষে থাকিবে না একথাও বলা উচিত হইবে না। সেই সব দুর্ব্বলতা থাকিবেই। কিন্তু শক্তি-স্তরকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যাহাতে এই সব কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতার দ্বারা কেহ মানুষকে আত্মবিকাশে বাধা দিতে না পারে। যেমন পুত্রাদিতে মোহ বিষ্ণু-কেন্দ্রের দুর্ব্বলতা। এ দুর্ব্বলতা এই কেন্দ্রস্থিত মানুষে থাকিবেই। এই মোহবশে নিজের চরিত্রহীন পুত্রাদিকে স্বর্গের দূত বলিয়া একজন লোক অনায়াসে মনে করিতে পারে। এরূপ মনে করার উপর সমাজের বাধা দিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সেই পুত্রটীকে বড় করিতে যাইয়া অন্যের সচ্চরিত্র পুত্রটীকে ছোট করিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা যদি কাহারও জাগ্রত হয় তবে 'শক্তি' তাহা কিছুতেই সহ্য করিবে না। এরূপে বাধা প্রাপ্ত হইলে শীঘ্রই সেই কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলচিত্ত মানবগণ নিজেরাই নিজেদের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিবেন। অথবা সেই পুত্রই একদিন বুঝিতে পারিয়া পিতার দুর্ব্বলতার প্রতিবাদ নিজেই করিতে আরম্ভ করিবে।

একদল মানুষ খুব দৃঢ় হইয়া শক্তিস্তরে দাঁড়াইতে পারিলে সবটা পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হইতে পথ পাইবে। শক্তি স্তরের উপাদান সত্য, প্রেম, শান্তি এবং আসুরিকতার বিরোধিতা। সঙ্গে সঙ্গে ভোগেচ্ছাহীন, মোহহীন এবং অভিমানহীনও হইতে হইবে। মানুষ ভোগে, মোহে এবং অভিমানে বদ্ধ হইয়া নিজেদের পার্থিব সুখ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যের আত্মবিকাশের পথে শাস্ত্র, সংগঠন এবং অস্ত্র শক্তিবলে শক্তিশালী অন্তরায় প্রস্তুত করিয়া রাখে। তাহাই এখানে দুর্গ বলিয়া জানিতে হইবে। 'দুর্গ' সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা এবং রাজশক্তি সব স্থান হইতেই আসিতে পারে। তাই সমাজ ধর্ম্ম, শিক্ষা এবং শাসন সবই আত্মবিকাশের অনুকূল করিয়া স্থাপন করিতে হইবে।

প্রত্যেক জীব আত্মকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিকাশ করিতে চাহে; অথবা জীব পূর্ণাবস্থা পাইতে চাহে—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সমাজ এবং শিক্ষার দোষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোন কোন স্থানে হইয়া থাকে। জ্ঞানের ৪ কলা পর্য্যন্ত পাশবিক ভোগের বিকাশ। ৪ কলার পর ৫ কলা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে বৈষয়িক এবং পাশবিক ভোগেচ্ছা কম হইয়া ত্যাগের বিকাশ হইয়া থাকে। ৬ কলায় শিক্ষার বিকাশ। ৭ কলায় প্রেমের পূর্ণ বিকাশ; এই কলা হইতেই মানুষ সংগঠনশক্তি লাভ করেন। ৭৷৷৹ কলা জ্ঞানের অধিক বিকাশে শক্তিশালীগণ জীবত্বের অভিমান বা অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইবার শক্তি লাভ করেন; ইঁহারাই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত। কিন্তু ৭৷৷৹ কলা পর্য্যন্ত বিকাশে অর্থাৎ বিষ্ণু-কেন্দ্রের পূর্ণ শক্তি বিকাশে মানুষের জীবত্বের অভিমান নষ্ট হয় না। এই অভিমান নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত সব মানুষেরই ভোগ, মোহ এবং অভিমানের বেগ আসিবার সম্ভাবনা থাকে। যতক্ষণ অভিমানের বেগ আছে ততক্ষণ মনের ভোগমুখী প্রবৃত্তিও জাগরিত হইতে পারে। ভোগ অবশ্য ঘৃণিত পদার্থ নহে। কিন্তু একজনের ভোগের সুবিধার জন্য বহু লোকের

আত্ম-বিকাশের পথে কণ্টক প্রস্তুত করা ভীষণ অপ্রাকৃত চেষ্টা। একজন মানুষ বিষ্ণু-কেন্দ্রের শক্তি লাভ করিবার পর যদি কর্ম্মযোগের আদর্শ ত্যাগ করিয়া স্বার্থে জড়িত হইয়া আসুরিক ভাব অবলম্বন করে তবে সমাজের খুবই বিপদ জানিতে হইবে, কারণ সে এখন সংগঠন শক্তি লাভ করিয়াছে। একদল সরল লোক (শিব-কেন্দ্র-পুষ্ট) সে তাহার দলে পাইবেই এবং একদল চাটুকার স্বার্থপর (অস্বাভাবিক ভাবে বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট) মানুষ লোভবশে তাহার অধীনে থাকিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইবে। ইহারা নিজের আত্মোন্নতি করিবে না, অন্যকেও বিকাশের পথে যাইতে দিবে না। মিথ্যা, প্রতারণা, ছলনা ইহারা সর্ব্বাবস্থায় অবলম্বন করিবে। পৃথিবীর ইতিহাস বিচার করিলে একথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে বড় বড় সংগঠন এবং রাজশক্তিগুলি অনেক সময় আসুরিক আদর্শ গ্রহণ করিয়া মানুষের আত্ম-বিকাশের পথে কণ্টক প্রস্তুত করিয়াছে। আত্ম বিকাশের পথে এই সব শক্তিশালী অন্তরায়ই 'দুর্গ' বলিয়া জানিতে হইবে।

এতো দুর্গের কথা হইল, এবার 'আর্ত্তি' কাহাকে বলে জানিতে হইবে। রোগ, শোক, কলহ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আদিকে 'আর্ত্তি' বলে। আর্ত্তিগুলির জন্য কতকাংশ রাজশক্তি এবং কতকাংশ ধর্ম্মশক্তি দায়ী। রাজশক্তি মানুষের আত্মবিকাশে সাহায্যের জন্য মানুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। মানুষ গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিবকেন্দ্রস্থিত আত্মবিকাশক শক্তিকে নিজের সমাজের মধ্যে জাগ্রত রাখিবে; আবার তত্তৎ কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতার দ্বারা যাহাতে মানুষের আত্মবিকাশের পথে কণ্টক প্রস্তুত না হয় তাহারও উপর নজর রাখিবার জন্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া রাখিবে। মানুষের সমাজে ইহাই রাজশক্তি। রাজশক্তি পূর্ব্বোক্ত সবগুলি শক্তির সমষ্টি এবং সহায়ক। আবার পূর্ব্বোক্ত শক্তিস্থিত দুর্ব্বলতাগুলির বিরোধী।

মানুষ অন্তরস্থিত কর্ম্মরাশিকে জগতে মূর্ত্তি দিতে চাহে ইহাই মানুষের 'কর্ম্ম'। মানুষ যতক্ষণ নিজের অন্তরস্থিত পূর্ণশক্তি বিকাশের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে না ততক্ষণ সে পূর্ণ কর্ম্মীও হইবে না। তাহার কর্ম্মে দুর্ব্বলতা থাকিবেই। তাই সে নিজের অন্তরস্থিত খণ্ড কর্ম্মশক্তির ক্রিয়াকে জগতে মূর্ত্ত করিতে যাইয়া জগতের বহু লোকের আত্ম-বিকাশের পথে যে কণ্টক প্রস্তুত করিবে ইহা স্বাভাবিক। রাজশক্তি সে সময় তাহার প্রতিবিধান করিবে। রাজশক্তি যদি শক্তি-স্তরের আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত না থাকে তবে সে রাজশক্তির দ্বারা সেরূপ সুফল আশা করা যায় না। রাজশক্তি যদি আসুরিক ভাবাপন্ন হয় তবে সে রাজশক্তি প্রজার আত্মবিকাশের বিরোধীই হয়। রাজশক্তি তখন নিজেই মিথ্যা কথা বলিতে থাকে এবং প্রজাকে সত্য কথাটি বলিতে পর্য্যন্ত দেয় না। সে তখন গুণ্ডা পোষণে ব্যস্ত হয় এবং মানুষের আত্ম-বিকাশের পথে শক্তিশালী অন্তরায় প্রস্তুত করে। প্রজার অন্নবস্ত্র পর্য্যন্ত সে আইনের বলে হস্তগত করে এবং প্রতিবাদপরায়ণ সমাজ-শক্তিকে শত খণ্ডে খণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং সমাজে মনঃ-পীড়া, কলহ ও অশান্তি দেখা দেয়। এদিকে অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, রোগ, শোক, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি নানাপ্রকার অশান্তি আসিয়া জোটে। রাজার কর্ত্তব্যে দায়িত্বহীনতায় সমাজে এ সব আর্ত্তি দেখা দেয়। এদিকে তপঃ-শক্তিও বহুবিধ আর্ত্তির জন্য দায়ী। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি আদি দৈব দুর্ব্বিপাকের জন্য তপঃশক্তিকে দায়ী করা হয়। তপস্বীর তপঃশক্তিতে বায়ুমণ্ডল নির্ম্মল হয়। মানুষের মনোজগৎ এবং দৈব-জগতের উপর তপস্বীর তপঃশক্তির অসীম প্রভাব বিদ্যমান্। তপঃশক্তি ভারতের বক্ষে বেশী বিকাশ পাইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত সমাজ যাহাই বলুন না কেন ভারতের চিন্তাশক্তি এবং আকাশ মণ্ডলীর উপর তপঃশক্তির বিশেষ

প্রভাব এখনও আছে। ভারতের বৃষ্টি শস্য এবং আবহাওয়ার উপর সেই সব চিন্তাশক্তি বিশেষ কাজ দিত। বর্ত্তমান সময় প্রকৃত সাধক, যোগী এবং তপস্বীর সংখ্যা খুব কম হইয়া গিয়াছে, কাজেই ভারতের সেই তপঃশক্তি খুবই নিষ্প্রভ। সমাজ-শক্তি বা বিষ্ণু-কেন্দ্র উৎপন্ন চিন্তারাশী, ভাবরাশী এবং বিচাররাশীর দ্বারা ভারতের মনোজগৎ বহুদিন শাসিত হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় দুই হাজার বৎসর ভারতের চিন্তাকে বিষ্ণু-কেন্দ্রশক্তি শাসন করিয়াছে। বর্ত্তমান সময় বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট চিন্তার সৎ ভাগ ভারতে নাই বলিলেই চলে। বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট অসৎ ভাব বা দুর্ব্বলতা ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ভারতের সর্ব্বনাশের মূলে ইহাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিত্তি। সেরূপ ভাবপুষ্ট সকল ধর্ম্মশক্তি বা তপঃশক্তি জনকয়েক পূজারীর হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এদিকে বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট সঙ্কোচ চিন্তায় প্রভাবান্বিত শাস্ত্রজ্ঞগণ সেই পূজারিগণের পৃষ্ঠপোষণ করিয়া ভারতের তপঃশক্তিকে একেবারে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন। সত্য এবং ত্যাগই হইল তপঃশক্তির সর্ব্ব-প্রধান অবলম্বন। তাহা বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রজ্ঞ এবং পূজারিগণ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। সেই স্থানে আসিয়াছে বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট অজ্ঞানতার দিকটা—মোহ, ছলনা, লোভ এবং ভোগ। ইহাদের মিথ্যা আচার দেখিলে ভয় হয়। শয়নে, উপবেশনে, স্নানে, আহারে ও গমনে সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে ইহারা শত শত মন্ত্র উচ্চারণ করে, কিন্তু সত্য কথা একটীও বলে না। শত শত কুসংস্কারকে ইহারা পবিত্রতার নিদর্শন বলিয়া মনে করে এবং মানুষের সঙ্গে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত দুর্ব্ব্যবহার করিয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। মূর্খ লোককে ছলনা করিয়া উপার্জ্জন করিবার জন্য পূজার খুব ঘটা দেখাইতে চেষ্টা করে ; শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা, স্তোত্র, ধূপ ধূনা খুব জ্বলে, কিন্তু চরিত্রে ভক্তি, ত্যাগ ও সংযম এক বিন্দুও নাই। এদিকে যাঁহারা ত্যাগের পথ

ধরিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে খুব বড় বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের চরিত্রেও শিব-কেন্দ্রস্থিত শান্তি এবং সরলতার বিকাশ না হইয়া বিষ্ণু-কেন্দ্রস্থিত অজ্ঞানতার ছাপই ফুটিয়া উঠে। মঠ, মন্দির, শিষ্য, শিষ্যা লইয়া নূতন করিয়া সংসার করিবার পন্থা কইয়া দিন কাটান। কেহ বা শিষ্যধনে প্রস্তুত সম্পত্তি, পুত্র ও স্বজাতি সেবার জন্য নিতান্ত নির্লজ্জের মত ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করেন না। কেহ বা সন্ন্যাস-আশ্রমোচিত নাম গ্রহণ করিয়া ছলনা করিবার জন্য ভাবাবেশের ঢং, সমাধির ঢং বা যাদুকরী বিদ্যা চালাইয়া থাকেন। কেহ বা চারটা ভোজবাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া নামজাদা মহাপুরুষ হইয়া গেরুয়ার আবরণে সংসারী হইয়া মোহেরই সেবা করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট সমাজ কি আশা করিতে পারে? সমাজের জন্য প্রয়োজন ভোগ-মোহ-অভিমান-হীন ত্যাগী, তপস্বী এবং সাধক পুরুষ। আবার ঐ দিকে শিষ্যগণও সেইরূপভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে—উঠিতে, বসিতে, রামনাম, কৃষ্ণনাম, দুর্গানাম জপ চলে, কিন্তু স্বার্থ ও ছলনা তাহাদের অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিয়া আছে। সৎকাজে একটী পয়সা দান করিতে প্রাণ চড়চড় করে। সত্য কথাটী বলিবার মত শক্তি বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটী কথা বলিবার শক্তি তাহাদের হয় না। মানুষের আত্মবিকাশে সর্ব্বশক্তি এমন কি ধর্ম্মশক্তিও যদি মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ দেখাইতে না পারে, মানুষ যদি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কেবল মোহই বৃদ্ধি করিতে থাকে তবে কাহার চিন্তা-শক্তিতে দৈব-জগৎ (ভাবজগৎ) বা বায়ুমণ্ডল নির্ম্মল হইবে?

এদিকে রাজশক্তি যদি আসুরিক আদর্শ গ্রহণ করিয়া শোষনে এবং পীড়নে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে তবে জগতে কর্ম্মের নির্ম্মলভাব মূর্ত্ত করিবে কে? সৈন্যবিভাগ, পুলিস, বিচার, শাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা, ডাক ও রেলওয়ে প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে দৈবী-

সম্পদের বিশেষ বিকাশ থাকার প্রয়োজন। ইহারাই মানব-সমাজের কর্ম্মবিভাগ। ইহারা যদি মনুষ্যত্বহীন হইয়া মানুষের পীড়নের পথ অবলম্বন করে, মিথ্যা, ছলনা, উৎকোচ গ্রহণ এবং চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে তবে মানুষ দাঁড়ায় কাহার আশ্রয়ে? মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশধারা কোন্ পথে আসিবে? এই ভাবে মানুষের ভাব-জগৎ ধর্ম্মশক্তি এবং রাজশক্তি কর্তৃক নির্ম্মল না হইয়া দিন দিন মলিন হইতে থাকে। সুতরাং দৈব-জগৎও (বায়ু মণ্ডল) মানুষের আর অনুকূল থাকে না—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি আদি আর্ত্তি দেখা দেয়। এই যে 'দুর্গ' এবং 'আর্ত্তি' ইহা হইতে যে শক্তি মানুষকে উদ্ধার করেন তিনিই 'দুর্গা'।

মানুষ শক্তিস্তরের আদর্শ গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে। আবার নিজের অন্তরস্থিত অন্যান্য কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতাকে অবলম্বন করিয়া এই পৃথিবীটাকে নরকের সমকক্ষ করিতে পারে। শক্তিস্তরের আদর্শকে অবলম্বন করিয়া বহু লোক যদি গঠিত হইয়া উঠিতে পারেন তবে জগতের বিশেষ কল্যাণ হইবে। ব্যবসায়ী, কৃষক, মজুর, শিক্ষক এবং ছাত্রগণ তো খুব সহজেই অগ্রসর হইতে পারেন; যাঁহারা মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত তাঁহারাও পারেন যাঁহারা রাজ-সেবক তাহাদের ত হওয়াই প্রয়োজন। আসুরিক শক্তি মানুষ নিজে প্রতিষ্ঠা করে। দৈবী-শক্তিও মানুষ নিজেই প্রতিষ্ঠিত করিবে। মানুষ সর্ব্বাবস্থায় শক্তি-স্তরকে নিজের কর্ম্মে, চরিত্রে, চিন্তায় ফুটাইয়া তুলিবে। এইরূপে কিছু মানুষ প্রস্তুত হইয়া যাইবার পর তাহাদের চিন্তায়, চরিত্রে এবং কর্ম্মে প্রায় সমস্ত মানুষই তাহাদের দিকে একদিন আকৃষ্ট হইবে। তখনই পৃথিবী 'দুর্গ এবং আর্ত্তি' শূন্য হইয়া গড়িয়া

[ভারতের বর্ত্তমান চিন্তাধারা পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং প্রভুত্বের সংঘর্ষে

এমন এক অদ্ভুতরূপে গড়িয়া যাইতেছে যে অনেকেই এখন কর্ম্মের এবং জীবনের লক্ষ্য ঠিক মত ধরিতে পারিতেছেন না। আমরা এই গ্রন্থে মাত্র কর্ম্মের বিজ্ঞান অংশই আলোচনা করিয়া চলিয়াছি। কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথাই স্পষ্ট বলা হয় নাই। কর্ম্মিগণ অপনাপন কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই নিজেকে গড়িবার মত উপাদান এই গ্রন্থ হইতে আহরণ করিবেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র, সমাজ বা সংগঠনকে শক্তি-স্তরের দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবেন। শক্তি-স্তরের আদর্শে এই পৃথিবীর সর্ব্ববিধ নীতি রীতি গড়িয়া না লইলে মানুষের আর শান্তি হইবার পথ নাই। আইন রক্ষাই সব নহে, শাস্ত্র রক্ষাই সব নহে। দেখিতে হইবে আইন ও শাস্ত্ররক্ষার অন্তরালে শক্তি-স্তরের সন্ধান আছে কি না। প্রত্যেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রস্থিত চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে নিজের চরিত্রে মিলাইয়া লইবেন এবং প্রত্যেক কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতা-গুলিকে জয় করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন; কেহই আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিবেন না। তাহা হইলেই আপন চরিত্র এবং কর্ম্মশক্তির বৈশিষ্ট্য নিজ কর্ম্মক্ষেত্রস্থিত মানবে প্রতিফলিত হইবে। ভারতের আদর্শের বৈশিষ্ট্য (অধ্যাত্মবাদ) আজ খর্ব্ব হইয়া গেলেও ভারত একদিন নিজের বৈশিষ্টাকে লইয়াই দাঁড়াইবে। ভারতের সমাজবাদ মধ্য যুগে মোহকে অবলম্বন করিবার দরুণ ভারতের আত্মবিনাশের কারণ হইয়া ভারতকে বহুদিন অপদস্থ করিয়া রাখিয়াছে একথা সত্য। মোহমুগ্ধ সমাজবাদিগণ এমন শক্তিশালী ছিলেন যে তাঁহারা কৌশলে ভারতের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁহারা সব সময়েই মোহের দোকানদারীর পাল্লায় ওজন করিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিয়া প্রচার করিয়া চলিয়াছিলেন। বহু মহাপুরুষ মধ্য যুগে এই মোহের দোকান ভাঙ্গিয়া দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পারিয়া উঠেন নাই। বহুদিন ভারতে যে সব শক্তিশালী তপস্বীর আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারা কেহই শিব

স্তরের অনুভূতির উপর দাঁড়াইতে পারেন নাই। তাই শক্তি-স্তরের শিক্ষা, দীক্ষা ও কর্ম্ম প্রচেষ্টা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। একদল মানুষ শক্তি-স্তরের কর্ম্ম-প্রবাহকে ধরিয়া রাখিবার মত যদি সমাজে থাকিত তবে মোহমুগ্ধ সমাজশক্তির একাধিপত্য এমন ভ্রান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা শ্রেণী বিভাগ সমাজের বিরোধী। আমরা স্বাভাবিক শ্রেণী বিভাগের বিরোধী নহি, কিন্তু আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর আত্মবিকাশের পথে যে সব কণ্টক প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই সব কণ্টকের বিরোধী। আমরা চাই মানুষ মাত্রেরই আত্মবিকাশের পথ সহজ হইয়া যায়। শ্রেণী-বিভাগ ও কর্ম্ম বিভাগ যত ইচ্ছা থাকুক কিন্তু শাস্ত্রের নামে স্বার্থ-রক্ষা, এবং আইন রক্ষার নামে স্বার্থরক্ষা যাহারা করিতে চায় তাহাদিগকে মানুষ আর বেশী দিন বিশ্বাস করিবে না। মধ্য যুগের অধিকাংশ মহাপুরুষই বিষ্ণু-কেন্দ্র বা সূর্য্য-কেন্দ্র শক্তির সং অংশের অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়া ধর্ম্মপ্রচার বা সমাজ সংস্কার করিয়া চলিয়াছিলেন। শক্তি-স্তরের কোন আভাষ প্রায় কাহারও চিন্তায় স্থান পায় নাই। শিখ সমাজের দশম গুরু গুরু গোবিন্দ সিংহের চিন্তায় শক্তি-স্তরের কথা জাগিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রভাব শিখসমাজেই নিবদ্ধ হইয়া রহিল। শক্তি-স্তরের সাধনা ভাণ্ডার 'তন্ত্র' তাহা পঞ্চমকারের আবরনে আবরিত হইল; পরে তাহা ব্যাভিচার এবং বশীকরণ বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। বীরের অভাবে বীরের সাধন-ভাণ্ডার আজ পর্য্যন্ত ব্যাভিচারের হাতেই পড়িয়া রহিয়াছে। সমাজ ও বীরের সাধনা ছাড়িয়া দিয়া আজ ভাবের ঢংএ গড়াগড়ি দিতে লাগিয়াছে। বাস্তবকে বাদ দিয়া ভাবকে অবলম্বন করিয়া একটা জাতি কতদিন বাচিতে পারে? শক্তিকে বা আত্মাকে বাস্তব মানিয়া—অমর হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়, অথবা শরীরকে অমর ভাবিয়া কর্ম্ম করিয়া জগৎকে ভোগ করা প্রয়োজন। ভাবকে

লইয়া বাস্তব ছাড়িয়া দিলে কি ফল হইবে ?]

আমাদের আলোচনার বিষয় হইল "দুর্গাং জয়াখ্যাং"। এতক্ষণ 'দুর্গাং' শব্দের আলোচনা করা হইয়াছে, এবার 'জয়াখ্যাং' সম্বন্ধে বলা হইবে। এই শক্তি-স্তরের সন্ধান যাঁহারা পান বা যাঁহারা শক্তি-স্তরের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহাদের অন্তরস্থিত কোন দুর্ব্বলতাই কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অর্থাৎ কোন প্রকার দুর্ব্বলতাকেই তাঁহারা আর প্রশ্রয় দেন না। তাই তাঁহারাই বিজয়ী বলিতে হইবে। কর্ম্মী এবং জ্ঞানী উভয়েই এস্তরে আসিয়া পূর্ণ হন। এস্তরের জ্ঞানীগণের ভাবাবেশের মোহ, ধ্যানাবস্থার লোভ এবং যোগাবস্থার শান্তির বন্ধন থাকে না; আবার কর্ম্মিগণেরও ত্যাগের উগ্রতা (গণেশ), আদর্শের মোহ (সূর্য্য), সম্প্রদায় বিশেষের উপর টান (বিষ্ণু) এবং অভিমান (জেদ্ প্রধান মনোবৃত্তি) বা নিজেকে বিশ্বমানবতা হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়া আসুরিক ভাব অবলম্বনে ভোগের তৃপ্তিতে কর্ম্মবেগ থাকে না। এস্তরে আসিলে কর্ম্মী এবং জ্ঞানিগণ সর্ব্ববিধ লৌকিক এবং অলৌকিক দুর্ব্বলতাহীন হইয়া থাকেন। এস্তরে আসিয়া মানুষ সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতাকে জয় করিয়া পূর্ণ শক্তিমন্ত হন। তাই এই দুর্গা-স্তরকে 'জয়' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

ত্রিদশগণাবৃতাং—(১) দেবতাগণ দ্বারা বেষ্টিতা।
(২) সমস্ত শক্তি পরিবৃতা।
(৩) সমস্ত সৃষ্টি-কেন্দ্রস্থিতা।

দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন মানুষকেই দেবতা বলা হইয়াছে। যাঁহারা দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন মানব তাঁহারা স্বভাবতঃই এই কেন্দ্র-শক্তির সহিত সহানুভূতি এবং সংযোগ রাখেন।

ত্রিদশ (৩ × ১০) = ত্রিশ, ত্রিদশ অর্থে ৩০। ত্রিদশের গণ = ত্রিদশ-গণ। ইঁহাদের দ্বারা বেষ্টিতা বা আবৃতা।

এখানে ত্রিশ অর্থে ৩০ কলা। পূর্ব্বে 'মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং' অংশে ৩০ কলা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। সেখানে এই ৩০ কলাকে চন্দ্রের কলার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ১৫ কলা এবং পুনঃ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৫ কলা, উভয়ে মিলিয়া ৩০ কলা হয়। মহত্তত্ত্বে বা মহৎ ব্রহ্মেই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ একথা অনেকস্থানেই আলোচনা করা হইয়াছে। মহত্তত্ত্বের অংশের তারতম্যেই সৃষ্ট জীবের মধ্যে ছোট বড় বিচার হইয়া থাকে। একথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মহত্তত্ত্বের এক কলা শক্তিতে উদ্ভিজ্জের বিভূতি। উদ্ভিজ্জের গণ, এক কলার গণ এবং এক কলার সৃষ্টিসত্তার এক কথা। মহত্তত্ত্বের দুই কলা শক্তিতে স্বেদজ সৃষ্টির যত জীব আছে তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। চারি কলায় জরায়ুজ সৃষ্টি অর্থাৎ বৃক্ষাদি (এক কলার বিভূতি), কীটাদি (দুই কলার বিভূতি), পক্ষী আদি (তিন কলার বিভূতি) এবং পশ্বাদি (চারি কলার বিভূতি। পর্য্যন্ত পূর্ণ জ্ঞান-শক্তি বা মহত্তত্ত্বের চারি কলার বিকাশ। এই পর্য্যন্ত ইচ্ছাশক্তির * বিকাশ জানিতে হইবে। ইহার পর ক্রিয়া-শক্তি

* ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞান-শক্তি। শক্তির ক্রম-বিকাশকে এই তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। জ্ঞান-শক্তিই মহৎতত্ত্ব একথা অনেকস্থলেই বলা হইয়াছে। জীব যখন যৌনসম্বন্ধযুক্ত ভোগে তৃপ্ত থাকে ততক্ষণ তাহারা ইচ্ছা-শক্তি বিকাশের অন্তর্গত জানিতে হইবে। আমাদের অন্তরে যে ভোগ সম্বন্ধযুক্ত মনোবেগ ইহাই আমাদের অন্তরস্থিত ইচ্ছা-শক্তির রূপ। আমরা পঞ্চম কলায় পুষ্ট হইলে আমাদের এই ভোগ বেগের তীব্রতা আর থাকে না। (যাহারা আসুরিক বিকাশ লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহারা ৭॥ কলা পর্য্যন্ত এই ভোগবেগকে উপাদেয় মনে করে) ইহার পর আমরা ক্রিয়াশক্তির পুষ্টির ক্ষেত্রে হইয়া থাকি। তখন ত্যাগকে অবলম্বন করিয়া আমরা সমাজ, দেশ এবং ধর্ম্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকি। ৭॥ কলা পর্য্যন্ত ক্রিয়া শক্তির বিকাশ। (যাহারা অবতার বিকাশ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা এই ক্রিয়াশক্তিকে ১৪ কলা পর্য্যন্ত বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।) ৮ কলা হইতে ১৫ কলা পর্য্যন্ত জ্ঞানশক্তির বিকাশ। ৮ কলার বিকাশ আসিলে আমাদের অভিমানটী থাকে না। একই আত্মা সকলের মধ্যে সমান ভাবে অবস্থিত, কিন্তু অভিমানটী আমাদের অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিতেছে। এই অভিমানই আমাদের জ্ঞানের পথে প্রধান অন্তরায়। অভিমান নষ্ট হইলেই ঠিক ঠিক জ্ঞান শক্তির বিকাশ আরম্ভ হয়।

যা কর্ম্ম শক্তির বিকাশ মানা হইয়াছে। ৪ কলা হইতে উন্নত বিকাশ মানুষে হইয়া থাকে। মানুষের আকার লইয়া যাহারা পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহারা কেবলই পশু নহে, পরন্তু তাহাদের মধ্যে কর্ম্ম-শক্তিরও কিছু বিকাশ হইয়াছে জানিতে হইবে। ৫ কলার বিভূতি গণেশ-লক্ষণসম্পন্ন মানুষকে জানিতে হইবে। ইঁহারা খুব নিস্বার্থ কর্ম্মী, ত্যাগী এবং নিষ্ঠুরের মত অন্যায় ও অসত্য বিরোধী হইয়া থাকেন। জগৎ মঙ্গলকর কর্ম্মে এবং জ্ঞানের পথে যাঁহারা প্রয়োজন মত ত্যাগ এবং সত্য অবলম্বন করিতে পারেন তাঁহারা ৫ কলার বিকাশ। যাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম কলা শক্তির বিকাশ কম তাঁহারা যুবকগণের নেতৃত্ব করিতে পারেন না।

ষষ্ঠ কলা-শক্তি সূর্য্য-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষে বিকশিত হইয়া থাকে। সূর্য্য-লক্ষণযুক্ত মানুষও সত্য, ত্যাগনিষ্ঠ এবং অন্যায় বিরোধী হইয়া থাকেন। তবে তাঁহারা কঠোর ভাবে অন্যায় বিরোধী হন না। সূর্য্য-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষ প্রেমী হন। তাঁহাদের প্রাণ একটু কোমল। ইঁহারা স্বভাবতঃ একটু বিলাসী প্রকৃতির এবং সাবধানী হইয়া থাকেন। যাঁহাদের মধ্যে সূর্য্য-কেন্দ্রের ভাল বিকাশ হয় নাই তাঁহাদিগকে কৃপণ হইতে দেখা যায়। স্ত্রী পুত্রে ইঁহাদের খুব মোহ থাকে। যাহা হউক সূর্য্য-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষের ত্যাগে যতটা নিষ্ঠা হয় না ভালবাসায় তাহা হইতে বেশী নিষ্ঠা হইয়া থাকে। সূর্য্য-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষ যদি সত্য এবং ত্যাগকে বজায় রাখিয়া প্রেমী হইতে পারেন তবে প্রায়ই জগৎ পূজ্য হইয়া থাকেন। গণেশের সত্য ও ত্যাগ এবং সূর্য্য কেন্দ্রের সর্ব্বজীবে সমান প্রেম যদি কোনও চরিত্রে বিকশিত দেখিতে পাওয়া যায় তবে সেখানে ষষ্ঠ কলা বিকশিত হইয়াছে জানিতে হইবে। ইঁহারা প্রচার প্রধান কর্ম্মী হইয়া থাকেন। শান্তি এবং প্রেম ইঁহাদের প্রধান দৈবী-সম্পদ। ইঁহাদের সংগঠন সত্যের প্রচার করে এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ মাত্র করে।

সপ্তম কলার বিভূতি—বিষ্ণু শক্তির বিভূতি। এখানে দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষ এবং আসুরিক সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। যাহারা শিক্ষা এবং সঙ্গ দোষে শিবকেন্দ্র হইতে বিষ্ণু-কেন্দ্রে পুষ্ট হয় তাহাদের মধ্যে ৪।০ কলার বেশী বিকাশ হয় না। ইহারা অত্যন্ত নির্লজ্জ প্রকৃতির লোক হইয়া থাকে। সূর্য্য-কেন্দ্রের বিকাশ হইতে যাহারা সঙ্গ প্রভাবে বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট হয় তাহারা অত্যন্ত চাটুকার এবং মিথ্যাবাদী হইতে দেখা যায়। তাহারাও সপ্তম কলায় বিকশিত মানা হইবে না। যাঁহারা সপ্তম কলার বিকাশ স্থল হন তাঁহারা সূর্য্য এবং গণেশ কেন্দ্র শক্তির বিকাশের বিশেষত্বগুলি জানিতে পারেন। তাঁহাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা সবলতাও বুঝিতে পারেন; কর্ম্মক্ষেত্রে ঐসব স্বভাবের নকল করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশও করিতে পারেন। উন্নতকলা শক্তি-সম্পন্নগণ নিম্নকলা-শক্তির ওজন করিতে সমর্থ। ইঁহারা প্রায়ই রাজশক্তি সম্পন্ন বা বিশেষ সংগঠিত সমাজ শক্তির পরিচালক হইয়া থাকেন। যাঁহারা প্রচুর ধনবান তাঁহারাও বিষ্ণুকেন্দ্র শক্তির বিকাশস্থল। বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মানব ভোগী হন। ভোগ, ছলনা এবং সংগঠন ইঁহাদের স্বভাবে থাকিবেই। দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মানব খুব দয়ালু এবং দাতা হন। ইঁহাদেরই ত্যাগে ও দানে দেশ উন্নত হইয়া থাকে। আসুরিক সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মানব ছলনার আড়ালে আত্ম-গোপন করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং শোষক হইয়া থাকে। জগতে সর্ব্বপ্রকার অন্যায় বিষ্ণু কেন্দ্র হইতে আসিয়া থাকে। গণেশ-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষ—গণেশ-কেন্দ্রস্থিত বৈশিষ্ট্য (জগৎ-মঙ্গল লক্ষ্য) বজায় রাখিয়া যদি বিষ্ণু-কেন্দ্র-শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারেন তবে জগতের বিশেষ মঙ্গল হয়। বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মানুষ যদি গণেশ-কেন্দ্রস্থিত বৈশিষ্ট্যকে নিজের জীবন লক্ষ্যের সম্মুখে রাখিতে পারেন এবং

শিব-কেন্দ্রস্থিত স্বাভাবিক জীবন অবলম্বন করিতে পারেন তবে তাঁহারাও খুব সহজে শক্তি-স্তরে চলিয়া আসিবেন।

অষ্টম কলা জীবন্মুক্তের বিভূতি। ইঁহারাই ঋষি স্তরের মানব। ইঁহাদের অভিমান (জীবত্বের অভিমান) থাকে না। ইঁহারা পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম কলা পুষ্ট মানুষের চরিত্র এবং তাহাদের কর্ম্ম-শক্তি-দ্বারা জগতের কতটা উপকার বা অপকার হইবে তাহা বুঝিতে পারেন। যদি বুঝিতে না পারেন তবে জানিতে হইবে অষ্টম-কলায় আসেন নাই। এই অষ্টম কলাই ঋষি বা জীবন্মুক্তের বিভূতি। মানুষ আট কলায় আসিলে সমস্ত মানুষের পিতৃ স্থানে স্থিত হন। এই অষ্টম কলার বিকাশ লইয়াই মানব জাতির আদি পুরুষগণ অসিয়াছিলেন। এই অষ্টম কলাই বৈজ্ঞানিক বিকাশ। মানুষ মাত্রই এই বৈজ্ঞানিক বিকাশসম্পন্ন মানুষের বংশধর। সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষের ভাষার বিনিময় যতদূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হইতে পারে তাহারা সকলেই বৈজ্ঞানিক বিকাশ (৮ কলা) সম্পন্ন যে কোন মানুষের (৮ কলার বিকাশ হইলে সকলেই ঋষিত্ব লাভ করেন) বংশধর। কেবল তাঁহাদেরই বংশধরগণের মধ্যে মানুষের ভাষার বিনিময় চলিবে। বানর এবং বনমানুষও সৃষ্টির কোলে মানুষের আকার বিশিষ্ট জীব, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মানুষের ভাষার বিনিময় হয় না। ভাষার বিনিময় চলে এমন যে কোন মানববংশই ঋষি-সন্তান বলিয়া জানিতে হইবে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মানুষ এবং বানর একই পিতা মাতার সন্তান কিন্তু আমরা ইহার সমর্থন করি না। মনুষের স্বরযন্ত্র এবং বানরের স্বরযন্ত্র এক রকমের নহে। একই পিতা মাতার সন্তান হইয়া মানুষ জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের পথে এতটা উন্নতি করিল, কিন্তু বানর কিছুই করিতে পরিল না ইহাতেই প্রমান হয় যে উভয়ে এক বংশের সন্তান নহে। যাহাহউক এই ৮ কলা বিকাশ সম্পন্ন মানবই

গুরু হইবার উপযুক্ত। এই ৮ কলা বৈজ্ঞানিক বিকাশ হইবার দরুণ এই ৮ কলা পুষ্ট মানব তপস্যার দ্বারা শক্তি-স্তরকেও বুঝিতে পারেন। এই ৮ কলা পুষ্ট গুরু মানুষকে শক্তি স্তরের সন্ধান দিতে পারেন। স্বর্গ্যা-স্তরের আদর্শ লইয়া যাঁহারা গুরু হন তাঁহারা মানুষকে আকর্ষণ মাত্র করিতে পারেন, কিন্তু মানুষকে পূর্ণ করিয়া গড়িয়া দিতে পারেন না।

অষ্টম হইতে পনর কলা পর্য্যন্ত জ্ঞানেরই বিকাশ। এই সব কলা পুষ্ট মহাপুরুষগণ জগতের মঙ্গলের জন্য প্রকাশ্যে কোন কর্ম্মই অবলম্বন করেন না। নির্জন বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে, লোকালয়ের অগোচরে বা মৌনাবলম্বনে ইঁহারা তপস্যার দ্বারা নিজের অন্তরস্থিত জ্ঞান-কলায় পুষ্ট হন এবং পৃথিবীতে কাহাকেও আত্মপরিচয় না দিয়া অন্তিম সমাধি লাভ করেন। ইঁহারা ব্রহ্মকোটির জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইঁহাদিগকে আমরা মহত্বের বিভূতি নাম দিতে চাই।

নবম হইতে চতুর্দ্দশ কলা পর্য্যন্ত 'অবতার-কলা' নাম হইয়াছে। মহত্বের কলা-পুষ্টগণ কর্ম্মাবলম্বন করেন না, কিন্তু অবতার কলা-পুষ্ট মানবগণ কর্ম্মাবলম্বন করেন। এই জন্য তাঁহারা 'আসুরিকতার বিরোধিতা'। অবতার সম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কারণ একদল মানুষ আছে যাহারা অবতারকে সমাজে বাঁধিয়া কর্ম্ম-পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। গণেশ, দুর্গা এবং দৈবীসম্পদসম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্ট মানব যখন বিশেষ কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন হন তখন তাঁহারা অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। মহত্বের স্তর হইতেও বহু মহাপুরুষ কর্ম্মস্তরে নামিয়া আসেন। তাঁহাদিগকেও অবতার কলাপুষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে হইবে।

অবতার পূজা লইয়া বর্ত্তমান সমাজে নানারূপ অপ্রীতি অনুষ্ঠান চলিয়াছে। অবতার পূজার লক্ষ্য নাচানাচি বা পূজার ঘটা

দেখাইয়া দোকানদারী করা নহে। আমাদের কথা—যে কোনরূপ উপায়ে গণেশাদি কেন্দ্র-শক্তিগুলি নিজের চরিত্রে মূর্ত্ত করিয়া সেরূপ কর্ম্মদ্বারা আত্মবিকাশ করিবার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ভাবের পথ সব সময়েই দুর্ব্বলতার লক্ষণ; সেইপথে চলা কোন প্রকারেই আত্ম-বিকাশের অনুকূল নহে। উহা কতকটা ভাব প্রবনতায় অন্তর্গত। কর্ম্মিগণ সেই সকল হইতে দূরেই অবস্থান করিবেন। অনেকে অবতারগণের হাঁচি কাশিটারও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রচার করিয়া বেড়ান। এরূপ প্রচার দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশের পথে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহাতে মানুষের ক্ষতিই হইয়া থাকে। নিজের চরিত্রের উপাদানের সহিত মিল না থাকিলে তাহাকেও বড় করিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করা দোকানদারীর লক্ষণ। মানুষ সর্ব্বাবস্থায় নিজ নিজ চরিত্র উন্নত কলান্বিত বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত করিবেন, সেই জন্যই গুরু, নেতা ও অবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বহু দুর্ব্বলতাকে অবলম্বন করিতে পারিলে বহু ভক্ত জুটান যায়, ভাবুকের সমাজে অবতারও হওয়া যায়। কিন্তু একটুও দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে কর্ম্মী হওয় যায় না—একথা প্রত্যেক কর্ম্মীই মনে রাখিবেন।

(গুরু-বাদ এবং অবতার-বাদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বর্ত্তমান সময় বাংলায় একটা ভীষণ কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের আত্ম-বিকাশের পথে 'শান্তি' একটা প্রয়োজনীয় আন্তর খাদ্য। এই অশান্তির যুগে বহু মানুষ দিশেহারা হইয়া দীক্ষা, সাধনা এবং উপাসনার জন্য ধাবিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে একজন ছলধর্ম্মী গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসীবেশধারী দোকানদারীর পথ খুলিয়া বসিতেছে। ইহার যে কি প্রতিকার আছে তাহা ভাবা প্রয়োজন। পূজার ঘটা, কীর্ত্তনের ঘটা এবং আরতির ঘটার মধ্যে সাময়িক সাত্ত্বিক বিলাসিতার স্বাদ যে একটুও আছে তাহা মানিতেই হইবে। সেই সাময়িক সাত্ত্বিক

নেশায় মত্ত হইয়া পতঙ্গ পালের মত শত সহস্র লোক সেই ছল দোকানদারগণের স্বার্থের অগ্নিশিখায় আত্মাহুতি দিতেছে। নেশাভঙ্গে সেই ছল অবতার গণের সমস্ত কার্য্য কলাপ জানিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব ভক্তের ধর্ম্মের নেশা চিরদিন তরে তিরোভাব হয় এবং হেমিওপ্যাথিক মতে সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ বিষ-দুষ্ট রোগীর মত এ জীবনের জন্য ধর্ম্মদ্বেষী রোগী হইয়া অত্যন্ত অশান্তিময় জীবন যাপন করে। মঠ, মন্দির ও আশ্রম গুলি যে ভাবে দোকান-দারের আড্ডায় পরিণত হইয়া চলিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে মানুষের ধর্ম্মপিপাসা যে কিরূপ ভীষণভাবে আহত হইয়া যাইবে তাহা সত্যই ভাবিবার কথা। কোথাও সত্যের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় সকলেই অন্যের নিন্দা করে এবং নিজেরাই সেই দোষ কলঙ্কিত হইয়া চলিয়াছে। যাঁহারা নিজেরা দৈবী-সম্পদের অভ্যাস করেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন। আর যাঁহারা শান্তির পথের খোঁজ চাহেন তাঁহারা দৈবী-সম্পদ-গুলি বুঝিতে চেষ্টা করেন। নিজের দৈবী-সম্পদে দৃঢ়তা না থাকিলে গুরু করিয়া লাভ নাই। নিজের জ্ঞানের পিপাসা থাকিলে কেহই বাধা দিতে পারিবে না। অন্যের দোষ দেখিয়া নিজের বেগ নষ্ট করা ঠিক হইবে না।)

আসুরিক সপদ-সম্পন্ন বিষ্ণু-কেন্দ্র-পুষ্টগণ কখনও অবতার কলায় আসিতে পারে না। ভোগ এবং মোহকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়া কিছুতেই ৭॥ কলার উপরে বিকাশ হয় না। আসুরিক-সম্পদ-সম্পন্নগণ ভোগ এবং মোহ ত্যাগ করিতে পারে না। যে কোন বিষ্ণু এবং সূর্য্য-কেন্দ্র বিকাশ-সম্পন্ন লোক যতক্ষণ শিব-কেন্দ্রস্থিত অষ্টমকলা-লক্ষণ-সম্পন্ন না হইবেন ততক্ষণ লৌকিক স্বার্থে এবং মোহে বদ্ধ হইতে পারেন; আসুরিক সম্পদও অবলম্বন করিতে পারেন। অষ্টম কলা সব সময়ই শান্তির কলা এবং বৈজ্ঞানিক কলা। (জড়

বিজ্ঞান—৫ম কলার বিকাশ)। এই অষ্টম কলায় আসিয়া যাহারা শান্তির আবরণে আত্মরক্ষা করিয়া অন্তরে পূর্ণতার দিকে চলিতে থাকেন তাঁহারা নিজকে পূর্ণতার পথে ১৫কলা পর্যান্ত বিকাশ করেন। তাঁহাদিগকে আমরা 'মহৎ'নাম দিয়াছি। কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা অষ্টম কলা পূর্ণ করিয়া নবম কলায় আসেন তাঁহারাই 'অবতার'বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। অবতারগণও অন্তরে জ্ঞানের ও শান্তির পূর্ণতা অনুভব করেন। অষ্টম কলা সকলের পক্ষেই শান্তির কলা। এই কলার বিকাশ স্থল হইয়া কর্ম্মি-গণও সাময়িকভাবে শান্তি, নির্জ্জনতা ও প্রাকৃতিক জীবনপ্রিয় হন। তবে কর্ম্মীর এঅবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় না; তাঁহারা শীঘ্রই নবম কলায় আসেন এবং বিপুল বিক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝুঁকিয়া পড়েন। এই সব কর্ম্মীই অবতার নামের যোগ্য। ঋষিগণ অষ্টম কলার বিকাশস্থল ছিলেন; তাঁহারা শান্তিকে বজায় রাখিয়া কর্ম্ম করিতেন। সে কর্ম্মের লক্ষ্য ছিল শক্তি-স্তরের আদর্শে মানব-চরিত্র গড়া এবং সমাজকে শক্তিস্তরের আদর্শ বুঝাইয়া দেওয়া। ঋষিগণ যেমন অষ্টপাশমুক্ত মানব সেইরূপ অবতারগণও অষ্টপাশমুক্ত মহা-মানব। অর্থাৎ ৭॥ কলার বিকাশ হইতে উন্নত বিকাশ হইলে অভিমানটী থাকে না। ঐ অভিমান মানুষকে স্বার্থী এবং অসুর প্রস্তুত করিতে পারে। তাই যাঁহারা খুব ভালভাবে গণেশ-কেন্দ্রপুষ্ট মানব নহেন তাঁহাদিগকে কোন প্রকারেই ভাল লোক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাঁহারা গণেশস্তরের আদর্শকে (অন্যায় বিরোধিতাকে) বজায় রাখিয়া কর্ম্মশক্তি আট কলার উপরে বৃদ্ধি করেন তাঁহারা নিজেদের কর্ম্মশক্তি দশ কলা পর্য্যন্ত বিকাশ করিতে পারেন। অর্থাৎ (৫ × ২ = ১০) ৫ কলারই দ্বিগুন কলা বুঝিতে হইবে। যাঁহারা (দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন হইয়া) বিষ্ণু-স্তরের আদর্শকে (সমাজ রক্ষা) বজায় রাখিয়া কর্ম্মশক্তি ৮ কলার উপরে বিকাশ করিতে পারেন তাঁহারা (৭ × ২ = ১৪) ১৪ কলা পর্য্যন্ত বিকাশস্থল হইতে পারেন। সূর্য্যকেন্দ্রপুষ্ট অবতার অহিংসা প্রধান প্রচার অস্ত্র

লইয়া অগ্রসর হন ; তাঁহারা জগৎগুরুর স্তরেই চলিয়া যান। তাঁহাদিগকে অবতারের মধ্যে না ধরিলেই বোধ হয় ভাল হয়। গণেশ-কেন্দ্র-আদর্শকে ধরিয়া রাখিয়া নবম এবং দশম কলাপুষ্ট অবতারগণ গণেশ-শক্তি সমন্বিত অবতার হইয়া থাকেন। এইরূপে বিষ্ণু-কেন্দ্র-শক্তির বিশেষত্বকে অবলম্বন করিয়া নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ কলার বৃদ্ধি করা যায়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন বীরপুরুষগণই বিষ্ণুঃ অবতার বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। যাঁহারা প্রথম অবধি বা যে কোন সময় শক্তিস্তরের কর্ম্মাদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহারা পূর্ণ মানবের স্তরে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিবেন। ঋষিগণ শক্তিস্তরকে বুঝিতে পারেন, তাই তাঁহারা শক্তিস্তরের কর্ম্মাদর্শে মানুষ মাত্রকেই গঠন করিয়া দিতে পারেন বা সেইরূপ চেষ্টা করেন।

পূর্ণ মানবের বিভূতি ষোড়শ হইতে ত্রিংশ বা অনন্ত কলার বিকাশ বলিয়া জানিতে হইবে, ইঁহারা অবতারগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। গণেশ-কেন্দ্রের আদর্শকে ধরিয়া রাখিয়া দশ কলার অধিক বিকাশ হয় না, আবার বিষ্ণুকেন্দ্র আদর্শকে ধরিয়া রাখিয়াও ১৪ কলার বেশী বিকাশ হয় না ; কিন্তু পূর্ণ শক্তির আদর্শ গ্রহণ করিয়া ভোগ-কলা, কর্ম্ম-কলা এবং জ্ঞান-কলা তিনই যুগপৎ বিকশিত হইতে পারে। মানুষ পূর্ণকলায় আসিলে আত্মস্বরূপতা লাভ করেন ; তখন তিনি পূর্ণকর্ম্মী ও পূর্ণজ্ঞানী হইয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে এ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে। শক্তির ধ্যানের প্রত্যেকটী কর্ম্মলক্ষণ এবং অনুভূতি সেই সব পুরুষে বিদ্যমান থাকিবে। ইহাই আত্মস্বরূপের কেন্দ্রস্থল। সুতরাং এমন যে মানব তিনি সকল জীবের আত্মস্বরূপ হইয়াই অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ মহামানব বলিয়া আর্য্যঋষিগণ মানিয়া লইয়াছিলেন। গীতার যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ এই স্তরের কর্ম্মলক্ষণের বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়াই অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। এখনকার দিনের দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ

বুঝিতেই পারিবে না ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আদি প্রত্যক্ষ গুরুগণের বিরুদ্ধে অর্জ্জুনের মত চরিত্রবান পুরুষ কেমন করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে বধও করিয়াছিলেন। লৌকিক দৃষ্টিতে সেই যুদ্ধের ফল কিরূপ কারুণিক হইয়াছিল সে কথা মহাভারতের নারীপর্ব্বে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। অর্জ্জুন সেই কারুণিক দৃশ্যের পূর্ব্ব সূচনা যুদ্ধের প্রারম্ভেই দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য সমর্থন করেন নাই। যাঁহারা ভক্তিপথের একটু আধটু ভাবের নেশাকে অবলম্বন করিয়া এখনও নিষ্কাম কর্ম্মের সূত্রপাত করিতে চাহেন তাঁহারা যেন ভাবিয়া দেখেন তাঁহাদের ভুল কত গভীর। ভক্তি মানুষকে ষষ্ঠ কলা বিকাশের কেন্দ্রে মাত্র আনিতে পারে। তাহা কোন যুগেই আসুরিক কলার গোলামীকে অস্বীকার করিবার শক্তি আনিতে পারিবে না। এই সব দুর্ব্বল সাধনার পথে প্রবেশ করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ গুরুর দুর্ব্বলতার সমর্থক হইয়া আত্মবিকাশের পথে বামন হইয়া শেষকালে ভাবের দুর্ব্বলতার নকল করিয়া মানব সমাজকে কর্ম্মলক্ষ্যে পঙ্গু করিতে থাকে। শিষ্য যে কোন প্রশ্ন করে তাহার জবাবে ঐ স্তরের গুরুগণ চক্ষুদুটি একটু ঢুলুঢুলু করিয়া শিক্ষা দেন "ঠাকুর এই কথা বলিতেন——"। যাহা হউক পূর্ণ মানবের স্তরে যাঁহারা যাইবেন তাঁহারা একথা জানিয়া রাখুন কোন প্রকার দুর্ব্বলতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া পূর্ণ হওয়া যায় না। নিজের কর্ম্মপথে সমস্ত জীবের আত্মকেন্দ্রে যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনিই "ত্রিদশ গণাবৃতাং" জানিতে হইবে।

(এখানে পূর্ণতার পথের পথিকগণকে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন। পূর্ণ মানব বলিয়া যে কেহ আত্ম-পরিচয় দিতে পারেন এবং পূর্ণ-মানব বলিয়া অনেকে যে কোন মানুষকে পরিচয় করাইয়াও দিতে পারেন তাঁহাদের পিছনে পঙ্গপালের মত ঝুঁকিয়া পড়িবার কোনই প্রয়োজন নাই। যিনি

নিজের জন্য এবং জগতের মঙ্গলের জন্য প্রত্যক্ষে কিছু করিয়া যান নাই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে অবতার সাজাইয়া নিজেকে বড় দোকানদার সাজান যাইতে পারে, কিন্তু জগতের মঙ্গল তাহাতে খুবই কম হইয়া থাকে। নানা প্রকার শিক্ষা এবং সংস্কার দ্বারা আমরা মানুষের মনোবৃত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেই। পরবর্ত্তী যুগে স্বার্থপরগণ মানুষের সেই দুর্ব্বলতাটুকুর নকল অবলম্বন করিয়া নিজের চরিত্র গড়ে অথবা কোন সাধু বা গুরুকে সেই দুর্ব্বলতার আড়ালে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার জীবন চরিত প্রকাশ করে। সরল মানুষ নিজের বিচারশক্তির অভাবে সেই সব অলৌকিক কল্পিত কাহিনী জানিয়া আত্ম-লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া ভ্রান্ত সংস্কারের পশ্চাদগামী হয় এবং নিজের ও সমাজের সর্ব্বনাশ করে। দু'চারটা অলৌকিক কল্পনার উপাদানে বর্ত্তমান সময় বহু জীবন নাটক অঙ্কিত হইয়া ধর্ম্মের নামে দোকানদারী চলিয়াছে। যাঁহারা পূর্ণতার পথে যাইবেন তাঁহারা সে সব মিথ্যা কল্পনার নেশায় মত্ত না হইয়া বিবেকের নির্দ্দেশ লইয়া পথ ধরিবেন। যাঁহারা গুরুকে খুব বড় যোগসিদ্ধ বলিয়া জাহির করিবার জন্য আকাশ-গমন, পাতাল-ভ্রমণ, সমুদ্র-ভক্ষণ, ট্রেণ-স্তম্ভন ও পরলোক দর্শনের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া বিজ্ঞাপন করিয়া বেড়ায় সে সব এজেন্টগণকে তত্তৎ শক্তিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। গুরুর অলৌকিক শক্তি তাহাদের মধ্যে কতটা আসিয়াছে তাহা জানিয়া তাহারই নিকট সে শক্তি শিক্ষা করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। তবেই এই এজেন্টগণের চালাকী ধরা পড়িবে। গুরু আকাশ-ভ্রমণ করেন তাহাতে তোমার কি হইল? তুমি আকাশ-ভ্রমণ করিতে পার ত দেখাও! যাহার প্রয়োজন হইবে সে তোমারই নিকট শিক্ষা করিবে। আমাদের কথা কর্ম্মশক্তির বিকাশ কতটা হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। বুজরুকি দ্বারা আত্ম-বিকাশের পথ সঙ্কোচ হয় ইহা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেকেই নিজের জীবনেই অনেক বিস্ময়কর ঘটনার

সমাবেশ দেখিতে পারেন, কিন্তু সে সব পূর্ণতার লক্ষণ নহে। ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রস্থিত শক্তি-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া সকলেই পূর্ণ হইতে চেষ্টা করিবেন। শিবকেন্দ্রস্থিত প্রাকৃতিক জীবনের উপর নবম কলা হইতে পূর্ণ কলার বিকাশ হইয়া থাকে। সে শক্তি ও আদর্শ আজ বহুদিন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বুদ্ধির কৌশল, কর্ম্মের কৌশল, ধৈর্য্য, বীরত্ব, দৃঢ়তা, অন্যায় বিরোধিতা, আসুরিক বিরোধিতা, মোহহীনতা, কামহীনতা, ত্যাগ, দান, সরলতা, সংগঠনী শক্তি, মানুষ চিনিবার শক্তি, নির্ভি · গাম্ভীর্য্য, নিরভিমানতা প্রভৃতির বিকাশ দ্বারা মানুষ চিনিবে এবং এই সব উপাদানে নিজের চরিত্র গঠন করিবে। এই সব উপাদান চরিত্রে না থাকিলে অলৌকিক কোন শক্তিই মানুষকে সুখী এবং উন্নত করিতে পারে না। চরিত্রবল প্রথম, পরে অন্য কথা।

সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ = সিদ্ধিকামিগণ এই শক্তির সেবা করেন।

আত্মবিকাশের পূর্ণতম কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা বা সাধনার সিদ্ধিই সিদ্ধি বলিয়া জানিতে হইবে। কেহই অল্পে তুষ্ট থাকিও না, তবেই সিদ্ধিকামী হইতে পারিবে। অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক জীবই আত্মবিকাশের পথে চলিয়াছে। মানুষ যতক্ষণ আত্মবিকাশের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না ততক্ষণ শূদ্র (ক্ষুদ্র) পদবাচ্য। আত্ম-বিকাশের পথেই মানুষ চলিয়াছে। যতক্ষণ মানুষ তাহা না বুঝে। ততক্ষণ মানুষের বিকাশের পথ সহজ হয় না। তাই মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য আত্মবিকাশের দায়ীত্ব বুঝিয়া দেখিয়া দেখিয়া সে পথে পা ফেলা। মানবেতর অন্যান্য জীব আত্মবিকাশের পথে প্রকৃতির অধীন হইয়া চলিয়াছে। মানুষ মোহবশে আসুরিকতাকে অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে; তাহা না হইলে মানুষের ক্রম-বিকাশের পথও রুদ্ধ হয় না। আসুরিকতার বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তি প্রয়োগের আদর্শ যতক্ষণ মানুষ গ্রহণ না করে ততক্ষণ মানুষ শক্তি-স্তরে আসিতে পারে না।

গণেশ-কেন্দ্র-শক্তি মানুষকে ক্রমবিকাশে সাহায্য করে। এইজন্য গণেশ-ধ্যানে 'সিদ্ধি' শব্দের প্রয়োগ আছে। বাস্তবিক গণেশ-শক্তিই একটু একটু করিয়া উন্নত বিকাশে পৌঁছাইয়া দেয়। তাই গণেশ-ধ্যানে গণেশকে 'সিদ্ধিপ্রদং' বলিয়া উল্লেখ আছে। জ্ঞানী বা কর্ম্মী উভয়েই গণেশ-কেন্দ্রকে সর্ব্বদা জীবন্ত রাখিবেন। বিবেকই গণেশ; একথা বহুস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। মনোময় কোষস্থিত যে কোন অনুভূতিকে গণেশ-কেন্দ্রস্থিত অনুভূতির আলোতে ঢাকিয়া দেওয়া যায়; গণেশ-কেন্দ্রস্থিত অনুভূতি এমনই শক্তিশালী অনুভূতি। এদিকে কর্ম্মপথেও গণেশ-কেন্দ্র এমনি শক্তিশালী যে বিবেক যে কোন অন্যায় কর্ম্মবেগকে নিয়মিত করিয়া দিতে পারে। যাঁহারা আর্য্যগণের পুরাণাদি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় জানিয়াছেন যে গণেশই শক্তি বা দুর্গার প্রিয় পুত্র; সুতরাং যাঁহারা শক্তি-স্তরের কর্ম্ম-বিজ্ঞানকে পৃথিবীতে স্থাপন করিবার পক্ষপাতি তাঁহারা গণেশকে নিশ্চয়ই প্রিয় করিয়া লইবেন।

এখন কথা হইতে পারে বিবেকের কেন্দ্রকে কি করিয়া শক্তিশালী করা যায়? বিবেকের কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা খুবই সহজ। যে কোন বিচারে আমরা নিযুক্ত হই আমাদের অন্তঃকরণের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রগুলি সেই সময় আপন আপন উপাদানগুলি আমাদের চিন্তার সম্মুখে প্রেরণ করে। আমরা যে কেন্দ্র-শক্তির প্রভাবে কাজ করি আমাদের অন্তঃকরণস্থিত সেই কেন্দ্র-শক্তিই প্রবল হইয়া যায়। অন্তঃকরণের সূর্য্য-শক্তি আমাদিগকে প্রেম, ভালবাসা বা ভাবপ্রবনতার দিকে আকর্ষণ করে। বিষ্ণু-কেন্দ্র স্বার্থ এবং মোহের কথা ভাবায়। গণেশ ত্যাগ এবং পক্ষপাতিত্বহীন বিচার-বেগ প্রদান করে। আমরা যাঁহার প্রভাবে কাজ করি অন্তঃকরণে সেই প্রভাবই শক্তিশালী হয়। বিবেকের কথা দুই চারিবার মানিবার পর বিবেক বিশেষ শক্তিশালী হইয়া দাঁড়ায়।

বিবেককে এই ভাবেই শক্তিশালী করিতে হয়। যাঁহারা বিবেকের নির্দ্দেশমত পথ ধরিতে ইচ্ছুক তাঁহারা শারীরিক শক্তিকে বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল হইবেন। শরীর রক্ষা (অন্ন বা আর্থিক) ব্যাপারও স্বাধীন হইতে না পারিলে বিবেক শক্তিশালী হইবে না। শরীরের যথেষ্ট শক্তি না থাকিলে বিবেকের বেগকে ধারণ করিবার শক্তির অভাবে শরীর দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। বিবেকের নির্দ্দেশ মানিতে গিয়া কেহ ভাবপ্রবন এবং উচ্ছৃঙ্খল হইবেন না। নিজের প্রয়োজনকে পূর্ণ করিবার জন্য অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই অসতের অধীন হইতে হয়। লক্ষ্য ঠিক থাকিলে আদর্শের সামান্য ইতরবিশেষে কিছু আসে যায় না। লক্ষ্য পূর্ণবিকাশ ইহা যেন মনে থাকে। বিষ্ণু-কেন্দ্রশক্তি বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিষ্ণু-কেন্দ্রস্থিত স্বার্থকে ত্যাগ করিয়া সমস্তগুলি বিষ্ণু-চরিত্র আয়ত্ব করা প্রয়োজন। কৌশলে যত কাজ হয় যুদ্ধে তত কাজ হয় না। সুতরাং চতুরতার প্রয়োজন আছে।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ ইহাদিগকে 'চতুর্বর্গ সিদ্ধি' বলা হইয়াছে। শক্তি-স্তরের বিকাশে এই চতুর্বর্গ সিদ্ধি আসিয়া যায়। এখানে ধর্ম্ম অর্থে শিব-স্তরের অনুভূতি এবং সরল প্রাকৃতিক জীবন বুঝিতে হইবে। 'অর্থ' বলিতে বিষ্ণু-কেন্দ্রস্থিত ধন, সংগঠন, ভূমি, পশু, অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতিকে জানিতে হইবে। 'কাম' অর্থে—স্ত্রী (স্ত্রী হইলে পুরুষ). ইহা মনের কেন্দ্রস্থিত ভোগের উপকরণ। 'মোক্ষ' বলিতে অব্যক্ত তত্ত্বের অনুভূতি, যাহা শক্তির ধ্যানে 'ইন্দুরেখা' অংশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সিদ্ধি চতুষ্টয় মানুষ মাত্রেরই অন্তরের স্বাভাবিক কাম্য বস্তু। একটু অন্তর লক্ষ্যের সহিত নিজের অন্তরকে বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেকেই ইহাদের প্রত্যেকটীর প্রয়োজন বুঝিতে পারিবেন।

ভাবের সাময়িক বন্যা এবং ত্যাগের সাময়িক উত্তেজনায় অধৈর্য্য

হইয়া সাধকগণ রাতারাতি অবতার হইয়া চেলা করিবার ফন্দি আঁটিবার জন্য যা তা প্রচার করা আরম্ভ করিও না, কিছু দিন অপেক্ষা কর, নিজের অন্তরকে দেখ; দেখিতে পাইবে তোমার ভোগের প্রয়োজন আছে। তোমার অন্তরে তাহার চাওয়ার বেগ আছে; সে বেগ তোমাকে সময় সময় অধৈর্য্য করিয়াও দিতেছে। যতক্ষণ তন্মাত্র-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না ততক্ষণ ভোগের বীজ ধ্বংশ হয় না। শক্তি-স্তরে আসিয়া ইচ্ছা করিলে ভোগও গ্রহণ করা চলে কিন্তু মোহ এস্তরে একেবারেই থাকে না, অষ্টপাশের বন্ধনও (অভিমান) থাকে না। এরূপ মানুষ নাই বলিলেই চলে। যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ অর্থেরও প্রয়োজন। অর্থ, বস্ত্র, গৃহ এবং বান্ধবহীন হইয়া তুমি শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না। (যাঁহারা ব্রহ্মকোটীর লক্ষণসম্পন্ন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহাদের এসব ভাবনা নাই। সে সব মহাপুরুষ কোন কর্ম্মের অবলম্বনও করেন না)। সুতরাং "ত্যাগ ত্যাগ" করিয়া চিৎকার করিলে চলিবে না। তোমার আত্ম-বিকাশের পথে প্রয়োজনীয় শরীর যাত্রার অবলম্বন চাই। "ঈশ্বর দিবেন", "ঈশ্বর পৌঁছান" ইত্যাদি বড় বড় কথা বলিবার পূর্ব্বে নির্ভরতার সাধনা কতটা হইয়াছে তাহা মনে মনে বিচার করিয়া লইবে। 'ধর্ম্ম' অন্তঃকরণের শান্তির পুষ্টিকে বলা হইয়াছে। সুষুপ্তিতে আমরা স্বভাবতঃই এই কেন্দ্রে আসিয়া থাকি। উপাসনার দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় আমরা ইহার সম্মুখীন হইতে পারি। উপাসনার সঙ্গে মন্ত্র এবং জলের সম্বন্ধ যত বেশী হয় শান্তি তত শীঘ্র জমিয়া যায়। মন্দির (মসজিদ্ গীর্জ্জা ইত্যাদি), নদীতট বা কোন শান্তচিত্ত প্রেমী সাধুর নিকট বসিয়া সন্ধ্যা বা উপাসনা করিলে বেশী ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা একটু উন্নতস্তরে আসিয়া গিয়াছেন তাঁহারা নির্জ্জন স্থানে উপসনা করিবেন। ধর্ম্মে অবজ্ঞা করিয়া বা নাস্তিক হইয়া কেহই শান্তিলাভ করিতে পারে না।

যাঁহারা যোগের বিশেষ অঙ্গাদির অনুশীলন করেন তাঁহারাও মহাপুরুষ প্রদর্শিত উপাসনা বিধি অবলম্বনে সন্ধ্যাদি উপাসনা সম্পন্ন করিবেন। অনেকে মনগড়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বলা প্রয়োজন উহাতে শান্তি মোটেই পাওয়া যায় না। উপাসনার বিধি লইয়া সমালোচনা করা কর্ত্তব্য নহে। উহাতে বহুলোকের শান্তির প্রাপ্তিতে হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে। যেমন অন্যে খাইলে নিজের পেট ভরে না সেইরূপ উপাসনা অন্যের দ্বারা করাইলে নিজের শান্তিলাভ হয় না। বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা এবং তান্ত্রিক পূজা শান্তিলাভ করিবার অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক পন্থা। যাঁহারা ভক্তিপথের অনুশীলন করেন তাঁহারাও সন্ধ্যা-কর্ত্তব্য শেষ করিয়া 'নামকীর্ত্তনাদি' করিবেন। যাঁহারা জপাদির অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাও 'সন্ধ্যা-কর্ত্তব্য' শেষ করিয়া তাহা করিবেন। দেখিবেন সকলেই আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। যাঁহারা দু'চারটা ভাবের কথা শিখিয়া গুরুগিরি এবং মোড়লীগিরি করেন তাঁহারাও সন্ধ্যা-কর্ত্তব্য যথানিয়মে করিবেন। যাঁহারা দেশের এবং দশের নেতা তাঁহারা ইহা করিলে একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের বিচার শক্তি দিন দিন কেমন তীক্ষ্ণ এবং নির্ম্মল হইতেছে। উপাসনা পথে নিজের কল্পনা মত সাধনা সাধককে পতিত করে। সুতরাং কেহই শাস্ত্রোক্ত উপাসনা বিধির উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। উপাসনা মার্গে মানুষকে সবদিনই গুরু এবং শাস্ত্রের শরণ লইয়া চলিতে হয়। অনেকে উপাসনার মধ্যেও জন্মগত ভাগ বাঁটোয়ারা বসাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এমন মনোবৃত্তিপন্ন গুরুর অধীন হইয়া আত্মোন্নতি মোটেই সহজ নহে। সাধনার সুরুতেই শিষ্য শ্রবণ করিবে "আমিই আত্মা।" আত্মা আবরণহীন। সাধনার দ্বারা শিষ্য একদিন সেই অবস্থাই লাভ করিবে। শ্রবণের দিন যদি তাহাকে ক্ষুদ্র আবরণের মধ্যে আবদ্ধ করা হয় তবে সে সাধনার দ্বারা কি লাভ করিবে?

উপাসনার পথে যাঁহারা বেশী গভীরভাবে প্রবেশ করিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই গুরুর শরণ লইবেন। গুরুসেবায় অবহেলা করিয়া গুরুর জ্ঞানরাশী আকর্ষণ করা যায় না। গুরুর অজ্ঞানরাশীও অনুগত শিষ্যে প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং শিষ্য খুব সাবধানে সেইসব অজ্ঞানরাশী অতিক্রম করিবেন। সাধনায়, সত্যে ও ত্যাগে নিষ্ঠা থাকিলে সে সব অতিক্রম করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নহে।

নিজ নিজ ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট উপাসনা বিধি শাস্ত্রের নির্দ্দেশমত যথা নিয়মে সম্পন্ন করিবেন। মন্ত্র এবং জলের প্রয়োগ যথাযথভাবে হওয়া আবশ্যক। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে জলের সুবিধা না হইলে মনে মনে সেইসব কাজগুলি শুধু মন্ত্রাবলম্বনে করিবেন; অথবা ধ্যানাবলম্বনে বীজমন্ত্র বা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবেন। জপকালে সেই জপজনিত সুখটুকু (অন্য সব কথা ভুলিয়া যাইয়া) ভোগ করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাতে নিশ্চয়ই শান্তি পাইবেন। অনেক নবীন গুরু উপাসনাকে এখন টানিয়া হিঁচড়াইয়া ভাবের লহরের মধ্যে ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা শান্তির খোঁজে অগ্রসর হইতে চাহেন তাঁহারা ঐসব 'আহা, উহু এবং নাচা কাঁদা' হইতে দূরে থাকিবেন। গুরুর কাজ মানুষকে পূর্ণতার পথে আকর্ষণ করা, ভাবের পথে নহে। ভাবের কেন্দ্রকে পুষ্ট করিবার জন্য স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং উপন্যাসই যথেষ্ট; দেশের সাহিত্যিকগণের (সূর্য্যাস্তরের গুরুগণের) কৃপায় তাহার আর অভাব নাই। শান্তির পথে ভাবের কেন্দ্র আপনিই পুষ্টিলাভ করিবে, সেইজন্য আর বেশী চেষ্টার প্রয়োজন নাই। খুব শান্ত এবং নিবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যা পূজাদি শেষ করিয়া নামকীর্ত্তন বা স্তোত্র পাঠের সময় দেখিবেন স্বভাবতঃই ভাবের আবেশ আসিয়া গিয়াছে। নকল ভাব হইতে তাহার মাধুর্য্য লক্ষগুণ অধিক শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে। সেই কীর্ত্তনে আকাশ, বাতাস এবং বৃক্ষাদিও অমৃতের

স্পর্শ পায়, শান্তি লাভ করে। আর বৃথা ভাবের ঢংএ সময় বৃথা নষ্ট হয়। তাহাতে সমাজের বহুলোকের শান্তির বিঘ্ন হইয়া থাকে।

(আমরা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক যুবককে জলসহ অন্ততঃ একটী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃকরণের শান্তির কেন্দ্র অতি সুন্দরভাবে পুষ্ট হয়। এই শান্তির সংযোগে মানুষ প্রতি সন্ধ্যায়ই নবীন জীবন লাভ করে। নিদ্রার পর যেমন আমরা নূতন কর্ম্ম-শক্তি লাভ করি সেইরূপ উপাসনার দ্বারা আমরা আমাদের অন্তরস্থিত নূতন শক্তির সম্মুখীন হই। আমাদের অন্তঃকরণের ময়লারাশি শান্তির সংযোগে ধুইয়া পুঁছিয়া যায়। ইহাতে রোগ, শোক, আলস্য, দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা নষ্ট হয়। একটু ধীরভাবে ইহা করিবার অভ্যাস করিলে প্রত্যক্ষে ইহার সুফল পাওয়া যায়। বৈদিক বা তান্ত্রিক সন্ধ্যার অভ্যাস করিতে হয়। উপনয়ন বা দীক্ষা গ্রহণ করিলে ইহাতে প্রবেশের অধিকার হয় একথা সত্য, তবুও আমরা একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি উপনয়ন বা দীক্ষাগ্রহণের সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্তও ইহার অভ্যাসে কোন পাপ স্পর্শ করে না। সাধক-সমাজে পাঁচটী সন্ধ্যার প্রচলন আছে। সময়ের প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া পাঁচ প্রকারের সন্ধ্যার ব্যবস্থা হইয়াছে। সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্রি এবং ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের প্রারম্ভ পাঁচটী সন্ধ্যার নির্দ্দিষ্ট কাল। বিস্তারিত এই পুস্তকে আলোচনা হইবে না।)

এখন 'মোক্ষ' সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা বলিতেছি। উপাসনার দ্বারা অন্তঃকরণের পুষ্টি বর্দ্ধন হয়। ইহা একপ্রকার টনিকের মত। অন্তঃকরণ বেশ পুষ্ট না হইলে উপলব্ধির শক্তি হয় না। উপলব্ধিই যে 'মোক্ষ' একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এজন্য যাঁহারা মোক্ষপথে অগ্রসর হইবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সন্ধ্যোপাসনা ও জপ অত্যন্ত আদরের

সহিত সম্পন্ন করিবেন। উপলব্ধি বা অনুভূতিই 'মোক্ষ'। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তি-স্তরের অনুভূতির কথা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। যেমন যেমন উন্নত-স্তরের অনুভূতি আসিতে থাকে তেমন তেমন নিম্নস্তরের দুর্ব্বলতা ও চিন্তার বেগ হইতে সাধক মুক্তিলাভ করিতে থাকেন। এই ভাবেই সাধক ধীরে ধীরে অব্যক্ত-স্তর পর্য্যন্ত অনুভব করিবেন। অব্যক্ত-স্তরের অনুভূতি আসিলে সাধকমাত্রই গীতানির্দ্দিষ্ট ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেন, একথা গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে। অব্যক্ত-স্তরের অনুভূতি মোক্ষের শেষ স্তর। যে কোন বাহ্য বা আন্তরবিষয়ের সংযোগে আমাদের অন্তরস্থিত সবগুলি কেন্দ্রই স্পান্দিত হয়। আমাদের আত্ম-বুদ্ধি যখন যে কেন্দ্রে বিশেষভাবে অবস্থান করে তখন সেই স্পন্দন সেই কেন্দ্রে বিশেষ ক্রিয়া উৎপন্ন করে। অন্যান্য কেন্দ্রে উৎপন্ন ক্রিয়া (স্পন্দন) আমরা ততটা অনুভব করি না, যতটা আত্ম-বুদ্ধি-সংযুক্ত-কেন্দ্রে অনুভূত হইয়া থাকে। সেই সুখদ স্পন্দনই 'অনুভূতি' নামে খ্যাত। সেই স্পন্দনের রূপ আছে বা রং আছে। আন্তরদৃষ্টিতে তাহা দেখা যায় এবং আন্তরপ্রাণে তাহা ভোগ করাও যায়। সেই সুখদ অনুভূতিকে বেশীক্ষণ স্থায়ী করিবার অভ্যাস করিতে হয়। গীতায় অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের কথা উল্লেখ আছে। এই স্পন্দন-সুখ-স্মৃতি বৃদ্ধির অভ্যাসই 'অভ্যাস' এবং তদ্ভিন্ন বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণ-ত্যাগই 'বৈরাগ্য' নামে খ্যাত। যাঁহারা সমাধির অভ্যাস করেন তাঁহারা এই স্পন্দন বা অনুভূতিকে বেশীক্ষণ স্থায়ী করিয়াই সে সুখে আত্মহারা হন, ইহাই 'সমাধি' বলিয়া খ্যাত। যাহা হউক অধিকক্ষণ স্থায়ী করিবার পর সেই অনুভূতিটী সাধকের খুব সহজ হইয়া যায়। তখন সেই কেন্দ্রই সাধকের স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়; অথবা সেই কেন্দ্র সাধকের এতটা আয়ত্ব

হইয়া যায় সে ইচ্ছামাত্রেই সেই কেন্দ্রের প্রবাহে আত্মহারা হইতে পারেন। প্রত্যেকটী কেন্দ্রেই অনুভূতির সঙ্গে কতকগুলি দুর্ব্বলতাও থাকে। সাধকের চরিত্রে ক্রমে সেই কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতাগুলি বিকশিত হইতে থাকে। ক্রমে অনুভূতির মধ্যেও সেই কেন্দ্রস্থিত দুর্ব্বলতাগুলি সাধক স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। তখন তাঁহার নিকট সেই কেন্দ্র আর শান্তিপ্রদ বা তৃপ্তিপ্রদ থাকে না। তাই সাধক আরও গভীর শান্তির খোজে আত্ম-নিয়োগ করিতে বাধ্য হন। এইভাবেই উপলব্ধির গভীরতা সাধকে আসিতে থাকে। ক্রমে সাধক উপলব্ধির শেষস্তরে অব্যক্ত কেন্দ্রে আসিয়া যান। উপলব্ধির উন্নত অবস্থা আসার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের আচার, বিচার এবং স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অব্যক্ত-স্তরের অনুভূতির পর কোন কোন সাধক নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। কর্ম্ম পথে তাঁহারা আর ফিরেন না। ইঁহারাই ব্রহ্মকোটির জীবন্মুক্ত 'মহাপুরুষ' বলিয়া খ্যাত। যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত তপঃ-শক্তির বলে গণেশ কেন্দ্রের অনুভূতির পর সোজাসুজি শিবের কেন্দ্রে শান্তির অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন তাঁহারাই এরূপ অবস্থা লাভ করেন। (কেহ যেন ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের নকল করিয়া এরূপ ভাব অবলম্বন না করেন। এ সব নকল করিয়া আয়ত্ব করা যায় না, তাহাতে নিজের আত্মোন্নতির বিশেস বিঘ্ন আসিয়া যাইবে)। যাঁহারা বিষ্ণুকেন্দ্রের অনুভূতির পথে শিবস্তরে অসিয়া পরে অব্যক্তের অনুভূতিতে আসেন তাঁহারা পুরুষোত্তম বা ঈশ্বরত্বের স্তরে অবস্থিত থাকিয়া কর্ম্মাবলম্বন করেন। এরূপ মহাপুরুষগণের অব্যক্তের পূর্ণ উপলব্ধির পূর্ব্বেই সমাধি ভঙ্গ হয় এবং শক্তিস্তরের কর্ম্মীর আদর্শে স্বভাবতঃই জগৎ মঙ্গলকর কর্ম্মাবলম্বন করেন। ইহা চির কর্ম্মময় স্তর; এখানে কর্ম্মের শ্রান্তি নাই; কর্ম্মজনিত সুখ দুঃখ নাই। ইহা এমন একটী স্তর যেখানে বিশ্বের স্থূল উপাদান এবং আমাদের অন্তরস্থিত ইচ্ছাশক্তি, কর্ম্মশক্তি এবং

জ্ঞানশক্তি একই শক্তিরূপে অবস্থিত আছে পাঠকগণ মন্ত্রশক্তি আলোচনায় যোগদান করিয়া এসম্বন্ধে আরও স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ভোগে ইচ্ছাশক্তি, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণুকেন্দ্রে ক্রিয়াশক্তি এবং শিবস্তরে জ্ঞানশক্তির বিকাশ। বিকাশ সম্বন্ধেই সেখানে বলা হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সেখানে কিছু বলা হয় নাই। যাহা হউক অনুভূতিতে ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তি, এবং বিশ্বের স্থূল উপাদানকে আমরা এই স্তরে একই শক্তি রূপে পাই-তেছি। বিজ্ঞানময় কোষের আলোচনায় আমরা ক্ষিতি আদি পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম অবস্থাগুলিকে আমরা বিভিন্ন প্রকারে বোধরূপেই পাইয়াছি। সেগুলি যে বিভিন্ন প্রকার শব্দের (নাদের) রূপ তাহাও বলা হইয়াছে। শক্তির স্বরূপে স্থিত হইয়া আমরা সমস্ত বাহ্যিক এবং আন্তর উপাদানকে একই শক্তিরূপে পাইতেছি। মন্ত্রশক্তি অংশ পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে চেষ্টা করুন। ইহা মোক্ষের উপরের স্তরের কথা। মোক্ষ এই স্তরেরই আশ্রয়ে অবস্থিত অব্যক্তস্তরের অনুভূতি।

শক্তিস্তরে দাঁড়াইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সামঞ্জস্য ক্ষেত্র পাওয়া যায়। এই জন্য প্রত্যেকটী শক্তি-মন্ত্রের প্রয়োগে ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের বিনিয়োগ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। মানব সমাজে ইহাদের সামঞ্জস্য না থাকিলে মানুষের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই শুধু কামই মানুষের কাম্য নহে, শুধু অর্থ মানুষের লক্ষ্য হইতে পারে না শুধু ধর্ম্ম লইয়া অবস্থান করিলেও চলিবে না; ধর্ম্ম অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চারই চাই। শক্তি ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্রের প্রয়োগে এই উদরতা কিছু নাই। এই চারিটিকেই পুরুষার্থ চতুষ্টয় বলা হইয়াছে। পুরু

বা পুরুষোত্তম শক্তিস্তরকেই জানিতে হইবে। ইহাই দুর্ব্বলতাহীন পূর্ণ কর্ম্মীর স্তর। কর্ম্ম করাই পুরুষের লক্ষণ। যে কর্ম্মকুশলতা জানে সেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ করিতে পারে। অলস বা ভাগ্যবাদী ইহা পায় না।

বর্ত্তমান সময় অর্থশক্তির যুগ; সুতরাং বহু কর্ম্মী অর্থের দিকে বিশেষ নজর ফিরাইয়া দিবেন। অর্থদ্বারা জগতের আত্মবিকাশে সাহায্য করিবার লোক যদি না থাকে তবে আত্মবিকাশের পথ বিশেষভাবে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। নিজকে সমৃদ্ধিশালী করিবার লক্ষ্য যেমন থাকিবে তেমনিই সেই অর্থ মানুষের আত্ম-বিকাশে সাহার্য্যার্থ ব্যয় করিবার মনোবৃত্তি না থাকিলে নিজেরও আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কৃপণের আত্মবিকাশ কোথায় শরীরযাত্রাকে পরিচালনা করার জন্যও অর্থের প্রয়োজন। আমরা? এমন বহু কর্ম্মী দেখিতে চাই যাঁহারা নিজের শরীর রক্ষার মত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বাকী সময়টা জগৎমঙ্গলকর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে পারেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না রাখিতে পারিলে নিজের চিন্তাশক্তি ধর্ম্মের নামে জড়ত্বের বিকাশ-ক্ষেত্র হইয়া যায়; উহা শূদ্রত্বেরই লক্ষণ। যাঁহারা সাধনার পথে অগ্রসর হইতে চাহেন তাঁহারাও শরীর রক্ষার মত উপার্জ্জনক্ষম হইতে চেষ্টা করিবেন। চাঁদাবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রায়ই এমন মনোবৃত্তি হইতে দেখা যায় যাহাতে অন্যোন্নতি খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অনাথ হইয়া জগন্নাথ (পুরুষোত্তম) হওয়ার সাধ নিতান্তই অস্বাভাবিক। সাধকই একদিন জগৎগুরুর আসন লাভ করেন। যাঁহাদের প্রকৃতই জ্ঞানের পিপাসা জাগিয়াছে তাঁহারাই ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজের লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিবেন। অন্যের জন্য এই বৃত্তি হানিকর।

কাম, কামনা ও ইচ্ছা একই কথা। যৌন সম্বন্ধে কামনাই 'কাম' নামে খ্যাত। পূর্ব্বে বহুস্থানে ইহাকেই ইচ্ছাশক্তির স্বরূপ বলা হইয়াছে। এই ইচ্ছাশক্তির উপরেই সমস্ত সৃষ্টি অবস্থিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মানুষের ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইলে এই যৌন-সম্বন্ধ যুক্ত কামনা ক্ষীণ হইতে থাকে। শিবের স্তরে আসিলে এই কামনা একেবারে শুদ্ধ হইয়া যায়। তাই কামনাকে আমরা এত ছোট করিয়া রাখিতে চাই না। আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কামনার উন্নত অবস্থা আসিতে থাকে। তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি তবে কামনাকে আমরা প্রত্যেক স্তরেই দেখিতে পাইব। একথা সত্য যে নিম্নস্তরে কামনা যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। পরে এক স্তরে সেই কামনা বিদ্যা ও যশাদি অর্জ্জনে আত্মদান করে। অন্যস্তরে দশের মঙ্গল এবং সমাজের সংগঠনকে শক্তিশালী করিবার জন্য সেই কামনা মানুষকে উদ্বেলিত করে। এক স্তরে যে কোন প্রকারে অন্তঃকরণের শান্তির পুষ্টিই সেই কামনার লক্ষ্য হয়। শক্তিস্তরে আসিলে জগতের মঙ্গলই মানুষের কাম্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বহুস্থানে বলা হইয়াছে অনুভূতির রূপগুলিকেই ঈশ্বর মানিতে হয়। বিভিন্ন প্রকারের শক্তিসম্পন্ন অনুভূতিগুলি গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শিব-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শক্তিস্তরে আসিলে বুঝা যায় ঈশ্বর কি বস্তু। তখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় উহা আমাদের আত্মারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশের অবস্থা, যাহা সর্ব্বপ্রকার লৌকিক এবং অলৌকিক দুর্ব্বলতাশূন্য অবস্থা। আমাদের এই অবস্থাকে বহু-প্রকারের কল্পিত লৌকিক বাঁধনে বাঁধিয়া আমরা নিজকে এতদিন ছোট করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা এ স্তরে আসিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। এই শক্তিস্তরের লক্ষণই আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থার লক্ষণ। পাঠকগণ যদি এই শক্তি অংশে আলোচিত শঙ্খ, চক্র, ত্রিশূল ও

কৃপাণের আবার আলোচনা করেন তবে ভাল হয়। এই চারিটা অস্ত্র যেন জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক স্বভাবের বহির্বিকাশ। জীব মাত্রেরই স্বভাবে এই চারিটী অস্ত্র যেন মিলিয়া জুলিয়া অবস্থিত। এই চারিটী অস্ত্র যেন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব হইতে সর্ব্বজীব-শ্রেষ্ঠ মানুষের স্বভাবের স্বভাবিক বিকাশ। যেখানে জীব-স্বভাবে এই প্রাকৃতিক আন্তর শক্তির স্বভাবিক বিকাশ দৃষ্ট হয় না সেখানে জানিতে হইবে সেই জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের বিশেষ অত্যাচারের ফলে সে এমন অস্বাভাবিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। (ক্রমোন্নত বিকাশে সাধকের সাময়িক-ভাবে কোন কোন কেন্দ্রিয় অনুভূতিতে আত্মদান করিবার কারণও ইহার সাময়িক ব্যতিক্রম দেখা যাইবে, কিন্তু ঐ ব্যতিক্রম স্বাভাবিক নহে)। যে কোন জীবকে তাহার প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সে চিৎকার করিয়া নিজের অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করে বা তাহার উপর অন্যায় অত্যাচারের তীব্র আন্তরিক প্রতিবাদ জানাইতে থাকে (শঙ্খ)। প্রত্যেকটী জীব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে (চক্র), প্রত্যেকটী জীব কর্ম্মান্তে বিশ্রাম করে বা শান্তির সহিত থাকিতে ভালবাসে। এই অন্তরের শান্তি চওয়াই এক সমাজভুক্ত জীবের নিকট অন্য সমাজভুক্ত জীবের প্রাকৃতিক আচার ব্যবহারকে অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইলেও অসহ্য হইতে দেয় নাই (ত্রিশূল)। যে কোন স্বাধীন জীবের উপর অত্যাচার করিলে সে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে (কৃপাণ)। মানুষে এই প্রাকৃতিক বিকাশ অন্যান্য জীব হইতে স্বভাবতঃ বেশী প্রস্ফুটিত। মানুষে যদি ইহার ব্যতিক্রম হয় তবে খোঁজ ইহার মূলে কি কারণ বিদ্যমান্ আছে, তাহার প্রতিকারই বা কি আছে? শিক্ষা, সমাজ, গুরু এবং রাজশক্তিই ইহার জন্য দায়ী।

দুর্গাধ্যান অবলম্বনে এপর্য্যন্ত যে সব কথার আলোচনা করা হইল তাহাতে কর্ম্মী মাত্রই নিজের প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়মিত করিতে পারিবেন। পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া যে সব উপাদানকে উন্নত করা প্রয়োজন তাহা উন্নত করিয়া লইবেন; যে সব উপাদান নিজের চরিত্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে সেগুলিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া লইবেন। মনে রাখিবেন ইহা প্রচার করিবার জন্য নহে, ইহা নিজেদের চরিত্রকে উন্নত করিবার জন্য। বহুদিন বার বার পাঠ করিয়া ইহার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিবেন। অন্যকে এই উপাদানের সহিত পরিচিত করাইবার জন্য প্রথম ইহা পাঠ করিতে দিবেন, পরে তিনি নিজেই নিজের প্রয়োজন মত উপাদান ইহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। যাহারা ছলধর্ম্মপরায়ণ তাহারা স্বভাবতঃই বেশী বুদ্ধিমান হইয়া থাকে (বিষ্ণু অংশে দেখ)। তাহারা ইহা পাঠ করিয়া সাধারণতঃ এই মন্তব্যই প্রকাশ করিবে "ইহার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারিলাম না"। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছলনা করিবার পথ আরও সহজ করিয়া লইতে পারিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একজন মানুষও যেন সত্যের অবলম্বনে নিজের আত্ম-বিকাশের জন্য ইহার অবলম্বন করেন, তবেই সুখের হইবে; আমাদের উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। শক্তি-অংশের অন্যান্য কথা আলোচনা করিবার জন্য এবার আমরা ধ্যান অংশ এখানেই সমাপ্ত করিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

ক্রম-বিকাশের পথে

গীতার পুরুষোত্তম।

সপ্তম অধ্যায়।

"মন্ত্র-শক্তি" ॥

দুর্গা-ধ্যানে "ধ্যায়েৎ" ব্যাখ্যা অংশে প্রণবের কথা আলোচনা করা হইয়াছিল। ওঁ, ঐঁ, হ্রীঁ, ক্লীঁ, ক্রীঁ, হ্লীঁ প্রভৃতি বীজমন্ত্রকে প্রণব বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাদের প্রকৃত রহস্য সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিলে জানা যায়। যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শক্তিশালী গুরু-নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কুণ্ডলিনী জাগরণ, ভূতশুদ্ধি ও মন্ত্র-চৈতন্য করিয়া কিছু দিন জপ করিলেই সাধকগণের অন্তরে এক একটী বীজমন্ত্র এক এক প্রকারের শক্তিদান করিতে থাকিবে। সেইসব শক্তিকেই বিভিন্ন প্রকার খণ্ডশক্তি সমন্বিত ঈশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে। সাধকগণ এইভাবে অগ্রসর হইতে থাকেন। এইসব মন্ত্র-শক্তিই ঈশ্বর।

ধ্বনি-বিজ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে 'ওঁ'ই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু শক্তি-বিজ্ঞানের দিক দিয়া বিচার করিলে কোন বীজমন্ত্রকেই কম শক্তিশালী বলা চলে না। তবে সাধনার সব স্তরে সব প্রকার বীজমন্ত্রের অবলম্বন চলে না। যে কোন ধ্বনিরই উত্থান, স্থিতি ও লয় অবস্থা আছে। ধ্বনির এই স্বাভাবিক উত্থান, স্থিতি ও লয় অবস্থাই প্রণব (ওঁ)। ধ্বনির আদ্য বা উত্থানে 'অ', স্থিতিতে 'উ' এবং লয়ে 'ঁ' (নাদ)। ধ্বনির এই স্বাভাবিক উত্থান, স্থিতি ও লয়

অবস্থার সহিত মনঃসংযোগ করিয়া প্রণব (ওঁ) জপ করিতে হয়। ইহাতে অতি শীঘ্র মন স্থির হইয়া আসে। সাধনার পথে সাধকগণের সময় সময় বায়ুর প্রকোপ হইতে দেখা যায়। সে সময় ধ্বনি-বিজ্ঞানে প্রণব জপ অত্যন্ত আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে ধ্বনি-জগৎ যেখানে যাইয়া শেষ হইয়াছে সেখান হইতেই শক্তি-জগৎ আরম্ভ হইয়াছে; অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্বের পরপারে শক্তি-জগৎ অবস্থিত। এজন্য যে কোন বীজমন্ত্র জপ কালে সেই বীজমন্ত্রের পূর্ব্বে 'ওঁ' যোগ করিয়া জপ করিতে হয়। ধ্বনি-বিজ্ঞানে প্রণব জপ দ্বারা অন্তঃকরণ প্রাকৃতিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার পর যে কোন বীজ-মন্ত্রই মন্ত্র-চৈতন্য করিয়া লইয়া প্রণব সহ মানস জপ করিতে হয়। যাঁহারা ভূতশুদ্ধি আদি ক্রিয়া করিতে পারেন না তাঁহাদের পক্ষে এইভাবে জপই প্রশস্ত। মন্ত্র-চৈতন্য হইয়া যাইবার পর মন্ত্রের স্পন্দন-প্রবাহ বুঝা যায়। তখন মন্ত্রের স্পন্দন-প্রবাহের সহিত মিল রাখিয়া জপ করিয়া চলিতে হয়। "ওঁ"কে শক্তি-বিজ্ঞানেও জপ করা, চলে আবার ধ্বনি-বিজ্ঞানেও জপ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য বীজমন্ত্রগুলি ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করা চলিলেও তাহাতে বিশেষ সুবিধা হয় না। ঐ বীজমন্ত্রগুলি মন্ত্র-চৈতন্য করিয়া বা মেরুদণ্ড মধ্যগত সুষুম্নাপথে মনঃ-সংযোগ করিয়া জপ করিলে বিশেষ সুবিধা জনক হইবে। ধ্বনি-বিজ্ঞানে 'ওঁকার' জপ করিতে হইলেও ঐ সুষুম্নাপথকে অবলম্বন করিয়াই জপ করা প্রয়োজন। ধ্বনির উত্থান, স্থিতি ও লয়ের যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহা বুঝিতে না পারিলে ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ সুবিধা হয় না। ধ্বনি-জগতের শেষ হইয়াই শক্তি-জগৎ আরম্ভ হয়। প্রণব-ধ্বনিকে ধরিয়াই ধ্বনি-জগতের শেষ প্রান্তে যাওয়া যায়। এই জন্যই 'প্রণবকে' মন্ত্রের সেতুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সিঁড়ির সাহায্যেই শক্তি-স্তরে যাইতে হয়। তাই মন্ত্রশাস্ত্রে 'প্রণবের' এত আদর।

মনের জড়তা নাশ করিবার জন্য মন্ত্রজপ অত্যন্ত আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। মনের উপাদানের মধ্যেই মানুষের অশান্তি ও দুঃখের কারণ গুলির বেশীর ভাগ বিদ্যমান্ থাকে। যাহারা বেশীদূর ভাবিতে পারে না তাহাদের মনের উপাদানে জড় অংশ খুব বেশী। যাহারা অন্যের জন্য ও সমাজের জন্য ভাবিতে পারে না তাহাদের মনের শক্তি খুবই কম জানিতে হ'বে। বেশী জাড্যভাব পন্ন মনই মোহে জড়িত থাকে। যাহারা বেশী দূর ভাবিতে চাহেন তাঁহারা নিশ্চয় 'বীজমন্ত্র' জপ করিবেন। মনের জড়তা নাশ করিতে মন্ত্র-শক্তি অত্যন্ত আশ্চর্য্য অবলম্বন। বীজমন্ত্র জপ না করিলে সহজে মনের দুর্ব্বলতা নাশ এবং মানস-শক্তির বৃদ্ধি করা যায় না।

প্রায়ই দেখা যায় যাহারা মালার ঝুলি লইয়া দিন কাটায় তাহারাই বেশী স্বার্থপর, কুটিল এবং ছল হয়া থাকে (অবশ্যই সকল নহে); ইহার কারণ তাহারা বাস্তবিক জপ করে না; তাহারা ছলনার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মালা ঘুরাইয়া চলে এবং দিন পর দিন ছলনাই আয়ত্ব করে। ইহাদিগকে যেন কেহ মন্ত্রযোগী মনে না করেন। এখানে একটী কথা সকলেই লক্ষ্য করিবেন যে যাহারা মালা লইয়া দিন কাটায় তাহারা হীন স্বার্থ-বুদ্ধির ক্ষেত্রে হইলেও কখনও বোকা হয় না।

ধ্বনির তিনটা স্তর। প্রথম ধ্বনির আরম্ভ ওঁকারে উহাই 'অ' দ্বিতীয়ে ধ্বনির স্থিতি ওঁকারে উহাই 'উ', তাহার পর ধ্বনির লয়ই ওঁকারের 'ঁ' (ম্)। একটা ঘণ্টাতে আঘাত দাও, পরে ধ্বনিটা ঘণ্টায় আসিয়া কিভাবে লীন হইতেছে উহা বুঝিবার জন্য ঘণ্টাটীকে কানের খুব নিকটে ধরিয়া রাখ বহুক্ষণ ধরিয়া ধ্বনি তাহাতে লীন হইতেছে বুঝিতে পারিবে। ধ্বনি-বিজ্ঞানে প্রণব-জপের জন্য অ, উ এবং ম্কারের উচ্চারণের দিকে নজর দিবার প্রয়োজন হয় না; দিলে সুবিধাও হইবে না। নাদের উত্থান, স্থিতি ও লয় তিনটা অবস্থাকে পরপর লক্ষ্য করিয়া

যাইতে হয়। অভিজ্ঞ সাধকের নিকট জানিয়া লইলে ভাল হয়। একটা ঘণ্টা ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়া ক্রমধ'রাতে যেরূপভাবে স্থিতি ও লয় পর্য্যন্ত চলিয়া যায় প্রণব জপকালে সেই ধ্বনিটী কণ্ঠে বাজিয়া উঠিবে এবং অন্তরলক্ষ্যটি ধীরে ধীরে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া সুষুম্না পথ ধরিয়া সহস্রার পর্য্যন্ত চলিয়া যাইবে। এখানে 'অ'কারের তিন মাত্রা (অ-অ-অ)—মূলাধারে একমাত্রা, স্বাধিষ্ঠানে একমাত্রা এবং মনিপুরে একমাত্রা। ইহার পর অনাহতে 'উ'কারের তিন মাত্রা (উ-উ উ) স্থিতি দিয়া বিশুদ্ধাখ্যের উপর সহস্রার পর্য্যন্ত 'ম্' বাজিয়া উঠিবে। 'ম্'এর মাত্রা যত বেশী হয় ততই ভাল। 'উ' পর্য্যন্ত বলিয়া মুখবন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং 'ম্'কারের ধ্বনিটী যেন আপনি আপনি বাজিয়া চলিয়াছে এমনভাবে এই অনুনাসিক ধ্বনিটী করিয়া যাইতে হইবে। এখানে অকার, উকার ও ম্কারের প্রশ্ন নাই। ধ্বনির উত্থান, স্থিতি ও লয়ের অবস্থার সঙ্গে মনকে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যে কোন ধ্বনিরই উত্থান অবস্থা 'অ', স্থিতি অবস্থা 'উ' এবং লয় অবস্থা 'কারম্' জানিতে হইবে। ধ্বনি উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই লয়মুখী হইতে থাকে। কাজেই ইহাকে ধ্বনির বাল্য, যুবা এবং বৃদ্ধাবস্থা বলিলেই ঠিক হইবে। উত্থানে বাল্যাবস্থা 'অ', যুবাবস্থাই 'উ' এবং লীন অবস্থাই 'ম্'। উঠিয়াই ধ্বনিটা একটু পুষ্ট হয়, পরে উহা লীন হইতে আরম্ভ করে। এই পুষ্ট অবস্থাই 'উ'কার। ইহার পর সবটাই লীন অবস্থার অন্তর্গত কথা। 'অ'কার অরুণ-বর্ণ, 'উ'কার শুভ্রবর্ণ এবং 'ম'কার স্ফটিকবর্ণ হইবে। 'অ'কারে মনোময় কোষ, 'উ'কারে বিজ্ঞানময় কোষ এবং 'ম্'কারে সাধক জ্ঞানের কেন্দ্রে (মহৎতত্ত্বে)যাইয়া উপস্থিত হইবেন। অরুণ বর্ণ, শুভ্রবর্ণ এবং স্ফটিকবর্ণ তিনটা স্তর একই 'ওঁকার' দ্বারা ব্যাপ্ত।

স্পন্দনের উত্থান, স্থিতি ও লয় অবস্থা আছে। স্পন্দন মাত্রই ধ্বনির স্বরূপ। ক্রিয়া, স্পন্দন ও ধ্বনি প্রায় একই কথার নামান্তর

মাত্র। বহু স্পন্দনের মধ্যে যে সাধারণ উচ্চ নীচ ভাব তাহাই ছন্দঃ। তাল ছন্দকেই অনুগমন করে—একথা শিব-অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। অনুভূতির বিভিন্ন স্তরে স্পন্দনের বিভিন্নতা আছে। একটা দীর্ঘ 'প্রণব' উচ্চারণে যে কত কোটী স্পন্দনের সমাবেশ হয় তাহা সাধারণ পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন না। একটা সূর্য্য-রশ্মিতে যে কতকোটী তেজঃ-কণা খেলিয়া বেড়ায় ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। স্পন্দনকণাই ধ্বনিস্থিত শক্তি। 'অ'কার স্থিত কণাগুলি অরুণবর্ণ, 'উ'কার স্থিত কণাগুলি শুভ্রবর্ণ এবং 'ম্'কার স্থিত কণাগুলি স্ফটিক বর্ণ হইয়া থাকে। 'অ'কারের কণাগুলি অপেক্ষা উকারের কণাগুলি সূক্ষ্ম এবং ঘন। 'উ'কার হইতেও 'ম্'কারস্থিত শক্তি-কণাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। স্পন্দনের উত্থান, স্থিতি ও লয়ে একই প্রণব বাজিয়া উঠে। ধ্বনির দিক দিয়া বিচার করিল 'ওঁ'কারই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। কিন্তু পাঠকগণ একথাও জানিয়া রাখুন যে শুধু প্রণবরূপে ধ্বনি-জগতের সূক্ষ্ম-বিভাগ সম্বন্ধে কোন রহস্যই উদ্ঘটিত হয় না। ইহার কারণ আমাদের অন্তঃকরণ সাধারণতঃ এত জড়ভাবাপন্ন থাকে যে আমরা ইহার সাহায্যে কোন সূক্ষ্ম বস্তুর উপরই বিচার করিতে পারি না। একটা দীর্ঘ প্রণব-ধ্বনিতে যে কতকোটী স্পন্দন খেলিয়া বেড়ায় তাহা বুঝিতে হইলে মনের জড়তাকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন হইবে। সেজন্য মন্ত্র-চৈতন্য করিয়া বীজমন্ত্র জপ করা প্রয়োজন।

যে কোন যন্ত্রেই আঘাত করিলে ধ্বনির উত্থানে, স্থিতি ও লয়ে 'প্রণব' বাজিয়া উঠে একথা সত্য। কিন্তু ঘণ্টা ধ্বনিতেই ইহার সঠিক বিজ্ঞান ধরা পড়িবে অন্যান্য যন্ত্রে ঐরূপ পরীক্ষা করিতে গেলে কিছু গোলমাল আসিবে, তাহাও অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের জানিয়া রাখা প্রয়োজন।' সেতার, এসরাজ আদি বহুতার সংযুক্ত যন্ত্রে আঘাত করিলে ক্রীঁ, হ্রীঁ ইত্যাদি ঈকার মধ্যধ্বনির আভাস পাওয়া যাইবে।

কারণ সেখানে একটা ধ্বনির কম্পনের আঘাতে এক সঙ্গে বহুতার বাজিয়া উঠে। তান্ত্রিক সাধনার মন্ত্র-শক্তি ঐ বিজ্ঞানেই বেশী শক্তি-শালী হয়। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত বহু নাড়ী সংযুক্ত সুষুম্না পথই মন্ত্রযোগের আসল স্থান। ঐ পথে মানুষের কর্ম্মধারা, জ্ঞানধারা, বোধধারা ও ভাবধারা নিয়ত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। সাধক ঐ নাড়ীতেই নিজের মন্ত্রকে ধ্বনিত করিবেন; অর্থাৎ ঐ নাড়ীপথ অবলম্বন করিয়া জপ করিবেন। ঐ নাড়ীপথে প্রবেশ করিবার জন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতশুদ্ধি করিয়া লইয়া মন্ত্রজপ আরম্ভ করিতে হয়। স্থূল ভূতশুদ্ধির সংক্ষেপ কথা মনের শূন্য বোধ আয়ত্ব করিয়া লওয়া। সূক্ষ্ম-ভূতশুদ্ধির লক্ষ্য হইল বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করা। সাধনার পথে সাধককে ইহারও ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু ইহা কোন ক্রিয়াসাপেক্ষ স্তর নহে। অর্থাৎ ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করা যায় না। মনোময় কোষ ক্ষীণ হইলে বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ হইয়া থাকে। সাধক প্রথমটায় গুরুনির্দ্দিষ্ট ভাবেই জপ আরম্ভ করিবেন, পরে সময় মত সবই বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা নিষ্কপট এবং উচ্চ কর্ম্ম ও জ্ঞান লক্ষ্য সমন্বিত সাধক তাঁহারা যদি শক্তিশালী গুরু লাভ করিতে পারেন তবেই বুঝিতে পারিবেন বীজমন্ত্রগুলি কিরূপ শক্তিশালী বস্তু। মানুষের জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও সুখের সন্ধান ঐ বীজমন্ত্রগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। বীজমন্ত্রের জপ অত্যন্ত সুখদ সাধনা। যাহা হউক আমরা ধ্বনি সম্বন্ধে বলিতেছিলাম। ঢাক, ঢোল আদি বাদ্য যন্ত্রে জোরের সহিত আঘাত করিলে 'বম্ বম্' ধ্বনির মত ধ্বনি পাওয়া যাইবে, আবার খুব ধীরে আঘাত করিলে 'ওঁ'ই বাজিয়া উঠিবে। যন্ত্রটীকে অস্বাভাবিকভাবে পীড়ন করিবার দরুণ ধ্বনির ঐরূপ ভেদ হইয়া থাকে।

যে কোন যন্ত্রকে যথাযথ বিজ্ঞানে যত বেশী বাজান যায় সেই যন্ত্রের আওয়াজ তত বেশী মধুর হইতে থাকে—অভিজ্ঞ-মাত্রই একথা জানেন। ধ্বনির স্পন্দন আঘাতে সেই যন্ত্রস্থিত জড়-অংশ ক্রমে ধীরে ধীরে নষ্ট হইতে থাকে। মন্ত্র-জপও ঐরূপ ধ্বনিরই সাধনা। মন্ত্র-জপ দ্বারা সাধকের অন্তঃকরণস্থিত জড়-অংশ ধ্বংশ হয় এবং জ্ঞান-অংশ জাগ্রত হইয়া সাধককে শক্তিশালী করে। যিনি যত সুনিপুণ ধ্বনি-সাধক তিনি জ্ঞানের পথে তত শীঘ্র অগ্রসর হইতে সমর্থ। যিনি যত উন্নত স্তরের মন্ত্রযোগী সাধক তাঁহার কণ্ঠস্বর তত মিষ্ট, স্পষ্ট ও তেজ-মাখা হইয়া থাকে।

মানুষের মনোজগৎ যে বহুপ্রকার অজ্ঞান এবং নিম্নস্তরের চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে একথা মানুষ মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। সমাজস্থিত বহুলোকের চিন্তার প্রভাবে এবং উন্নত লক্ষ্য, উন্নত আশা ও উন্নত বিচারের অভাবে আমাদের মন নিম্নস্তরের চিন্তাকণাদ্বারা আবৃত থাকে। মন্ত্র-শক্তি সাহায্যে সে সব জড়তার আশ্রয় চিন্তাকণাগুলিকে নষ্ট করিয়া দিতে হয়। আবার মন্ত্রশক্তি সঞ্চিত হইয়া নিম্নস্তরের চিন্তাকণার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার শক্তিও আয়ত্ব হয়। বহুলোক মন্ত্রযোগের ভিত্তি ত্যাগ করিয়া শুধু 'হঠ, লয়' আদি যোগাঙ্গের অভ্যাস করিতে যাইয়া বহু বৎসরেও জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। উহার কারণ তাঁহাদের অন্তঃকরণস্থিত জড়-অংশ এতই প্রবল যে উহা তাঁহাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। আবার শুধু মন্ত্রযোগ অবলম্বনেও উন্নত জ্ঞানের স্তরে প্রতিষ্ঠালাভ সহজ নহে। মন্ত্র হঠ লয় ও রাজযোগের মিশ্র সাধনার অভ্যাস করা প্রয়োজন। বাদ্যযন্ত্র যেমন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রস্তুত করিয়া তাল ও সুরের সাধনা দ্বারা দিন পর দিন মধুর ধ্বনির ক্ষেত্র হইতে থাকে ঠিক সেইরূপ মানুষের অন্তঃকরণও মন্ত্রজপ দ্বারা দিন পর দিন নির্ম্মল হইতে থাকে। শক্তিশালী গুরুর (হঠ, লয় ও রাজমিশ্র মন্ত্রযোগী) সঙ্গ পাইলে

সাধক মাত্রই ৪।৫ দিনের মধ্যেই মন্ত্র ও গুরুশক্তির প্রভাবে নূতন জীবনের সন্ধান পাইবেন। শক্তিশালী গুরুর স্পষ্ট অর্থ—ভোগ, মোহ এবং অভিমানের পরপারস্থিত সাধক মহাপুরুষ। গুরু যাঁহাদের ঐরূপ নহেন তাঁহারা ধৈর্য্য ধরিয়া ২।৩ বৎসর মন্ত্রযোগের অভ্যাস করিলে নিশ্চয়ই ফল পাইবেন। মন্ত্রযোগের অভ্যাসের সঙ্গে বন্ধনত্রয় সহযোগে প্রাণায়ামের (ও মুদ্রার) অবলম্বন থাকিলে ভাল হয়।

যাঁহারা ভোগ, মোহ এবং অভিমানের পরপারে যাইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা মন্ত্র প্রভাবে জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া বিষয় ও ভোগের উপকরণ সহজে লাভ করিবার জন্য অসীম বুদ্ধি-শক্তি আয়ত্ব করিতে পারিবেন। মন্ত্রযোগ দ্বারা মনের জড়-অংশ নষ্ট হয়, কাজেই ইহাতে সাধকের বুদ্ধি-শক্তি খুবই তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া মোহ এবং ভোগবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহেন তাঁহারা মন্ত্র-শক্তি প্রভাবে অসীম কুটীল বুদ্ধি আয়ত্ব করিয়া অন্যকে দিয়া নিজেদের মতলব সিদ্ধির বহুপথ উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারিবেন। বুদ্ধিমান লোক বুঝিবেন সব, কিন্তু বিরুদ্ধে কথা বলিবার শক্তি খুব কম লোকেরই হইবে। যাঁহারা সমাজের উপর ধর্ম্মের নামে বংশ পরম্পরায় প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মন্ত্রযোগী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। মন্ত্রযোগের অবলম্বন করিয়া যাঁহারা মনোময় কোষের পর পারে স্থিত হইতে চাহেন না তাঁহারা অত্যন্ত কুটীল বুদ্ধির ক্ষেত্র হইয়া থাকেন। ইঁহারা মন্ত্র-শক্তিটাকে নিজেদের দুর্ব্বলতাকে ঢাকিবার জন্য এবং অন্যের মানসিক দুর্ব্বলতাকে আয়ত্ব করিবার জন্য নিয়োজিত করেন। বংশপরম্পরায় ইঁহাদের কুৎসিত মনোবৃত্তি প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। সিদ্ধবংশ, গুরুবংশ এবং সাধকবংশ বলিয়া ইঁহারা আপনাদিগকে প্রচার করিয়া চলেন এবং সমাজকে সংস্কার-গণ্ডী-বদ্ধ করিয়া রাখিয়া ধর্ম্মের নামে ছলনা ও উপার্জ্জন বজায় রাখেন।

ইঁহাদের কাজের দুইটা দিক আছে। একত নিজেদের উপার্জ্জন ও বংশমর্য্যাদাকে নিতান্ত নির্লজ্জের মত কায়েম রাখা, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে অন্ধ-সংস্কারবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ধর্ম্মের নামে অর্থ দিতে বাধ্য করা। ইহা বিষ্ণু-কেন্দ্রপুষ্ট মনোবৃত্তিরই লক্ষণ। সুতরাং ইঁহাদের দ্বারা সমাজেব ক্ষতি হইলেও ইঁহাদের লোপ হওয়া খুবই অসম্ভব।

ধর্ম্মের নামে সঙ্ঘ স্থাপনা করিয়া যাঁহারা গুরুগিরি করেন তাঁহারাও খুব বিষ্ণুচক্র চালা তে জানেন। ইঁহারা সাধনার ধারও ধারেন না। ইঁহারা কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত্র খুব জাঁকাল করিয়া দাঁড় করান এবং মানুষকে সেই মহাপুরুষের জীবনকথার মধ্যে ফেলিয়া নিজেদের কথার হেরফের ধর্ম্মকে মানাইতে বাধ্য করান। যাঁহারা উন্নত বিকাশ চাহেন তাঁহারা **যে কোন ধর্ম্মের আদি পুরুষ যে মানুষ, তাঁহারা যে স্বয়ং নিষ্কলঙ্ক নির্ভুল ভগবান নহেন** একথা প্রথমে বুঝিয়া রাখিবেন।

সাধক দশায় সাধকমাত্রই সেতু-প্রণব (ওঁ) অবলম্বনসহ গুরুনির্দ্দিষ্ট বীজমন্ত্র (ক্রীঁ, হ্রীঁ ইত্যাদি) জপ করিবেন। ক্রমে সাধক শক্তিশালী হইতে হইতে জ্ঞানের চরমে (মহৎ-তত্ত্বে) পৌছিলে তখন তাঁহার বীজমন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন কমিয়া যায়। এসময় 'ওঁকার' জপ করিলেই যথেষ্ট। প্রথমাবধি সেতুপ্রণব অবলম্বন দ্বারা সাধক শান্তি পাইতে পারেন একথা সত্য, কিন্তু অজ্ঞানতার গ্রন্থিগুলি শিথিল করিবার জন্য যেরূপ শক্তির প্রয়োজন তাহা লাভ করিতে পারিবেন না। সেতু-প্রণব খুবই স্নিগ্ধ শক্তিসমন্বিত মন্ত্র। অন্যান্য বীজমন্ত্রগুলি সেরূপ নহে। সেতু-প্রণবে তেজ (র) এবং ত্যাগের (ঈ) অংশ না থাকিবার দরুণ ইহাদ্বারা বিকাশের পথ সহজ হয় না। বিকাশের পথে ত্যাগ এবং তেজঃস্বিতার খুব প্রয়োজন।

অ, ই, উ প্রভৃতি ধ্বনিগুলির সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ কেন্দ্র সম্বন্ধ রাখে, কোন্ ধ্বনিতে কোন্ কেন্দ্র শক্তিশালী হয় এবং কোন্ ধ্বনিতে কিরূপ শক্তির আবেশ হয় তাহা পাঠকবর্গের জানা প্রয়োজন। মস্তিষ্ক-কেন্দ্র-চিত্রে পাঠক ধ্বনি-শক্তির কেন্দ্র মিলাইয়া লউন।

মস্তিষ্ক-কেন্দ্র পরিচয় চিত্র।
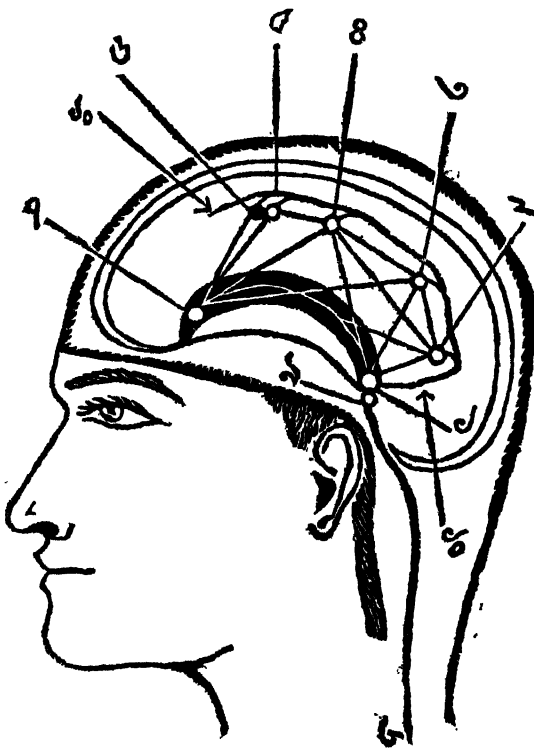
১ চিহ্নিত কেন্দ্র—ঋ
২ " " —অ
৩ " " —ও
৪ " " —উ
৫ " " —ং
৬ " " —ঃ
৭ " " —ই
৮ " রেখা—মেরুদণ্ডের মধ্যপথ ধরিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, ইহা কোন কেন্দ্রস্থান নহে।
৯ চিহ্নিত কেন্দ্র—৯।

১০ চিহ্নিত অংশ রেখামাত্র। ইহা কোন কেন্দ্রস্থান নহে। ইহা শক্তি-স্তর; এই স্তরটীই সমস্ত শক্তির মূলস্থান। এই স্তরের প্রত্যেকটী শক্তিকণাতে অ, ই, উ, ঋ, ৯, ং এবং ঃ প্রত্যেকটী শক্তির বিকাশ আছে। এই রেখাস্তরই শক্তি-স্তর। আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আমাদের আত্মবুদ্ধি এই স্তরে প্রতিষ্ঠিত করা। এই স্তরে যাঁহাদের আত্মবুদ্ধি স্থাপিত হইয়াছে তাঁহারাই গীতাবর্ণিত ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেন। এই স্তরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা মন্ত্র-শক্তি অংশে সংক্ষেপে বলা হইবে।

সাধক এবং কর্ম্মিগণ পূর্ণ-শক্তির স্তরে আত্মবুদ্ধি স্থাপনার কথা শুনিয়া ভীত হইবেন না। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষদের মত উন্নত চরিত্র এবং কর্ম্ম-শক্তি আয়ত্ত করিতে হইবে, একথা ভাবিতে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা বর্ত্তমান প্রচলিত বৈষ্ণববাদ বা ভাববাদের অনুকূলে খুব বড় পাকা ভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে এবং বিকাশক্ষেত্রে তাঁহারা কোনযুগেই সূর্য্যস্তরের উপরে দাঁড়াইতে

পারিবেন না। যাঁহারা এরূপ ভাবপ্রবণ মনোবৃত্তি পোষণ করেন তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিশেষ দূরে অবস্থান করিবেন, কারণ—কর্ম্ম-ক্ষেত্র ও ভাবক্ষেত্র এক নহে। ভাবক্ষেত্র সূর্য্যস্তর এবং কর্ম্মক্ষেত্র শক্তিস্তর; দুই-এ অনেক ভেদ। ক্রম-বিকাশের প্রগতির পথে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন তাঁহারা একাধারে কর্ম্মী এবং সাধক হইয়া চলিবেন। নিম্ন-স্তরের আবরণে মোহ না থাকিলে মানুষমাত্রই নিজ কর্ম্মলক্ষ্যকে শক্তি-স্তরে দাঁড় করাইতে পারিবেন। আমাদের কথা—একজন মানুষের চরিত্রে যে সব লক্ষণ ফুটিতে পারে উহা মানুষমাত্রেরই স্বভাবে ফুটা অসম্ভব নহে। কারণ পূর্ণ-স্তরে মানুষমাত্রেরই চরিত্রের মূল উপাদান একই প্রকারের। পূর্ণ-স্তর প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে সব সময়েই বিদ্যমান।

ক্রম-বিকাশের পথকে সকল মানুষের নিকট সহজ করিয়া দিবার জন্য আমাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হইবে কেন্দ্রিয় শাসন বিভাগকে শক্তি-স্তরের আদর্শে স্থাপন করিবার চেষ্টা করা। ইহা যদি কোন দিন সম্ভব হয় তবে এই পৃথিবী হইতে দুঃখ, দৈন্য ও অশান্তির বেশীর ভাগ কারণগুলি উঠিয়া যাইবে। যাঁহারা শক্তি-স্তরে দাঁড়াইতে চাহেন তাঁহাদের জীবনের কর্ম্মলক্ষ্য হইবে কেন্দ্রিয় বিভাগকে শক্তি-স্তরের আদর্শে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম-শক্তি নিয়োজিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধনার ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া। এই পৃথিবীর কোন দেশের কেন্দ্রিয় শাসন বিভাগে শক্তি-স্তরের প্রতিষ্ঠা হউক চাই নাই হউক, যিনি ওরূপ লক্ষ্য লইয়া সাধনা এবং কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন তাঁহার বিকাশ পূর্ণ-স্তরের পথে খুব শীঘ্রই অগ্রসর হইতে থাকিবে। তিনি দিন পর দিন ভোগ, মোহ এবং অভিমানজনিত অজ্ঞানতা ও যাবতীয় দুঃখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। অনেকেই জানেন প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষের সামনে তাঁহার বংশধরগণ পরস্পরে বিবাদ করিয়া একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে

মোহসম্বন্ধযুক্ত ক্ষতির কথা ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটুও শোকাকুল হন নাই। প্রকৃতির লীলারহস্য তিনি এমনই ঠিক বুঝিয়াছিলেন যে তিনি জীবনের সমস্তগুলি কার্যক্ষেত্রেই যথোচিত বুদ্ধি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত্রে মোহ এবং অভিমান-জনিত কোনরূপ অজ্ঞানতার ছাপ কখনও পড়ে নাই। জীব-জগতে প্রকৃতি যেমন খেলিয়া চলিয়াছেন সেই খেলা তিনি প্রকৃতিকে অবাধে খেলিতে দিয়াছিলেন। প্রকৃতির এই লীলা-বৈচিত্র্য তিনি এমনিই অকাট্য-বিজ্ঞানে বুঝিয়াছিলেন যে পূর্ণ বিকাশের আদর্শে কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা ব্যতীত কোনই অজ্ঞানাচারণ তাঁহার জীবনে স্থান পায় নাই। যিনি জীবন-লক্ষ্য ওরূপ নিখুঁত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শক্তি-স্তরের আদর্শে চালিয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম্ম ও সাধনা অবলম্বন করিবেন।

বর্ত্তমান সময় কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের অত্যন্ত ভ্রান্তধারণা আছে। যাহারা আসুরিক প্রকৃতির মানুষ এবং যাহারা খুব হীন-স্তরের স্বার্থপর তাহারা মানুষের সাম্‌নে এমন নীতিকে 'কর্ত্তব্যজ্ঞান' নামে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে যাহাতে তাহাদের নিজেদের আসুরিকতা এবং স্বার্থটা বরাবর কায়েম থাকে। যেখানে কর্ম্মলক্ষ্য মানুষের বিকাশকে পূর্ণতার পথে বাধা দিবার জন্য এবং কোন মুষ্টিমেয় .লোকের সুবিধার জন্য রচিত হয় সেই কর্ম্মের দায়িত্বকে পালন করিবার চেষ্টাকে কেহ যেন 'কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা' বলিয়া মনে না করেন। এরূপ কর্ম্ম-নিষ্ঠাকে প্রকৃত কর্ম্ম-নিষ্ঠা বলিয়া মনে করিলে বিশেষ ভুল বুঝা হইবে। কারণ আসুরিক শক্তি যেখানে কেন্দ্রিয় শাসনকে আয়ত্ব করে সেখানে তাহারা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া থাকে। ইহাতে স্বার্থপরদের ভোগলক্ষ্য মাত্র পরিপুষ্ট থাকে এবং সেই কারণ মানুষ-মাত্রেরই বিকাশ-পথ রুদ্ধ হয়। প্রচুর অর্থবিনিময়ে উহারা মানুষের

প্রকৃত কর্ত্তব্যজ্ঞানকে ক্রয় করিয়া লয় এবং উহাদের দ্বারা পৃথিবীর অমঙ্গলের পথ স্থির রাখিয়া চলে। যে কোন প্রকারে নিজের ও সমাজের আত্ম-বিকাশ প্রতিকূল আচরণই অকর্ত্তব্য এবং যে কোন উপায়ে নিজের ও সমাজের বিকাশ অনুকূল কর্ম্মই কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব-বুদ্ধির পরিচায়ক। যিনি যত পূর্ণ-বিকাশের পথে অগ্রসর হইবেন তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা এই বিজ্ঞানেই ক্রমে উন্নত স্তরের ভিত্তিতে স্থাপিত হইতে থাকিবে। যিনি যে কোন ক্ষেত্রেই কাজ করুন না কেন সকলেরই কর্ত্তব্য হইবে সমাজের বিকাশানুকূল সুবিধাকে যথাযথ সময়ে কাজে লাগাইয়া লওয়া। যখন সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-শক্তি বিকাশ-বিরুদ্ধ মতবাদীদের অধীনে থাকে তখন ঐ আদর্শ মানিয়া লইয়াই কর্ম্ম-কেন্দ্র আয়ত্ব করিতে হয় এবং সুবিধা মত উহার দ্বারাই বিকাশে সাহায্য করিতে হয়। যাহারা আসুরিক ভাবাশ্রিত মানুষ তাহারা যে কোন সুবিধাই আসুরিকতাকে স্থায়ী রাখিবার জন্য নিয়োজিত করে। আবার যাঁহারা বিকাশ-বাদী তাঁহারাও যে কোন সুবিধাকেই বিকাশের সুবিধার জন্য নিয়োজিত করিতে প্রস্তুত থাকেন।

শক্তি-স্তর এবং পূর্ণ ঈশ্বরত্বের স্তর একই স্তরকে জানিতে হইবে। মস্তিষ্কের মধ্যে ঐ রেখা-স্তরকেই অবলম্বন করিয়া শক্তি-স্তর অবস্থিত। এই স্তরের কর্ম্ম-বৈশিষ্ট্য আয়ত্ব করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। এই স্তরের আদর্শে সমস্ত প্রকার রীতি-নীতি প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করাই মানুষের কর্ম্ম-লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। এই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাই নিষ্কাম-কর্ম্ম। এই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেই আমরা প্রকৃত পৃথিবীর মঙ্গল করিতে পারিব। অন্য কোনও লক্ষ্যে কর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়িলে অকারণ শক্তিক্ষয় হইবে বা দুর্জ্জনকে পালন করা হইবে।

এদিকে বহুশত বৎসর কর্ম্মক্ষেত্রে এই চালাকি চলিয়াছে। ভারতের বক্ষে এই নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ প্রাচীন মহর্ষি এবং রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক

স্থাপিত হইয়াছিল।' পরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মণগণ এই নিষ্কাম কর্ম্মের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ জড়িত করিয়া দিয়া ইহার ভিত্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। রাজাগণও উহা পালন করিতে যাইয়া পরে নিজেদের পতন আনয়ন করিয়াছিলেন। ভারতের পতনের মূলে এই নিষ্কাম কর্ম্ম-লক্ষ্যে ভুলই প্রধান কারণ। ব্রাহ্মণগণ 'গো-ব্রাহ্মণ-হিতায়'ই 'জগদ্ধিতায়' অর্থাৎ গো এবং ব্রাহ্মণের হিতই নিষ্কাম কর্ম্ম বা জগৎ মঙ্গলকর কর্ম্ম, এরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ অর্থে 'সমাজের জ্ঞান-শক্তি' এবং গো ঐ জ্ঞান-শক্তিকে পুষ্ট করিবার জন্য দুগ্ধদাতা জীব। ক্রমে ইহার আসল অর্থ ভুলিয়া গিয়া একদল কাণ্ডজ্ঞানহীন অদূরদর্শী মূর্খ-লোকের পোষণ অর্থেই উহা ব্যবহৃত হইতে লাগিল; কাজেই প্রকৃত জ্ঞানীর অভাবে সমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইল। ভারতের ঋষি মানুষের জীবন ধারণের জন্য অন্ন এবং গো-দুগ্ধের প্রাচুর্য্যের কথাই ভাবিয়াছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি এবং জ্ঞান-শক্তিকে পুষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা গো-দুগ্ধ এবং অন্নের ব্যবস্থাই চরম ব্যবস্থা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। জ্ঞান-শক্তিই মানুষের কর্ণধার; জ্ঞান-শক্তিই মানুষকে পরিচালনা করিবে। এই জ্ঞান-শক্তিতে শক্তিমান মানুষই ব্রাহ্ম। এই জ্ঞান-শক্তি অর্থে উন্নত শিব-স্তরে প্রতিষ্ঠিত ভোগ, মোহ এবং অভিমানহীন মহাপুরুষ। ইঁহারা কখনও অর্থ এবং সম্মান লোভে কাহারও খোসামোদ করিয়া দিন কাটান না। যাহা হউক প্রত্যেক মানুষ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে পারে এবং প্রত্যেক লোক যাহাতে পেট ভরিয়া অন্ন পাইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশেই যে স্থির রাখিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। ঋষিগণ এইরূপ ব্যবস্থাই স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। ইহারই নাম 'গো ব্রাহ্মণ হিতায়'। একজন সাধারণ মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ এবং রাজচক্রবর্ত্তী সকলের কর্ম্ম ও জ্ঞান-শক্তি

পুষ্টির সমস্ত উপাদান এই গো-দুগ্ধ এবং অন্নের মধ্যে বিদ্যমান্। আজ গোরক্ষার নামে কতকগুলি কঙ্কালসার বৃদ্ধ গরুর পোষনের নামই 'গো-রক্ষা' হইয়াছে এবং একদল স্বার্থপর, ভোগবদ্ধ, পরশ্রীকাতর হীনবীর্য্য, মিথ্যাভাষী মানুষকে পুরোহিত এবং গুরুরূপে পালন করাই 'ব্রাহ্মণ-রক্ষা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোহান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্নগণ এখনও সমাজ ও দেশরক্ষা ব্যাপারে কোন উপযুক্ত পরামর্শ চাহিলে সতীযুগের ছেঁড়া পুঁথীর পাতা খুলিয়া বিচার করিতে লাগিয়া যান! যাহা হউক ভারতের পতনের ইতিহাস-মূলে অন্ধ সংস্কার যে কত কাজ দিয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠে সকলেই জানেন। কর্ত্তব্যের মাপযন্ত্র যে কি চালাকির মধ্যে কোথায় আনিয়া ফেলা হইয়াছিল ইহা বুঝিবার মত জ্ঞানীও একজন ছিলেন না। ভারত এইভাবেই ধ্বংশ হইয়া গিয়াছিল।

পরে 'জগদ্ধিতায়' অর্থে স্বদেশ-প্রেমের বন্যা পাশ্চাত্য অঞ্চলে আসিয়াছিল। সেই সুযোগে ধনীরা কেন্দ্রিয় শাসনের ব্যবস্থাটা নিজেদের হাতে দখল করিয়া লইয়াছিলেন। যুবকদিগকে সহজেই কোন মত-বাদে নাচাইয়া দেওয়া যায়। তাহাদের সামনে নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শের নামে স্বদেশপ্রেমের আদর্শ দাঁড় করাইয়া দিয়া তাহাদেরই রক্তে যে শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহাই বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক-বাদে পরিণিত হইয়াছে। একটা রাক্ষসী শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়া সমস্ত ইউরোপ আজ কি ভীষন অত্যাচারী জাতীর লীলানিকেতন হইয়া রহিয়াছে ইহা আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। ইহারা সমস্ত পৃথিবীকে শোষন করিয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকে একেবারে শ্রীহীন ও স্বাস্থ্যহীন করিয়া দিয়া নিজেদের ভোগের ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া বসিয়া আছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে নবীন যুবকদের কর্ম্মকুশলতায় ইহার বীজ বপন হইয়াছিল। আর আজই ইহার বিষ-ক্রিয়ায় সমস্ত

পৃথিবী জর্জ্জরিত। ইহার চেয়ে রাজশাসনের যুগ অনেক সুখের ছিল; তাহাতে মানুষ পেট ভরিয়া খাইতে ত পাইত! সমস্ত দিন কলকারখানায় যে মজুরী করিতে পারে সে তবুও একপেট খায়, আর বাকীগুলি বেকারের দলে নাম লেখাইয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিতগণ ইহাকেই নাকি আবার সভ্যতা বলেন! ইহাও যদি সভ্যতা হয় তবে বর্ব্বরতা কাহাকে বলে?

এখন আবার কমিউনিজিম্ (মজুর তন্ত্রবাদ) এর নামে নিষ্কাম কর্ম্মের হাওয়া উঠিয়াছে। ইহা যদিও ধন-তন্ত্র-বাদ হইতে উদার, কিন্তু ইহারও ফল অত্যন্ত বিষময় হইবে। ভারতের বক্ষে সেই মতবাদ অত্যন্ত সর্ব্বনাশের কারণ হইবে। ভারতের মুসলমান জনসাধারণ বেশীর ভাগই নিম্ন স্তরের শিব কেন্দ্র-পুষ্ট-মানব, শিব-কেন্দ্র-পুষ্ট-মানব স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু হইলেও স্বাধীনভাবে বিচার করিবার শক্তি ইহাদের মোটেই থাকে না, তাই সহজে ইহাদিগকে সামনে রাখিয়া স্বার্থবাদিগণ নিজেদের স্বার্থের সুবিধা করিতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা দু পাতা পড়িয়া কিছু শিক্ষা লাভ করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বার্থের পেছনে পেছনে দৌড়াইতে থাকেন, অর্থাৎ বিষ্ণুকেন্দ্র আয়ত্ত করিয়া জন্য গণেশকেন্দ্র-পুষ্ট মুসলমান আমাদের চক্ষে আজ পর্য্যন্ত একজনও পড়ে নাই। সূর্য্যকেন্দ্রপুষ্ট মুসলমান অবশ্যই দেখা যায়, কিন্তু ইঁহারাও শেষকালে বিষ্ণুকেন্দ্র আয়ত্ত করেন। নিরক্ষর গরীব মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার ভার নিজেদের সম্প্রদায়ের হাতে। মসজিদের মধ্য দিয়াই উহা সকলে পাইয়া থাকেন। ধর্ম্ম-কথার মধ্যদিয়া গরীব দিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের স্বার্থের সুবিধা হয় মাত্র। ইঁহারা গরীবদের কোন সুখসুবিধার কথাই ভাবেন না। কাউন্সিলের পদগুলি আদায় করিলে বা চাকুরীকে ভাগ করিয়া লইলে সাধারণ গরীবদের কি লাভ হয়? সাধারণ গরীবদের জন্য সহজে

অন্ন এবং বস্ত্রের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। ঐ জন্য কেন্দ্রিয় শাসনে শক্তিস্তরের আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা হওয়া দরকার। কিন্তু সে দিকে কোন শিক্ষিতদেরই নজর নাই। দেশের এবং সমাজের স্বার্থকে বলিদান করিয়া তাঁহারা নিজেদের স্বার্থের প্রতিষ্ঠা কায়েম করেন এবং গরীব মুসলমানদের বুঝাইয়া দেন যে দেখ, কাউন্সিলের পদ ও চাকরী ভাগ করিয়া মুসলমানদের কত সুবিধা করিলাম। সুবিধাত নিজেদের। সেরূপ গণেশকেন্দ্র-পুষ্ট ত্যাগী মুসলমান কোথায় যে ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য যেরূপ কর্ম্মশক্তি আয়ত্ব করা প্রয়োজন তাহা করিবেন? ত্যাগের অভাবে শিক্ষিত মুসলমানগণ অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকবাদী হইয়া চলিয়াছেন। এমন অবস্থায় বিদ্বেষভাবের ভিত্তিতে সংগঠন অত্যন্ত মারাত্মক হইবে। ধনী-বিদ্বেষের উপরেই কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত। ভারতের ধনীরাই বা কি অন্যায় করিয়াছেন? দোষ থাকলে কেন্দ্রিয় শাসনে আছে। কাজেই ভারতে ইহাদ্বারা কাজের কাজ কিছুই হইবে না। যুবকরা এই সব অশিক্ষিতদিগকে বিদ্বেষ ভিত্তিতে উত্তেজিত করিয়া দিলে উহার ফল ভাল হইবে না শিক্ষিত মুসলমানগণ শিখাইবেন ধনী অর্থে হিন্দু ইহারা তখন তাহাই বুঝিবে। গণেশ-কেন্দ্রের পুষ্টি যেখানে হয় না সেখানে স্বার্থ-লক্ষ্য-পুষ্ট বিষ্ণুস্তরের একচাটিয়া অধিকার খর্ব্ব করা যায় না। গণেশ স্তরের আদর্শ যাহারা ধরিতে পারে না তাহারা কমিউনিজম বুঝিতে পারিবে না। কিছুদিন বাদ হিন্দু ধনীদের তিষ্ঠিয়া থাকা দায় হইবে। আমরা স্বার্থ-ভিত্তিতে ধনীবিদ্বেষ অন্দোলনের বিরোধী। মানুষের ক্রমবিকাশের স্তরগুলিকে বেশ মনোযোগের সহিত বুঝিতে চেষ্টা কর। শিক্ষা, দীক্ষা, অন্ন বস্ত্র প্রয়োজন মত সকলের জন্য ব্যবস্থা করিবার উপায় উদ্ভাবন কর। শিক্ষা দ্বারা দীক্ষাদ্বারা এবং শাসনদ্বারা আসুরিক ভাব-দুষ্ট বিষ্ণুকেন্দ্র-পুষ্ট মনোবৃত্তিকে মাত্র নিয়োমিত রাখিতে হইবে, তাহা হইলেই পৃথিবীর

স্বাভাবিক বিকাশ পথ সহজ হইবে। কেন্দ্রিয় শাসনে শক্তিস্তর ফুটাইয়া তোল, আসুরিক ভাবদুষ্ট বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানুষ যাহাতে কেন্দ্রিয় শাসন যন্ত্রে বসিতে না পারে সে চেষ্টা সর্ব্বদা স্থির রাখিতে হইবে। শাসনযন্ত্রের যে কোন স্থানে যিনি বসিবেন তাহাকে প্রথম শপথ করিতে হইবে যে তিনি শক্তিস্তরের আদর্শ গ্রহণ করিলেন। এই জগৎ-মঙ্গলকর কর্ম্মে তিনি মোহ এবং অভিমানশূন্য থাকিবেন। কোনস্থানে তিনি যদি ঐ নীতির অপলাপ করেন তবে তাহাকে কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হইবে। ভোটের জোরেই কেন্দ্রিয় শাসন যন্ত্রে নিযুক্ত হউন বা অন্য কোন প্রকারেই শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হউক উহা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আদর্শের ও কর্ত্তব্যের অপলাপ করিলে তাহার কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিবে। পৃথিবীর সমস্ত প্রকার অশান্তির জন্য প্রথম দায়ী কেন্দ্রিয় শাসন। নিষ্কাম কর্ম্মের নামে ও কর্ত্তব্যের নামে যদি কেহ ভুল বুঝেন তবে ইহার ফলে মানুষের সর্ব্বনাশ হইবে। কেন্দ্রিয় শাসনে শক্তিস্তর ফুটাইয়া তোলা এবং নিজের চরিত্রে শক্তিস্তর প্রতিষ্ঠিত করা, ইহা ভিন্ন নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া কোন কথাই হইতে পারে না। ইতিহাসের প্রগতিতে শেষকালে মানুষের সমাজে কমিউনিজম্ আসিয়া দাঁড়াইবে ইত্যাদি কথায় নাচানাচি করিবার পূর্ব্বে মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে সব কথার আলোচনা হইয়া গিয়াছে সে সব কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখ। মানুষের সমাজে যুগ যুগান্তর ধরিয়া এরূপ বিকাশ ক্রম-বিদ্যমান আছে, ভবিষ্যতে ও থাকিবে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং নিম্নস্তরের শিব সকল দেশেই সমান ভাবে রহিয়াছে। উন্নত স্তরের শিবের বিকাশ ভারত ভিন্ন অন্য কোথাও প্রায় হয় নাই, এই জন্যই কেন্দ্রিয় শাসনযন্ত্রে ভারতের বক্ষেই শক্তিস্তরের বিকাশ স্থান পাইয়াছিল। ঋষির স্থানে

ব্রাহ্মণজাতির আধিপত্য হইয়া উহার মূলচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এখন আবার যাহাতে ঐ স্তরে দাঁড়াইতে পার সেই চেষ্টা করাই প্রয়োজন। বাহির দেখিয়া যতই আঁটাসাঁটা কর না কেন কিছুই ফল হইবে না। মানুষের মনের উপাদান বুঝিতে চেষ্টা কর। বাহিরের সাজসজ্জাতে কোনই দোষ বা গুণ নাই। সব গোলমাল মানুষের মনের মধ্যে। কেন্দ্রিয় শাসন চিরযুগ থাকিবে। ধর্ম্মও মানুষে চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে। সমাজ, শিক্ষা, বিচার বিভাগ কোনটাই উঠিয়া যাইবে না। সকলকে নিজ নিজ স্তরে ঠিক আদর্শ লইয়া দাঁড়াইতে হইবে। যিনি ক্রুট করিবেন তিনি দণ্ডভোগ করিবেন। কেন্দ্রিয় উপাদানে শক্তিস্তর না থাকিয়া যদি আসুরিকতা বিদ্যমান থাকে তবে উহার ফল চিরদিনই সমাজ-বিকাশের বিরোধী হইবে। বর্ত্তমান সময় প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই কেন্দ্রিয়-শাসন অর্থনৈতিক শোষনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। উহাকে শক্তিস্তরের আদর্শে দাঁড় করাইবার জন্য শোষিত ও পীড়িতগণ অর্থনীতিকে ভিত্তি করিয়া কর্ম্মের বিজ্ঞান (প্রোগ্রাম) প্রস্তুত করিয়া দাঁড়াও, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে যাইয়া, বিকাশের পথে নিষ্কাম কণ্টক যদি প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাও তবে শক্তিস্তর বুঝিতে পারিবে না। বিকাশের শেষ লক্ষ্যও ব্যর্থ হইবে।

আমরা ধ্বনি ও মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ছিলাম, এখন আবার আমাদের মূল বিষয়ে প্রবেশ করিব। অ, ই, উ, ঋ, ৯, ং, ঃ এই সাতটী ধ্বনিই মূল ধ্বনি। এই সাতটীর এক একটীতে এক এক প্রকারের শক্তি নিহিত আছে। এই সাতটী শক্তি যখন একই শক্তিকণায় পরিণত হয় তখনই ইহারা একই মূলশক্তি হইয়া থাকে। শক্তিস্তরের একটী কণাতেই এই ৭টী শক্তির সংস্থান আছে। মস্তিষ্কের এক একটী কেন্দ্র

হইতে এক এক প্রকার শক্তিকণা বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদের শরীর অন্তঃকরণ, বিজ্ঞান ও জ্ঞানক্ষেত্রের কার্য্যকলাপ সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে 'অ'কার সূর্য্যকেন্দ্র। জপকালে ইহার শক্তিকণাগুলি মস্তিষ্কের ২ চিহ্নিত কেন্দ্রে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার কণাগুলি অরুণ বর্ণ এবং স্নেহ-বর্দ্ধক, ইহার দ্বারা সাধকের স্মৃতি ও মেধা-শক্তি বৃদ্ধি হয়, এই কণাগুলি সাধককে খুব মধুর চরিত্রে বিভূষিত করে। এই শক্তিগুলি খুব কোমলতার আধার।

'ই'কার গণেশ-কেন্দ্র। জপকালে ইহার শক্তিকণাগুলি ৭ চিহ্নিত কেন্দ্রে সঞ্চিত হয়। এই ধ্বনিস্থিত শক্তিকণাগুলি ধূম্রবর্ণ বিশিষ্ট। ইহা ত্যাগ-শক্তিদায়িনী শক্তিকণা। এই কণাগুলি সাধককে একটু রুক্ষ ও দৃঢ় করে। বিবেক-শক্তি এই কণা হইতেই আসিয়া থাকে। সাধকের অন্তঃকরণকে এই কণাশক্তিই উন্নত ও বিকশিত করে। ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা নাশক শক্তিকণা। ইহা সাধককে একটু গম্ভীরও করে; এই কণাশক্তি সাধকের বিবেককে সঞ্জীবিত রাখে।

'উ'কার শিব-কেন্দ্র। জপকালে এই শক্তিকণাগুলি মস্তিষ্কে ৪ চিহ্নিত কেন্দ্রে জমা হইতে থাকে। ইহারা শান্তির আধার। ইহারা শুভ্রবর্ণ শক্তিকণা চন্দ্র জ্যোতির মধ্য হইতে যেমন শীতল শান্তিকণা ক্ষরিত হয় ইহার কণাগুলি ঠিক সেইরূপ স্নিগ্ধ। এই শক্তিকণা সাধককে স্থৈর্য্য-শক্তি দান করে। এই শক্তির প্রভাব পাইলেই সাধকের চিত্ত স্থির ও শান্ত হয়। এই কণা-শক্তি সাধককে অচঞ্চল করিয়া রাখে। ইহা অত্যন্ত পুষ্টিবর্দ্ধক শক্তিকণা। মনের কর্ম্মহেতু ক্ষয় এই কেন্দ্র হইতেই পূর্ণ হয়। এই শক্তিকণাগুলি সাধকের মনকে সুস্থ রাখে। ইহা সাধককে খুব সরল ও নিরুদ্বেগ করে।

'ঋ'কার কর্ম্ম-কেন্দ্র। জপকালে এই কণাশক্তিগুলি ১ চিহ্নিত কেন্দ্রে জমা হইতে থাকে। ইহা অগ্নিবর্ণ কণা। ইহা তেজঃকণা জানিতে হইবে। ইহা হইতে কর্ম্ম-শক্তি আসিয়া থাকে। ইহা ধ্বংশকারিণী শক্তি। যজ্ঞাদিতে 'স্বাহা' মন্ত্রে এই শক্তিকেই আহুতি দেওয়া হইয়া থাকে। এই শক্তি আমাদের শরীরকে শীঘ্র ক্ষয় করিয়া দেয়। অন্তঃকরণের শক্তিকে রক্ষা করিয়া যাঁহারা কর্ম্ম করিতে জানেন না তাঁহাদের শরীর খুব শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে এই তেজঃকণাকে রক্ষা করিয়া কাজ করিতে না পারিলে কর্ম্মের সফলতা অসম্ভব। ক্রোধকালে এবং তেজোদ্দীপন সময়ে এই কেন্দ্র হইতে তেজঃকণা বিপুলভাবে চলিয়া আসিয়া আমাদের মুখে, চক্ষে এবং সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়।

'ঌ'কার প্রাণ-শক্তি। ইহার কণাগুলি ৯ চিহ্নিত কেন্দ্রে সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহা জীবনী-শক্তিবর্দ্ধক শক্তিকণা। এই শক্তিকণা শরীরকে সুস্থ রাখে। এই শক্তিকণাগুলি আমাদের শরীরকে বহন করিয়া বেড়ায়। ইহা পীতবর্ণ শক্তিকণা।

'ং'কার জ্ঞান-শক্তি। জপকালে ইহার শক্তিকণাগুলি মস্তিষ্কের ৫ চিহ্নিত স্থানে জমা হইতে থাকে। ইহা শ্বেত বা স্ফটিকবর্ণ শক্তি-কণা। সমস্তগুলি ধ্বনি এই শক্তিতেই বিদ্যমান। ইহা অত্যন্ত জমাট কণা।

'ঃ' অব্যক্ত শক্তি। এই শক্তিকণাগুলি কৃষ্ণবর্ণ। জপকালে এই কণাগুলি মস্তিষ্কের ৬ চিহ্নিত কেন্দ্রে জমা হইতে থাকে। ইহা অনন্ত শক্তি। পুরুষাকার বলিতে এই শক্তিকেই বুঝিতে হইবে। এই শক্তিকণাগুলি সাধককে কর্তৃত্ব করিবার শক্তিপ্রদান করে। (কেহ যেন মনে করেন না যে কর্তৃত্ব করিবার শক্তি যখন ইহা প্রদান করে তখন ইহা সাধকের 'অহং' ভাব বর্দ্ধন করিবে। ইহা মোটেই গুরুত্ব বস্তু নহে। কর্ম্ম-শক্তিকে যিনি যত অনহং ভাবে স্থিত হইয়া কাজে লাগাইতে পারেন তিনি তত উন্নত-স্তরের কর্ম্মী হইয়া থাকেন।

মন্ত্র জপকালে মন্ত্রস্থিত বিভিন্ন অংশ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশকে শক্তিশালী করে। জপের সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রগুলিতে শক্তি জমিতে থাকে। সাধক সেই শক্তিগুলি বেশ অন্তরস্থ হইয়া ভোগ করিতেও থাকেন। সে সময় সাধকের খুব আরাম বোধ হইতে থাকে। মন্ত্রের যে শক্তি আছে এবং মন্ত্র-শক্তি যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে জমিয়া সাধককে শক্তিশালী করিতে থাকে ইহা কেবল কথারই কথা নহে। জপের পর বা কিছুক্ষণ জপ করিবার পরই প্রত্যেক সাধক ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। তাহার মস্তিষ্কে এবং শরীরে সে শক্তি-প্রবাহ ব্যাপ্ত হইতে থাকে। তাহাতে তাহার খুব আনন্দ এবং শান্তিবোধ হইতে থাকিবে। শক্তিপ্রবাহ যত ঘন আকারে আসিতে থাকিবে শরীর ও মন ততই হাল্‌কা বোধ হইতে থাকিবে। জপের পর সাধারণ লোকও তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন যে ইনি বেশী গম্ভীর নিশ্চিন্ত, শান্ত ও প্রেমী। সাধক যদি কর্ম্মী হন তবে তাঁহাকে বেশী তেজস্বী, শক্তিশালী, কর্ম্মনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান মনে হইবে। জপকালে যাঁহাদের অন্তরে শক্তি জমে না তাঁহাদের জপ ঠিক বিজ্ঞানে হইতেছে না বুঝিতে হইবে। যাঁহারা জপকালে মন্ত্র-শক্তির প্রভাব নিজেরা বুঝিতে পারেন না তাঁহাদেরও জপ ঠিক বৈজ্ঞানিক ভাবে হইতেছে না বুঝিতে হইবে। তাঁহারা কিছুদিন জলাশয় বা নদীতটে জলের খুব নিকটে বসিয়া জপ করিবেন। স্নানান্তে জপ করিলেও ফল খুব ভাল পাওয়া যায়। শিবপূজা করিয়া জপ করিলেও তাঁহারা বেশী উপকৃত হইবেন। মন্ত্র-শক্তি জলের আশ্রয়ে বেশী স্পষ্টভাবে খেলিতে থাকে।

জপের লক্ষ্য আমাদের কর্ম্ম এবং জ্ঞান-শক্তি বৃদ্ধি করা। কিরূপে দিন পর দিন জ্ঞান এবং কর্ম্ম-শক্তি বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে ইহা বুঝিয়া অগ্রসর হইতে হয় এবং ক্রমে উন্নত স্তরের চরিত্র আয়ত্ব করিতে হয়। জপদ্বারা উন্নত চরিত্র আয়ত্ব করিবার প্রবৃত্তি না থাকিলে ইহাদ্বারা

কুটীলতা ও ছলনা করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাই সাধকগণ এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন এবং সাবধান হইবেন।

জপের পর মন্ত্রযোগী সাধকের গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া সাধারণ লোকও বুঝিতে পারিবে লোকটী শক্তিশালী। পুরশ্চরণের সময় ঐ গাম্ভীর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং স্পষ্ট হয়। যাহা হউক অন্যকে জপশক্তি বুঝাই-বার চেষ্টা যেন মন্ত্রযোগীর লক্ষ্য না হয়। সাধক উহা নিজে বুঝিলেই হইল। বিদ্যুৎ শক্তি যখন কোন আধারে জমা করিয়া রাখা হয় তখন অনভিজ্ঞ লোক উহা দেখিয়া বুঝিতে পারে না বলিয়া আধারে বিদ্যুৎ-শক্তি নাই এরূপ প্রমাণ হয় না, বরং উহাতে তাহার অনভিজ্ঞতাই প্রমাণিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে অ, ই, উ, ঋ, ঌ, ং, ঃ প্রভৃতি ধ্বনিশক্তির কেন্দ্র বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ ইহারা অ, ই, উ, ঋ, ঌ প্রভৃতির দীর্ঘ মাত্রা। সুতরাং ধ্বনিশক্তি বিচারে হ্রস্ব, দীর্ঘে কোনই ভেদ হইবে না। 'এ' এবং ও'তে যথাক্রমে অ+ই এবং অ+উ আছে। ঐ এবং ঔতে যথাক্রমে অ+এ এবং অ+ও আছে। ইহাদের শক্তি কোন্ কেন্দ্রে যাইবে তাহা পাঠকগণ বুঝিতেই পারিবেন। পূর্ব্বে জপকে দুইভাবে করিবার কথা বলা হইয়াছে। একত ধ্বনি-বিজ্ঞানের জপ এবং অন্যটী শক্তি-বিজ্ঞানের জপ। ধ্বনি-বিজ্ঞানের জপ একটু উচ্চারণ করিয়া করিতে হয়। ইহাতেও সুষুম্নাপথে মন রাখিয়া জপ করিতে হয়। নচেৎ ফল কম হইবে। শক্তি-বিজ্ঞানের জপ সম্পূর্ণরূপে মানস-জপ। ইহাতে ওষ্ঠ তো নড়িবেই না, কণ্ঠ পর্য্যন্তও নড়িবে না। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত নাড়ী পথে একেবারে ডুবিয়া যাইয়া এইরূপ জপ করিতে হয়। শক্তি-বিজ্ঞানের জপে জপ-শক্তি শীঘ্র জমিতে থাকে।

পূর্ব্বে যে ভাবে মন্ত্র-শক্তির কেন্দ্র ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পাঠকগণ যে কোন মন্ত্রকে বুঝিয়া লইতে পারিবেন। পূর্ব্বে

লিখিত বীজমন্ত্রগুলির সামান্য বিচার করা যাইতেছে। মন্ত্র সম্বন্ধে বিচার করিয়া বুঝা খুবই অসম্ভব। ইহা জপ করিয়াই বুঝিতে হয়।

'ওঁ'কার জপে অ, উ, ঁ (ম) কেন্দ্র স্পন্দিত হয়। 'অ'কারে স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি, প্রেম, অনুসন্ধিৎসা, মেধা (মূর্ধা-স্তর পাঠ করুন) বাক্শক্তি প্রভৃতি কোমল দৈবশক্তির প্রতিষ্ঠা সাধকের অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে। 'উ'কার অত্যন্ত শান্তি এবং নিশ্চিন্ত অবস্থার কেন্দ্র। নির্জ্জন প্রিয়তা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, সংসারে অনাশক্তি (শির-স্তর পাঠ করুন) এই কেন্দ্র হইতেই আসিয়া থাকে। 'ঁ' (ম্) কারে জ্ঞান-কেন্দ্র। পূর্ণতা ইহার প্রধান গুণ। এই শক্তি অভাব বোধ হইতে দেয় না। 'ওঁ'কার জপে নিম্নস্তরের বা প্রাথমিক স্তরের সাধকগণের বিকাশের পথ সহজ হইবে না, কারণ ইহার ধ্বনি-সংস্থানে সবগুলি শক্তি কোমলতা, কারুণ্য, শান্তি এবং তৃপ্তিবর্দ্ধক শক্তিই বিদ্যমান। যাঁহার যে সামান্য বিকাশ আসিয়া গিয়াছে তাহাতেই যদি তাঁহার তৃপ্তি ও শান্তি আসিয়া যায় তবে উন্নত বিকাশ তাঁহার আসা অসম্ভব। এই জন্যই শুধু সেতু-প্রণবের জপ প্রাথমিক সাধকের অবলম্বন ঠিক হইবে না। ইহার সঙ্গে অন্য কোন তেজঃ এবং ত্যাগ-শক্তি-সম্পন্ন বীজমন্ত্র জপ করা প্রয়োজন। যাঁহারা সিদ্ধদশায় আসিয়া স্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য এই সেতু প্রণবই অবলম্বন হইয়া থাকে। সাধারণ সাধকগণ জীবনের একটা দীর্ঘ সময় বিভিন্ন শক্তি-মন্ত্র বিশেষ একনিষ্ঠ হইয়া আলোচনা করিয়া লইবেন। ৩ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ নিয়মনিষ্ঠ হইয়া বহু বীজমন্ত্রের পুরশ্চরণ করা প্রয়োজন। সাধারণ সাধকদের মধ্যে যাঁহারা ওঁকার জপ করিবেন তাঁহারা খুব পবিত্রভাবে বৈদিক আচারে থাকিবেন। পবিত্রভাবে না থাকিলে প্রণব জপের ফল কম হইয়া থাকে। ছাত্র জীবনে স্নানান্তে প্রণব-জপ মেধা ও স্মৃতি-শক্তি বৃদ্ধি করে।

সিদ্ধ সাধকগণের নজর রাখিতে হয় যাহাতে ক্রম-বিকাশের স্তর-গুলির বৈষম্য অবস্থা না আসিয়া যায়। প্রত্যেক স্তরের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং জ্ঞান-শক্তিগুলি যাহাতে স্বভাবতঃই যথাযথ নিয়মে চলিতে থাকে এরূপ ব্যবস্থা স্থির রাখিবার জন্য প্রণবের অবলম্বন করিতে হয়। অস্বাভাবিক কর্ম্মবেগ, অস্বাভাবিক ত্যাগের বেগ এবং অস্বাভাবিক শান্তি, স্নেহশীলতা ও সমাজপ্রিয়তা যাহাতে সাধকে না আসিয়া যায় এরূপ নিয়মে সাধকগণকে অবস্থান করিতে হয়। সিদ্ধ সাধকগণ কর্ম্মহীন, শান্তিহীন, ত্যাগহীন, স্নেহহীন এবং সমাজ-বিদ্বেষী হইবেন না ; আবার এই সবের কোনটাতেই মুগ্ধ থাকিবেন না। কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি, শান্তিশক্তি, ত্যাগশক্তি, সুখশক্তি, স্নেহশক্তি এবং প্রাণশক্তি (শারীরিক বল) পূর্ণভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষে থাকিবে, কিন্তু দুর্ব্বলতা কোন স্তরেরই তাঁহাতে থাকিবে না। 'ওঁকার' মন্ত্রের এক অদ্ভূত ক্ষমতা এই যে মস্তিষ্কের কেন্দ্র-শক্তিগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রাখে। শক্তি-প্রণবগুলি ওরূপ নহে ; উহারা শক্তি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। জ্ঞানলাভের জন্য বা বিভিন্ন স্তরের দুর্ব্বলতার গ্রন্থিগুলি ছিন্ন করিবার জন্য শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। শক্তি-স্তরে প্রতিষ্ঠালাভ হইয়া যাওয়ার পর শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। প্রণবজপে উহা সাধিত হইয়া থাকে।

'ঐঁ' বীজে অ(অ+ই)+ঁ এই চারিটী ধ্বনি আছে। ইহা সরস্বতীর বীজমন্ত্র। ইহাকে গুরুবীজও বলা যায়। এই বীজমন্ত্র সাধকের জড়তা নষ্ট করে। 'অ'কার আশ্রয়ে সূর্য্য-কেন্দ্র অবস্থিত, সুতরাং কেন্দ্রস্থিত সমস্ত শক্তিই ইহাতে আছে। 'ই'কারের আশ্রয়ে গণেশ-কেন্দ্র অবস্থিত সুতরাং ইহাতে ত্যাগ, বিকাশমুখীগতি, সূক্ষ্ম ও নিষ্পক্ষ-বিচার এবং কোন কলকজ্জার অন্তর্নিহিত কর্ম্ম-রহস্য-জ্ঞান এই শক্তি হইতে আসিয়া থাকে। ঁ(নাদ) জ্ঞান-শক্তি। পূর্ণতাই এই শক্তির দান ; ইহা সাধককে পূর্ণ-শক্তি দান করে।

গুরুচরিত্র যাঁহারা বুঝিতে চাহেন তাঁহারা এই বীজমন্ত্রে তাহা বুঝিতে পারিবেন। গুরু একাধারে সূর্য্যের ন্যায় স্নেহশীল, গণেশের ন্যায় ত্যাগী, নিষ্পক্ষ-বিচারে অভ্যস্ত এবং জ্ঞানে শিবতুল্য পূর্ণ ও তৃপ্ত। গুরুতে এসব শক্তির বিকাশ না থাকিলে সমাজে নানারূপ গোলমাল আসিয়া যায়।

ধ্বনি-বিজ্ঞানে 'ঐঁ'কার জপ করিতে হইলে আদ্যে 'অ' মধ্যে 'এ' (অ+ই) এবং অন্তে 'ঁ' রাখিয়া জপ করিতে হইবে। ঐঁ বীজে সংস্থিত শক্তিগুলি সংক্ষেপে—প্রেমশক্তি+(প্রেম-শক্তি+ত্যাগ-শক্তি +জ্ঞান-শক্তি।

'হ্রীঁ' বীজমন্ত্রে 'ঃ+ঋ+ঈ+ঁ' এই চারিটী ধ্বনি আছে। 'ঃ' অব্যক্ত শক্তি। ইহা কর্ত্তৃত্ব-শক্তি দান করে; ইহা সাধককে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় লইয়া যাইতে সাহায্য করে। 'ঋ'কার কর্ম্ম-শক্তি তেজঃ-শক্তি। মানুস যেখানে সুখসম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া থাকিতে চায়। এই তেজঃ-শক্তি সেইখানেই নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া সেই জমাট সুখটুকুকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তিক্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করে। 'ঋ'কার অন্তঃকরণের জড়তার জমাট অবস্থাকে নিজের অগ্নি-শক্তিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে। 'ঈ'কার ইহার সহিত মিলিত হইয়া সাধককে উন্নত স্তরে লইয়া যায়। 'ঈ'কার জ্ঞান-মুখী এবং ভোগ-বিরোধী শক্তি ('ঐঁ' বীজে ঈকার সম্বন্ধে দেখুন)। 'ঁ'(নাদ) জ্ঞান-শক্তি। এই শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুস্থানে বলা হইয়াছে, মিলাইয়া বুঝিয়া লইবেন।

"হ্রীঁ" বীজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীজমন্ত্র বলা যায়। ইহাকে মহাশক্তি, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী, বালা, ভৈরবী, ত্রিপুরা ইত্যাদি বহু নামে পরিচয় করান যায়। ইহা এমন একটী বীজমন্ত্র যাহা দ্বারা যে কোন দেবতার উপাসনা করা যায়। দুর্গা, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, তারা প্রভৃতি বহু দেবতার পূজা শুধু এই একটী বীজমন্ত্রে চলিতে পারে।

ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আগে 'হ্ব' (ঃ+ম্ব) মধ্যে 'ঈ', অন্তে 'ঁ' রাখিয়া জপ করিতে হইবে। ইহা শক্তি-প্রণব। শক্তি-বিজ্ঞানে জপ করাই বেশী সুবিধাজনক। এই বীজস্থিত শক্তিগুলি সংক্ষেপে —কর্তৃত্ব-শক্তি+তেজঃশক্তি+ত্যাগ-শক্তি+জ্ঞান-শক্তি।

'ক্লীঁ' বীজে 'ক্+ল+ঈ+ঁ' এই চারিটী ধ্বনি আছে। 'ক্'তে বহু ধ্বনির কিছু কিছু মিশ্রন আছে ; উহারা ঃ+(অ+ঁ+ম)। বিস্তারিত ক কারাদি বর্গীয় বর্ণ উৎপত্তি অংশে দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। ইহাকে আমরা কর্তৃত্ব-শক্তি (ঃ) এবং প্রেম-শক্তি (ম)। এই দুইটী শক্তির বিশেষ সংস্থান মানিয়া লইলাম। এখানে একথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে বহু ধ্বনি মিশ্রিত ধ্বনি খুব শক্তিশালী হইয়া থাকে। 'ল' প্রাণ-শক্তি। ইহা জীবনী-শক্তি। ইহা যৌন সম্বন্ধে ভোগ-শক্তি ও বুঝা যায়। 'ঈ' ত্যাগ-শক্তি। "ঁ "জ্ঞান-শক্তি।

'ক্লীং' বীজকে কামবীজ বলে। ইহা মহাকালীর বীজমন্ত্র। ইহাকে 'কৃষ্ণবীজও' বলে। ইহা প্রাথমিক দীক্ষার মন্ত্র না হইলেই ভাল হয়, কারণ এই বীজমন্ত্রে 'হ্ম'কার বা তেজের অংশ না থাকার দরুণ প্রাথমিক সাধকগণের সাধনার পথে ইহা বেশী শক্তিদায়ক হইবে না। 'হ্ম'কারের শক্তি-সংস্থান আছে এমন বীজমন্ত্রগুলি শীঘ্র চৈতন্ত হয়। 'ল'কার সংযুক্ত বীজমন্ত্রগুলি শীঘ্র চৈতন্ত হয় না। 'ক্লীঁ' বীজমন্ত্রে তেজঃ অংশ না থাকিবার দরুণ এই মন্ত্রের সাধকগণ প্রায়ই অগ্রসর হইতে চাহেন না প্রাথমিক দীক্ষার সময় এই বীজমন্ত্রের দীক্ষা না লইয়া অন্য কোন 'হ্ম'কার শক্তি-সমন্বিত বীজের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐ মন্ত্রের পুরশ্চরন করিবার পর এই বীজের সাধনা করা ভাল। তেজঃশক্তি সমন্বিত বীজমন্ত্রগুলিতে জ্যোতি এবং প্রকাশ-শক্তি থাকার দরুণ সেই মন্ত্রগুলি শীঘ্র চৈতন্ত হইয়া সাধকগণকে অনুভূতির পথে শীঘ্র অগ্রসর করিয়া দিতে

সাহায্য করে। ইহা শক্তি-প্রণব। ইহাকে ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে 'ক৯' (ক্+৯), মধ্যে 'ঈ' এবং অন্তে 'ঁ' রাখিয়া জপ করিতে হইবে। এই বীজস্থিত শক্তিগুলি সংক্ষেপে—স্নেহ-শক্তিযুক্ত কর্তৃত্ব-শক্তি +ভোগ বা প্রাণ-শক্তি+ ত্যাগ-শক্তি+জ্ঞান-শক্তি।

'ক্রীঁ' বীজে ক্+ঋ+ঈ+ঁ এই চারিটী ধ্বনি আছে। এই বীজটী দক্ষিণাকালিকার বীজমন্ত্র। 'ক্লীঁ' বীজে এবং 'ক্রীঁ' বীজে '৯' ও 'ঋ'এর মাত্র ভেদ বিদ্যমান। পাঠকগণ পূর্ব্বের আলোচিত বিভিন্ন অংশ পাঠ করিয়া এই বীজকে বুঝিয়া লইবেন। ইহা শক্তি-প্রণব। ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে 'ক' (ক্+ঋ), মধ্যে 'ঈ' এবং অন্তে 'ঁ' রাখিয়া জপ করিতে হইবে। এই বীজস্থিত শক্তিগুলি সংক্ষেপে—স্নেহ-শক্তিযুক্ত কর্তৃত্ব-শক্তি+কর্ম্মশক্তি+ত্যাগ-শক্তি+জ্ঞান-শক্তি।

'শ্রীঁ' বীজে 'শ+ঋ+ঈ+ঁ' এই চারিটী ধ্বনি আছে। "শ" ':' বা কর্তৃত্ব শক্তির রাজস্ প্রকৃতি অর্থাৎ 'শ' ধ্বনি ':' ধ্বনিরই রাজস্ প্রকৃতি। ধ্বনি জগতের সৃষ্টিতে ':'ই পুরুষ। এখানে পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে শক্তি-স্তরের বিচারে ':' কর্তৃত্ব-শক্তি কিন্তু ধ্বনি-জগতের বিচারে ':' ধ্বনি-জগতের পুরুষ। এই পুরুষের—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ ভেদে তিনটী প্রকৃতিভাব আছে। ইহাদের মধ্যে 'শ'টী রাজস্-প্রকৃতি। বিস্তারিত ব্যঞ্জন বর্ণ উৎপত্তি অংশে বলা হইবে। ':' এর যেখানে পুরুষভাব সেখানে কর্তৃত্ব-শক্তির উন্নত বিকাশ-বেগ বুঝিতে হইবে। ':'এর যেখানে প্রকৃতি-ভাব সেখানে কর্তৃত্ব শক্তির ভোগবদ্ধভাব বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ ভোগে বদ্ধ হইয়া কর্তৃত্বভাব জানিতে হইবে। ':'এ এবং 'শ'এ এইমাত্র ভেদ যে ':' উন্নত বিকাশমুখী গতিসম্পন্ন বেগ প্রদান করে; আর 'শ' ধ্বনি সাধককে ভোগে বদ্ধ রাখিয়া কর্তৃত্ব করিবার শক্তিদান করে।

'শ্রীঁ' মহালক্ষ্মীর বীজমন্ত্র। ইহা ধনদাত্রী বীজমন্ত্র. ইহার জপকালে সাধকের মনে খুব আরাম বোধ হয় এবং শরীরে খুব লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। ইহা শক্তি-প্রণব। ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে ইহার আদিতে 'শৃ' (শ্+ঋ), মধ্যে 'ঈ' এবং অন্তে 'ঁ' বুঝিতে হইবে। ইহাতে শক্তি-সংস্থান সংক্ষেপে—ভোগবদ্ধ কর্তৃত্ব-শক্তি+কর্ম্ম-শক্তি+ত্যাগ-শক্তি+জ্ঞান-শক্তি।

'হ্লীঁ' বীজে ঃ+৯+ঈ+ঁ এই চারিটী ধ্বনি আছে। ইহার প্রত্যেকটী ধ্বনি সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ইহা আহ্লাদিণী বা আনন্দদায়িনী বীজমন্ত্র। 'ক্লীঁ' বীজের মত ইহাও ভোগের বেগ-সম্পন্ন বীজমন্ত্র। এই বীজস্থিত শক্তিগুলি সংক্ষেপে—কর্ত্তৃত্ব-শক্তি+ভোগ-শক্তি+ত্যাগ শক্তি+জ্ঞান-শক্তি।

'হ্লী' বীজও আহ্লাদিণী বীজ। ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক 'মহম্মদ' বোধ হয় এই হ্ল বীজেরই উপাসক ছিলেন। 'হ্লা' বীজই দেশ ভেদে উচ্চারণ ভেদ হইয়া 'অল্লহ' হইয়া গিয়াছে। তাহা যাহাই হউক না কেন ধ্বনির সহিত শক্তি সংস্থান থাকিবেই মূর্ত্তি এবং লীলাসংস্কার জড়িত না থাকিলে ধ্বনি-শক্তি নিজের পূর্ণশক্তির বিকাশ প্রকটিত করিয়া থাকে। 'ইস্‌লাম' মত কোন মূর্ত্তি বা লীলাপ্রধান ধর্ম্মের সমর্থক নহে কাজেই এই ধ্বনি-শক্তি পূর্ণভাবে শক্তিদান করিতে সমর্থ। 'অল্লহ্'তে 'অ+৯+৯+অ+ঃ' এই পাঁচটী ধ্বনি বিদ্যমান। এই বীজস্থিত শক্তিগুলি সংক্ষেপে প্রেম-শক্তি+ভোগ-শক্তি (বা প্রাণ-শক্তি)+ভোগ শক্তি (বা প্রাণ-শক্তি)+প্রেম-শক্তি+কর্ত্তৃত্ব-শক্তি।' হ্লীঁ' 'হ্লা' বা 'অল্লহ' প্রভৃতি বীজমন্ত্র শক্তি-প্রণবের অন্তর্গত; সুতরাং ইহাদিগকে শক্তি-বিজ্ঞানে জপ করাই ভাল। "হ্লীঁ"কে ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে 'হ্ল' (ঃ+৯),মধ্যে 'ঈ' ও অন্তে 'ঃ' রাখিতে হইবে। 'অল্লহঃ' কে ধ্বনি-বিজ্ঞাতে জপ করিতে হইলে আদ্যে 'অ৯' (অ+ল্), মধ্যে 'ল' (৯+অ) এবং অন্তে 'ঃ' (হ্) রাখিয়া জপ করিতে হইবে।

"হূঁ" বীজে ':+উ+ঁ' এই তিনটী ধ্বনি আছে। ':' কর্তৃত্ব-শক্তি 'উ' শান্তি-শক্তি এবং 'ঁ' জ্ঞান-শক্তি। পাঠকগণ মস্তিষ্ক-কেন্দ্র চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে এই বীজমন্ত্রে মনোময় কোষস্থিত কোন কেন্দ্রই স্পন্দিত হয় না। এই বীজমন্ত্রটী যেন কেবল জ্ঞান এবং শান্তির জন্যই সমস্ত পুরুষাকার নিয়োজিত করিতে যত্নশীল। তান্ত্রিক সাধনায় ইহা 'তারা' বীজের অন্তর্গত বীজমন্ত্র। ইহা নীল সরস্বতীর বীজমন্ত্র। এই বীজমন্ত্রটী বৌদ্ধ সাধকগণের মধ্যে বেশী প্রচলিত। ইহা কর্তৃত্ব-শক্তি, শান্তি ও জ্ঞানশক্তিবর্দ্ধক বীজমন্ত্র। ইহা শক্তি-বীজ। ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে (:+উ), মধ্যে উ ও অন্তে ঁ।

"হৌঁ" বীজে :+অ+উ+ঁ এই চারিটী ধ্বনি আছে। এই বীজটীতে ওঁকারের পূর্ব্বে ':'টী মাত্র বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ':' কর্তৃত্ব-শক্তি প্রদানকারী শক্তি। ওঁকারের পূর্ব্বে এই :কে স্থাপনা করিয়া ওঁকারের শক্তিকে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহা পুরুষ-বীজ বা শিব-বীজ। ইহা কর্তৃত্ব, মেধা, শান্তি ও জ্ঞানবর্দ্ধক বীজমন্ত্র। ধ্বনি-বিজ্ঞানে জপ করিতে হইলে আদ্যে হ(:+অ), মধ্যে অন্তে ঁ রাখিয়া জপ করিতে হইবে। ইহাও শক্তি-প্রণব।

ইহা ভিন্ন বহুপ্রকার বীজমন্ত্র আছে। অ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষ পর্য্যন্ত যতগুলি মৌলিক এবং মিশ্রিত ধ্বনি আছে, সবই বীজমন্ত্র। মস্তিষ্ক-কেন্দ্র ভাগ করিয়া লইয়া পাঠকগণ মন্ত্র-শক্তিকে মোটামুটী বুঝিয়া লইতে পারিবেন। বীজমন্ত্র জপ না করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায় না। উন্নত সাধকদের মধ্যে বহু বীজমন্ত্রের উপাসনা হইয়া থাকে, কিন্তু বর্তমান সময় আর্য্য সমাজে এরূপ নীতি স্থির হইয়া গিয়াছে যে কেহই সমস্ত জীবনে একটি বীজমন্ত্রের উপর আর কোন বীজমন্ত্রের সাধনা করেন না। সাধনা সম্বন্ধেও বর্তমান সমাজ অত্যন্ত বদ্ধভাব ধারণ করিয়াছে। যখন একটা সমাজ নিজের প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাভাবিক

স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে তখন তাহাদেব কোন কাজেই আর স্বাধীনতা ফুটিতে চাহে না। শিক্ষায়, দীক্ষায় চালচলনে বদ্ধভাবই ইহাদের বেশী প্রিয় হইয়া থাকে। তান্ত্রিক মন্ত্রাদি সম্বন্ধে মোটামুটী বলা হইল, তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি শক্তি-স্তরের মন্ত্র। ভারতের অতীত গৌরবের দিনে প্রত্যেক রাজা এবং প্রত্যেক ঋষি তান্ত্রিক মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। যাঁহারা ভারতের গৌরবের সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন তাঁহারা ভাবপ্রবনতা ও বাজে কল্পনা ত্যাগ করিয়া বীজমন্ত্রের অনুশীলনসহ যদি কর্ম্ম করেন তবে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে।

তান্ত্রিক মন্ত্র ভিন্ন বৈদিক, পৌরানিক এবং লৌকিক মন্ত্রের প্রচলন সমাজে আছে। ঐ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। বৈদিক মন্ত্রগুলি সাধরণতঃ শিব-স্তরের মন্ত্র। বৈদিক মন্ত্রে বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ এবং মনের স্তরের মন্ত্রও আছে। তাহা হইলেও বৈদিব মন্ত্রাবলম্বনে শান্তি ও জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যই বেশী প্রস্ফুটিত। বেদগান করুন বা শ্রবণ করুন, আপনি উহার কোন অর্থ বুঝিতে পারুন বা নাই পারুন আপনার অন্তঃকরণে বৈদিক যুগের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতির সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাইবেন। আবার তান্ত্রিক মন্ত্র বহুলতাপূর্ণ কালী বা দুর্গাপূজার মন্ত্রগুলি (কালী দুর্গাদি পূজা বৈদিক এবং পৌরানিক মন্ত্রও অনেক আছে) শ্রবণ করুন, দেখিবে যুদ্ধের এবং কর্ম্মের কেমন অস্ফুট প্রবাহ-বেগ আপনার মনে উৎপ হইয়া চলিয়াছে।

সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার গায়ত্রী; এবং এই গায়ত্রীর সার ওঁকার ওঁকার প্রথম আবিষ্কৃত সেতু মন্ত্র। এই সেতু ধরিয়াই অন্যান্য ধ্বনি বীজমন্ত্রগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম যুগে যে সব ঋষি সৃষ্টিত জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা নিজের অন্তরে সৃষ্টির মূ খুঁজিতে যাইয়া শরীর-যন্ত্রের মধ্যে সমস্ত শক্তির ক্রিয়াকলাপজনিত (

ধ্বনি উঠিতেছে উহা প্রথম শ্রবণ করিতে পান। এই ধ্বনিই 'ওঁ'কার। এই ধ্বনির আদ্য, মধ্য এবং অন্ত মিলাইয়া সাধারণ নাদ বা ধ্বনি 'ওঁ'কার ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কোনস্থানে বহুধ্বনির উত্থানে দূর হইতে এই প্রণব-ধ্বনিই শ্রুত হইয়া থাকে। ঋষিদের ধ্বনি-বিজ্ঞান, শক্তি-বিজ্ঞান এবং অন্তঃকরণের সর্ব্ববিধ রহস্য জানিবার জন্য একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল এই ধ্বনি বা প্রণব। এই ধ্বনি ধরিয়াই তাঁহারা জগৎ-তত্ত্ব' জীব-তত্ত্ব এবং আত্ম-তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন।

অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ৫০টি ধ্বনিই তান্ত্রিক মন্ত্র। এই ধ্বনিগুলির মধ্যে অ, ই, উ, ঋ, ৯, ং, ঃ এই ৭টি মৌলিক ও অনাদি, আর সবগুলিই যৌগিক। বেদে এই ধ্বনিগুলির মর্ম্মার্থ মাত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু ফুটিয়াছে সবই অনাদি শক্তির সংযোগ বিয়োগ এবং মিশ্রনের ফল। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদি শক্তির বিবর্ত্তন মাত্র। এই সৃষ্টি থাকিলেও অনাদি-শক্তি সদাই বিদ্যমান থাকে; আবার এই সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার উপাদানভূত সমস্ত উপাদানই অনাদি শক্তিরূপে পরিণত হইবে। এই অনাদি-শক্তি সম্বন্ধে ঋষিগণের যে অস্ফুট জ্ঞান উহাই বেদ।

আমাদের চক্ষের সাম্নে শক্তি-জগতের কত কি শক্তির খেলা হইয়া চলিয়াছে। ইহারই মধ্যে যাঁহার চক্ষু ফুটিয়া গিয়াছে তিনিই কত কি জ্ঞান, বিজ্ঞান, রীতি, নীতির জন্মদাতা হইয়া যাইতেছেন। প্রথমে বোধক্ষেত্রেই শক্তির সংযোগ বিয়োগজনিত কোন অস্ফুই বোধ তাঁহার অন্তরে জাগে; পরবর্ত্তীকালে তিনি বা অন্য কেহ যাহা আবিষ্কার করেন তাহার মূলে ঐ বোধই অবস্থিত। এই বোধই বেদ বলিয়া জানিতে হইবে। যুগে যুগে এরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার জীবজগতে হইয়া চলিয়াছে। শক্তিজগতের সংযোগ বিয়োগজনিত অস্ফুট বোধকে ধরিয়াই ঋষিগণ গবেষণা করেন এবং তাহাতেই সমাজে নূতন সৃষ্টির

সূত্রপাত হয়। তুমি এই বিশ্বজগতের গতি ধরিয়াই যদি কোন বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া থাক তাহাও এই স্থূল জগতের ক্রিয়াজনিত উত্থিত শক্তির সূক্ষ্ম পরিণতির গতি ধরিয়াই করিয়া থাকিবে। অর্থাৎ শক্তির গতিতেই বোধ জগতে বেদের (জ্ঞানের) প্রথম উৎপত্তি হয়, আবার ঐবোধ ধরিয়াই নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। যাঁহারা শক্তি-সাধক তাঁহারা জানেন অনাদি শক্তিতেই এই সৃষ্টির উপাদান শক্তিরূপে অবস্থিত। মানুষের অনুভূতিতে যখন ঐ শক্তির ক্রিয়াজনিত অস্ফুট বোধ হয়, ঐ বোধ হইতেই কত কি সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া যায়। ঐ বোধই বেদ, ঐ বোধের মূলে যে শক্তি নিহিত আছে ঐ শক্তির সন্ধান যাহাতে পাওয়া যায় উহাই তন্ত্র। অনাদি শক্তি সবযুগেই একরূপ; তাই তন্ত্রকে সবযুগে একরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু বেদ এক এক যুগে এক এক ঋষির নিকট এক এক রূপে আসিতেছে। বোধের তারতম্যে, বিচারের তারতম্যে অনাদি শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া এক এক যুগে এক এক প্রকারের জ্ঞানের উপাদান রূপে আবির্ভূত হইতেছে। শক্তিস্তব এবং শক্তি-মন্ত্র, বেদের স্তব এবং বৈদিক মন্ত্রের উহাই ভেদ। বোধই বেদ, আর বোধের মূলে অনাদি শক্তির যে গতি বিদ্যমান ঐ গতিই 'তন্ত্র'। শক্তি সব যুগেই একরূপ। বেদ এক এক যুগে এক এক ঋষির নিকট এক এক রূপে আসিতেছে। বোধের তারতম্যে বিচারের তারতম্যে একই শক্তি হইতে এক এক যুগে এক এক প্রকার সৃষ্টি চলিয়াছে। শক্তি-স্তব এবং শক্তি-মন্ত্র এবং বেদের স্তব ও বৈদিক মন্ত্রের ইহাই ভেদ। তাই বলিতেছিলাম, বীজমন্ত্রের ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না।

শক্তি, গতি এবং সৃষ্টির সূক্ষ্মতম উপাদান একই বস্তু। এই জীব, এই জগৎ, এই জীবস্থিত বিচিত্র শক্তির লীলা এবং এই জগৎস্থিত বিভিন্ন শক্তির খেলা অর্থাৎ লৌকিক অলৌকিক যত প্রকারের শক্তি

আছে সকলই সেই মূল উপাদান-ভূত অনাদি শক্তিরই খেলা। আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, রীতি, নীতি, শিল্প, কলা যাহা কিছু সবই ঐ শক্তিরই বিভিন্নপ্রকার পরিণতি। আমাদের স্বরূপের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তুরীয় সমস্তগুলি স্তরই এই সব শক্তিকণার বিভিন্ন প্রকার পরিণতি। আমরা যখন আমাদের অন্তর্বিকাশের এই সব ক্রমোন্নত ধারাকে জানিতে জানিতে শেষ স্তরে দাঁড়াই তখন আমরাও ইহা বুঝিতে পারি যে, এই যে শক্তিকণা ইহারা এবং আমাদের আত্মার শেষ পরিণতি বিশুদ্ধ চৈতন্য বস্তুতঃ একই। সেই স্তরে স্থিত হইয়া ঋষি আনন্দে গাহিয়াছিলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। বিশ্বের সমস্ত বস্তু একই বস্তুর পরিণতি। এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। সে সব জানিতে পারিলে পাঠকগণ একথা বুঝিতে পারিবেন যে কোন দর্শনকারই ভুল বলেন নাই। বিকাশের স্তর অনুসারে সকলের দর্শনই ঠিক।

মূলে যে সব বস্তুর উপাদান নাই তাহা কখনও আমাদের মধ্যে শক্তিরূপে আসিতে পারে না। আমাদের যে সব শক্তি আছে উহা যে সৃষ্টির মূলে বিদ্যমান ইহা মানিতেই হইবে। মূলে যে সবের উপাদান নাই সৃষ্টিতে উহা প্রস্ফুটিত হইতেই পারে না। ক্রম-বিকাশের প্রগতিতে আমাদের জ্ঞান এবং কর্ম্ম-শক্তি মূলের জ্ঞান এবং কর্ম্মধারাকে জগতে ক্রমই নিখুঁতভাবে মূর্ত্ত করিতে সাহায্য করিবে। বেদ ঋষি আবিষ্কার সর্ব্ববিধ লৌকিক, অলৌকিক, রীতি, নীতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংগ্রহ গ্রন্থ মাত্র। ঐ সব জ্ঞান বিজ্ঞানেরও সমস্ত উপাদান শক্তিরূপে সব যুগেই বিদ্যমান। বোধের মধ্যে যখন ঐ সব শক্তির অস্পষ্ট ক্রিয়া ধরা পড়ে তখনই উহা বেদরূপে আসিয়া যায়। সব যুগেই শক্তি-জগতের বহু ক্রিয়ারাশি মানুষের বোধগম্য হইয়া জগতে প্রচলিত হইয়া চলিয়াছে। যিনি এই বোধের বোদ্ধা তিনিই ঋষি। প্রথম যুগে এই ঋষিস্তরের মানুষের সংখ্যা অধিক ছিল, আর উহাই বৈদিক যুগ। মানুষের সভ্যতার

সর্ব্ববিধ উপাদান বেদে স্থান পাইয়াছে। মানুষের সভ্যতার সর্ব্ববিধ উপাদান শক্তিরূপে সব যুগে শক্তিভাণ্ডারে বিদ্যমান আছে। যতক্ষণ শক্তিরূপে ততক্ষণ উহা তন্ত্র। যখন উহা মানুষের বোধের অধীন হয় তখন উহা বেদ। এই বেদকে সামনে রাখিয়াই স্মৃতি, পুরান, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রীতি নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বৈদিক মন্ত্রগুলিকে অবলম্বন করিলে সাধকের বিকাশ শিবের স্তর পর্য্যন্ত আসিবে। যাঁহাদের লক্ষ্য শক্তিস্তর তাঁহারা তান্ত্রিক মন্ত্র অবলম্বন করিবেন। পৌরাণিক মন্ত্রের শক্তি খুবই কম। উহা ভক্তিস্তরের মন্ত্র মাত্র। 'নারায়ণায় নমঃ', 'গণেশায় নমঃ' ইত্যাদি রূপেই ইহাদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র মাত্রই অ, আ, ই ইত্যাদি উপাদানে গঠিত। কিন্তু ধ্বনির সঙ্গে ভাব জগতের ছাপ থাকিবার দরুণ পৌরাণিক মন্ত্রদ্বারা ধ্বনি বা শক্তি-স্তর বিবর্ত্তিত হইতে সাহায্য না করিয়া আমাদের অন্তরে কেবল ভাবই খেলিতে থাকে। এই ভাবের মধ্য দিয়াও শক্তি-স্তরে যাওয়া যায়, কিন্তু সে পথ সহজ হয় না। পৌরাণিক মন্ত্রগুলি ভাবোদ্দীপক মন্ত্র ; উহা দ্বারা ভক্তিভাব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শক্তির উদ্দীপন হয় না। একমাত্র বেদ এবং তন্ত্রোক্ত সাধনার ভিত্তি ভিন্ন যত প্রকারের সম্প্রদায় আছে সকলেরই মন্ত্রগুলি পৌরানিক বা লৌকিক মন্ত্র মাত্র। তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি সব চেয়ে উন্নত স্তরের। ইহার পর বৈদিক মন্ত্রের স্থান। বৈদিক মন্ত্রের পর পৌরানিক মন্ত্র। লৌকিক মন্ত্রের শক্তি খুবই কম। ইহা কতকটা "আয় ছাগ্‌লী পাতা খা, পাতা খেয়ে স্বর্গে যা"র মত। যাহাদের ধর্ম্ম কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে, যাহাদের ধর্ম্ম কতকটা লৌকিক কল্পনার উপাদানে সজ্জিত তাহাদের মন্ত্রগুলি লৌকিক মন্ত্রেই পূর্ণ। ভূত প্রেত উপাসকদের মধ্যেও লৌকিক মন্ত্রের প্রচলন বেশী। এখনকার দিনে নবীন উদ্গত বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ই লৌকিব মন্ত্রে বেশী ঝুঁকিয়া

পড়িয়াছেন। ইহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ইহার প্রতিকার- 'বৈজ্ঞানিক আলোচনাটা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া'। বৈজ্ঞানিক আলোচনা বৃদ্ধি হইলে কাল্পনিক বাদ ও ভাববাদের ভিত্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়। যাঁহাদের লক্ষ্য শক্তি-স্তর তাঁহারা বৈজ্ঞানিক আলোচনা খুব ক'রবেন।

তন্ত্র, বেদ এবং পুরাণে সাধারণতঃ কেবল মাত্র স্তরের ভেদ দেখা যায়। যে বস্তু শক্তি-স্তরে 'তন্ত্র', সেই বস্তুকেই শিব-স্তরের আলোতে দেখিলে বেদ হয়। আবার তন্ত্রকে (শক্তিকে) লৌকিক গল্পাকারে সাজাইয়া প্রচার করিলে উহাই পুরাণরূপে পরিণত হয়। আমরা শক্তি-স্তরের লক্ষ্যটাকে জ্ঞানে ও কর্ম্মে ফুটাইয়া তুলিতে চাই। বিভিন্ন স্তরের শক্তি-বিজ্ঞানকেই বিভিন্ন পুরাণে গল্পাকারে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। 'ক্রীং' বীজই পৌরানিক মন্ত্রে 'কালী'। 'হ্রীঁ' বীজই পৌরাণিক মন্ত্রে 'হরি'। তন্ত্রের দৃষ্টিতে যাহা 'শক্তি' পৌরাণিক দৃষ্টিতে উহাকেই 'নামরূপে' স্থান দেওয়া হইয়াছে। পৌরানিকগণ বীজকেই 'নামে' পরিণত করিয়াছেন তাই তাঁহারা জপ করাকে 'নাম করা' বলেন। একটা বীজকে বিভিন্ন শক্তির সংস্থানরূপে শক্তিবাদী স্থির করিয়াছেন। আবার পৌরাণিকগণ তাহাকেই মূর্ত্তিরূপে আঁকিয়াছেন। শক্তিবাদী বৈজ্ঞানিকভাবে জপ করিয়া সেই বীজমন্ত্রস্থিত শক্তি আয়ত্ত করেন। পৌরাণিকগণ (ভক্তিবাদীগণ) সেই নাম ও রূপের কল্পনা করিয়া ভক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। শক্তিবাদীর দৃষ্টিতে যাহা শক্তি ভক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহাই মূর্ত্তিরূপে স্থান পাইয়াছে। একজন শক্তি-স্তরকে লক্ষ্য করেন, অন্যজন সূর্য্য-স্তরের লক্ষ্যে পঙ্গু হইয়া অবস্থান করেন। কেহ বা সূর্য্য-লক্ষ্যের মধ্য দিয়াও অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন, আবার কেহ নামে শক্তিবাদী হইয়া বাক্‌চাতুর্য্যের আড়ালে ভণ্ডামী করেন।

এতো পৌরানিকবাদের কথা। এবার আমরা আরও নিম্ন-স্তরের সাধনার কথা বলিব। ইঁহারা মনের মত দুইচারটা কল্পনার কথা ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করার পক্ষপাতী। মানব-সমাজে এরূপ ধর্ম্মেরও স্থান আছে। ঈশ্বরও তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের কল্পনারই উপাদানে প্রস্তুত কোন নিরাকার বা সকার ব্রহ্ম হইবেন। ইঁহাদের ধর্ম্মেরও কোন দার্শনিক ভিত্তি নাই। ইঁহারা 'এই লও তোমার কাম, এই লও তোমার ক্রোধ' ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেদের বৃত্তিগুলি প্রদান করেন। তাঁহারা যাহা ঈশ্বরকে দেন তাহাই তাঁহারা বিপুলভাবে লাভ করিয়া ভোগ-জগতে মহানন্দে বিচরণ করেন। এসম্বন্ধে আমাদের আর কিছুই বলিবার নাই। কেবল উন্নত লক্ষ্যে কর্ম্মিগণ যাহাতে ঐসব খেলনা খেলার ঝোঁকে না পড়িয়া যান এজন্য ইহার সামান্য আলোচনা করা হইল। যাঁহারা প্রকৃতই উন্নতি করিতে চাহেন তাঁহারা বিভিন্নস্তরে মানুষের চরিত্র কিরূপ হয় তাহা বুঝিতে চেষ্টা করুন এবং কোন শক্তিশালী বীজমন্ত্র বাছিয়া লইয়া উহা জপ করিতে থাকুন। শক্তিশালী গুরুর নিকট যদি দীক্ষা লইবার সংযোগ হয় তো ভালই ; তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে একদিন একটা কোন খেয়ালের বশে নামজাদা সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষা লইলেই সিদ্ধ হওয়া যায় না। যোগের সাধনার ক্রম আছে ; ক্রমে ক্রমে ঐসব অতিক্রম করিলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়। এরূপ সাধনার পথে যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন এরূপ গুরু না জুটিলে সুবিধা হইবে না। যাঁহারা শুধু দুইচার শত বই পড়িয়া জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক তাঁহাদের আর্য্য-দর্শন সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা একজন সাধারণ লোকের জ্ঞানের চেয়ে উন্নত নহে, কারণ সাধনার অবলম্বন না করিলে আর্য্য-দর্শনের কোন জ্ঞানই আয়ত্ব হয় না।

শক্তি-স্তরের দৃষ্টিতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তুরীয়, তুরীয়াতীত সমস্তই শক্তির বিভিন্ন স্তরের লীলামাত্র। তাই বীজমন্ত্র অবলম্বনে ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত, প্রেত, মাটী, পাথর প্রভৃতি জড়বস্তুর পর্য্যন্ত উপাসনা হইতে পারে। শক্তিবাদীর দৃষ্টিতে জড়বাদ, ভাববাদ, শান্তিবাদ ও অধ্যাত্মবাদের প্রশ্ন নাই। রুচি ও মতি অনুসারে যাঁহার যেমন ইচ্ছা করিয়া চলুন। আমরা দেখিব লক্ষ্য কাহার কিরূপ। লক্ষ্য পূর্ণ-বিকাশ হইলেই হইল। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সমাজ, ধর্ম্ম, শাসন সবই আমাদের বিকাশের জন্য আসিয়াছে। বিকাশের জন্য যত কিছুর প্রয়োজন সবই লইব, কিন্তু বিকাশ-বিরুদ্ধ কোন কিছুই মানিয়া লইব না। নিত্য নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আলোচনা করিতে হইবে, উন্নত-বিকাশের স্তরের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করিতে হইবে এবং সাধনার সাহায্যে উন্নত-স্তরের শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া শক্তিমান হইতে হইবে।

বহুদিনের শক্তি-চর্চ্চার অভাবে আমাদের দেশের লোকগুলি অত্যন্ত মূর্ত্তিপ্রিয় হইয়া গিয়াছে। এখন শক্তি-প্রিয় হওয়া প্রয়োজন। মূর্ত্তির মধ্য দিয়াও যদি উহা আসে ক্ষতি নাই। একদল সাধন-শক্তিহীন তথাকথিত ধার্ম্মিক সমস্তটা দেশের মধ্যে ধর্ম্মের নামে সংঘ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া বড় বড় মঠ মন্দির গড়িয়া লইয়া মানুষের মনের উপর বাহ্যিক চাক্‌চিক্যের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিয়া মূর্ত্তি ও অবতার প্রিয়তার বীজকে দৃঢ়মূল করিয়া দিতেছেন। ইঁহারা নিজেরা ত কিছু করেনই না, অন্যকেও কিছু করিতে দেন না। যাঁহারা শক্তিলক্ষ্যে অগ্রসর হইবেন তাঁহারা শক্তি-অর্জ্জনে চেষ্টা করিবেন।

জপ করিতে করিতে বীজমন্ত্রস্থিত শক্তিশালী ক্রিয়াময় রূপ সাধকের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মনের মধ্যস্থিত সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা (নিম্নলক্ষ্যে মনোবৃত্তি)

সেই শক্তিস্পর্শে পুঁছিয়া যায়। সাধক দিন পর দিন শক্তিশালী হইতে থাকেন। তাঁহার চরিত্রটী ত্যাগে, প্রেমে, শান্তিতে, তেজে, উদারতায় ও নির্ভিকতায় ভরিয়া যাইতে থাকে। মন্ত্র যতই জাগ্রত হইতে থাকিবে, সাধকের ততই কামাদি রিপুগুলি দমিয়া যাইতে থাকিবে।

যাঁহারা মন্ত্রযোগের পথ ছাড়িয়া দিয়া মনের মত কল্পনা ভগবানকে শুনাইবার উপদেশ প্রদান করেন তাঁহাদিগকে সাধনার পথে নিতান্ত অনভিজ্ঞ জানিতে হইবে। মালার সাহায্যে জপ সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হইয়া থাকে। যাঁহারা কোনদিন সাধনা করেন নাই তাঁহারাই মন-মালা জপের নামে বাজে কথা বলিয়া মালাজপ হইতে উহার শ্রেষ্টত্ব গাহিয়া থাকেন। মানসজপ লয়-যোগান্তর্গত সাধনা। উহা এত উন্নত-স্তরের সাধনা যে সে স্তরের সাধক সাধাণরতঃ দেখিতেই পাওয়া যায় না। বহুদিন মালা সাহায্যে জপের ফলে উহা আয়ত্ব হইয়া থাকে।

অনেকের ধারণা দীক্ষা মাত্র একবারই হইয়া থাকে; এ ধারণার কোন মূল্য নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে শক্তি অর্জ্জনের জন্য তন্ত্রে বহুবার দীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন প্রকার বীজমন্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে হয়। 'শাক্তদীক্ষা, পূর্ণদীক্ষা, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্য-দীক্ষা, মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা, যোগদীক্ষা ও মহাপূর্ণদীক্ষা' তন্ত্রে এইরূপ দীক্ষার ক্রম আছে। তন্ত্রপথে সাধকগণের মহাপূর্ণ-দীক্ষা অন্তেই 'সন্ন্যাস' হইয়া থাকে। নিজকে নানাপ্রকারে শক্তিশালী হইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ, রাম, ভীষ্ম, ভৃগু, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, রাবণ প্রভৃতি পূর্ব্বযুগের শক্তিশালী মহাপুরুষগণের জীবনচরিত্র আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা জীবনের এক এক সময় এক এক প্রকার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শক্তি ঐভাবেই অর্জ্জন করিতে হয়। ইহাতে একনিষ্ঠার কোনই ব্যাঘাত হইবে না। বহুদিন

শক্তিচর্চার অভাবে এ দেশের মানুষগুলি নিতান্ত বদ্ধ পুকুরের পচা জলের আকার ধারণ করিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারে কেবলই বদ্ধভাব। চালচলন, আচার, বিচার, শিক্ষা, দীক্ষা সমস্ত স্থানেই ইঁহারা বদ্ধ থাকিতে ভালবাসেন। গুরু, শিষ্য, পুরোহিত, যজমান, শিক্ষক, ছাত্র, সকলেই বদ্ধ। এখন ধীরে ধীরে ঈশ্বর পর্য্যন্তও বদ্ধ হইতে চলিয়াছেন।

সাধক ধ্বনি-শক্তির অবলম্বনে মনের জড়াংশ নষ্ট করিয়া ক্রমে ধ্বনির মূলস্থান মহৎ-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এই মন্ত্র-শক্তিই সাধককে শক্তিশালী করিয়া শক্তি-স্তরে লইয়া আসিবে। সাধনার সঙ্গে কর্ম্মের অবলম্বন না থাকিলে সাধকে জ্ঞান-মোহ আসিবে। জ্ঞান-মোহ থাকিলে মহত্তত্ত্বের পরপারে আসা যায় না। গণেশ, সূর্য্য বিষ্ণু ও শিব প্রত্যেক স্তরের অনুভূতি মধ্যেই মোহ আছে। মন্ত্র-শক্তির অবলম্বন থাকিলে কোন স্তরেই আটকাইয়া যাইবেন না। মন্ত্র-শক্তির দুইটা দিক; উহার একদিকে সাধককে মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে লইয়া আসে, আবার অন্যদিকে সাধককে শক্তিশালী করিতে করিতে শক্তি-স্তরে লইয়া যায়। অর্থাৎ মন্ত্র-শক্তি সাধককে জ্ঞানী প্রস্তুত করে, অন্যদিকে সাধককে কর্ম্মের পথে দৃঢ় করিতে সাহায্য করে। মন্ত্র-শক্তি পূর্ণতার পথের সিঁড়ি; আবার এই মন্ত্র-শক্তিই পূর্ণ-শক্তির পূর্ণ উপাদান। সৃষ্টির মূল উপাদান এই শক্তি সপ্তক। এই সৃষ্টিতত্ত্বকে বুঝিবার জন্য জ্ঞান-শক্তি অর্জন করিবার মত সমস্ত উপাদান আমরা এই ধ্বনি-সপ্তক হইতেই লাভ করি।

শিব-অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছিলাম আনন্দময় কোষ সম্বন্ধে শক্তি-স্তরে আলোচনা করিব। শিব-অধ্যায়ে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত আলোচনা হইয়াছে। বিজ্ঞানের পূর্ণ-বিকাশই মহত্তত্ত্ব, একথাও সেখানে বলা হইয়াছে। মহত্তত্ত্বই ধ্বনি-জগতের কেন্দ্র। মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে অব্যক্ত-তত্ত্বের অনুভূতি হয়। মহত্তত্ত্বের পরই

শক্তি-স্তর আরম্ভ হইয়াছে। অব্যক্ততত্ত্বকে শক্তি-ধ্যানে (দুর্গা-ধ্যানে) শক্তি-স্তরের অধীন করা হইয়াছে।

সৃষ্টির মূলে শক্তি-স্তর অবস্থিত। শক্তি-স্তরই আনন্দময় কোষ। মনোময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরের দার্শনিক সীমা আমরা প্রথম অঙ্কিত করিয়া দিব ; তবেই এই আনন্দময় কোষকে পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন।

মনোময় কোষকে আমরা মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারি-ভাগের সীমা-ভাগ করিয়াছি। এবার আমরা মনোময় কোষের দর্শনের মোটামুটী আলোচনা করিব। আমরা আমাদের চক্ষু আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে একটা জগৎকে দর্শন করি বা বুঝি, ইহার নাম "বহির্জগৎ', আবার চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়-দ্বার বন্ধ করিয়া মনে মনে একটা জগতের অনুভব করি, উহার নাম "অন্তর্জগৎ"। অন্তর্জগতের দর্শনে স্থূল চক্ষু কর্ণাদির প্রয়োজন হয় না। বহির্জগতের দর্শনে স্থূল চক্ষু কর্ণাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এই অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের মত বিভিন্ন রকমের। একজন বলেন "অন্তর্জগৎই বাস্তবিক সত্য বস্তু, বহির্জগৎ বলিয়া কোন বাস্তবিক পদার্থ নাই ; বাহিরে আমরা যাহা দশন করি উহা আমাদের অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। বাহিরে আমরা কিছুই দেখি না, সবটাই অন্তরে"। আবার একজন বলেন, "অন্তর্জগৎ বলিয়া কোন বাস্তবিক পদার্থ নাই ; বাহিরের ছাপই অন্তরে প্রতিফলিত হয়। আর ইহাই তোমরা অন্তর্জগৎ বলিতেছ ; অন্তর্জগৎ বলিয়া কোন বাস্তবিক পদার্থ নাই, যা কিছু সবই বাহিরে।

অন্তর সত্য কি বহিঃ সত্য বা অন্তর বাহির দুইই সত্য ইহা লইয়া আমাদের ঝগড়ার প্রয়োজন নাই। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা

অন্তরে হউক বাহিরে হউক, ইহা 'নিত্য পরিবর্ত্তনশীল'। ইহা সর্ব্বদাই বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। যতক্ষণ আমরা মনোময় কোষের দার্শনিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত ততক্ষণ দৃশ্য অন্তরেই থাকুক বা বাহিরেই থাকুক দৃশ্য বস্তু কেবলই রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছে। যে স্তরে আমাদের দর্শনে দৃশ্য কেবলই রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছে সেই স্তরই 'মনোময় কোষের দর্শন' বলিয়া জানিতে হইবে।

এই পরিবর্ত্তন কি অংশে এবং কি ভাবে হইয়া চলিয়াছে এসম্বন্ধে বিচারের সূত্রপাত করিলে একটা প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়। আমাদের অহঙ্কারের আশ্রয়ে আমাদের মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষ বদ্‌লাইয়া চলিয়াছে। এরূপ বদ্‌লাইয়া যাইবার দরুণ আমরা নিত্য আকারে, প্রকারে, শক্তিতে এবং ভাবে নূতন মানুষ হইয়া যাইতেছি। আমাদের চক্ষের সাম্‌নে ঐদৃশ্য বৃক্ষটী রহিয়াছে; ঐ বৃক্ষেরও অভিমান আছে। বৃক্ষের ঐ অভিমান-আশ্রয়ে বৃক্ষের অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময় কোষ নিত্য বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। তাই আমরা নিত্য নূতন আমিত্বের মধ্যদিয়া ঐ বৃক্ষটীকে নিত্য নূতন রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিতেছি। সেও তাহার আমিত্বের আধারে নিত্য নূতনরূপটী হইয়া আমাদের নিকট নিত্য নূতন দৃশ্য হইয়া চলিয়াছে। আমার পারিপার্শ্বিক স্থিতি ও উহার পার্শ্বিক স্থিতি সময়ের গতিতে প্রতি মুহূর্ত্তে বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই মুহূর্ত্তে আমাকে আমি যেরূপ ভাবে পাইতেছি পর মুহূর্ত্তে আমি আর সেরূপটী থাকি না। তাহাকেও একরূপে দুইটীবার পাইবার উপায় নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার উপর দিয়া নূতন সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, আবার প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার মধ্যস্থিত বহু অংশ ধ্বংশ হইয়া যাইতেছে। এই দৃশ্যটা আমার মনের ভিতরে কি বাহিরে ইহা লইয়া ঝগড়া করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে আমার মন

ঐ দৃশ্যের অস্তিত্ব-দাতা নহে ; উহার অস্তিত্বের মূলে উহার অভিমান অবস্থিত। তাই আমার মনোময় কোষ নিদ্রাবস্থায় জড়তায় পরিণত হইলে ঐ দৃশ্যের বা বৃক্ষের অস্তিত্ব সকলের নিকট জড়তায় পরিণত হয় না।

বিজ্ঞানের দৃশ্যটা মনোময় কোষের দৃশ্যের মত পরিবর্তনশীল নহে। বিজ্ঞানের দর্শনে দৃশ্য আছে, দ্রষ্টা আছে এবং দর্শন-শক্তিও আছে, কিন্তু অনুভূতিতে এই তিন বস্তুর কোনই ভেদ নাই। দর্শনের এই স্তরে এই তিনই একরূপ প্রাপ্ত হয়। অনুভূতিতে এই তিন বস্তুর একরূপতা প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ দর্শনে দৃশ্য-পরমাণুর রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। একটা বস্তুকে দেখিলে সেই দৃশ্য বস্তুস্থিত রূপকণাগুলি আমাদের বিজ্ঞানের কেন্দ্রে চলিয়া আসে। আসিবার সঙ্গেই আমাদের বিজ্ঞানময় কোষে যে বোধের তরঙ্গ উত্থিত হয় উহা লোহিতবর্ণে পরিণত হয়। স্থূল দৃশ্যের মধ্যে যত প্রকার রূপেরই (রং এর) বিভিন্নতা থাকুক না কেন বিজ্ঞানের কেন্দ্রে সবই লোহিতবর্ণ হইবে। পূর্ব্বে শিব-অধ্যায়ে বলিয়াছি বাহ্য বিষয়ের সংযোগ আমাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের মধ্য দিয়াই প্রথম হয়। পরে সেই বোধদ্বারাই মনোময় কোষের বিভিন্ন কেন্দ্রে চলিয়া আসে। দৃশ্যস্থিত রূপ-পরমাণু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানময় কোষে থাকে ততক্ষণ উহা লোহিতবর্ণ-বোধই থাকিবে। পরে মনোময় কোষে সেই দৃশ্যকণাগুলি প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন রং-এ বিভক্ত হইয়া যাইবে। এখানে স্থূল দৃশ্যে যেরূপ লাল, নীল, পীত ইত্যাদি থাকে সেইরূপেই পরিণত হইবে। অনেকে কোন কোন বিশেষ রং দেখিতে পায় না। ইহার কারণ তাহাদের মনোময় কোষে সেইরূপ রংকে ধরিয়া রাখিবার মত শক্তি স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। যদি কখনও সেই স্তব্ধতা কাটিয়া যায় তবেই তাহারা সেই রংটিকে ঠিক দেখিতে পাইবে। যাহা হউক এখানে আমরা বিজ্ঞানময় কোষ লইয়া আলোচনা করিতেছি।

সেই বিজ্ঞানের দৃশ্যকণার সঙ্গে বিজ্ঞাতার রূপের কোনই ভেদ থাকে না। দৃশ্যের সঙ্গে ভেদ আসিলেই দৃশ্য পরমাণু মনোময় কোষে প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানের শেষ-স্তরে জ্ঞানের বিকাশ। আর বিজ্ঞানে ভেদ হইলেই মনোময় কোষে প্রবেশ হয়। বিজ্ঞান হইতে জ্ঞানের স্তর এবং মনের স্তর বুঝিবার জন্য পাঠকগণ ইহা মনে রাখিবেন।

বিজ্ঞান-স্তর মনোময় কোষের পরপারে। বিজ্ঞানের স্তরে আসিলে আমাদের নিকট (বিজ্ঞাতার নিকট) অন্তর্জগৎ, বহির্জগৎ বলিয়া কোন বস্তু থাকে না। এখানে রূপ-পরমাণু, রস-পরমাণু, স্পর্শ-পরমাণু ও গন্ধ-পরমাণুর খেলামাত্র। এখানে এক জাতীয় পরমাণু অন্য জাতীয় পরমাণুর সহিত মিশে না। বিজ্ঞাতাও এক সঙ্গে দুই জাতীয় পরমাণুর জ্ঞাতা হন না। প্রত্যেক জাতীয় পরমাণুই স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং নিত্য। এখানে লীলা নাই, পরিবর্ত্তন নাই অন্তর বাহির নাই। মনোময় কোষে আমরা যে সৃষ্টির বিচিত্র লীলা দর্শন করি এখানে তাহার কিছুই নাই। এখানে কেবলই পরমাণুর খেলা। যখন রস-পরমাণুর সঙ্গে বিজ্ঞাতা একাকারে স্থিত হন, তখন শুধু রসবোধ বিদ্যমান। অন্য কোন পরমাণু কোন কালে আছে কি নাই তাহার কিছুই জানা যায় না। মনোময় কোষস্থিত চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি (উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ) কোন কালে ছিল কি হবে এরূপ কোন স্মৃতি পর্য্যন্ত ফুটিবে না। এ যেন সুষুপ্তির একটা স্তর ; বোদ্ধা, বোধিত বিষয় এবং বোধ-শক্তি একই বোধ-সাগরে নিমজ্জিত। ইহা সমাধির এক একটা স্তর। সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিজ্ঞান-স্তরও সৃষ্টির একটা স্তর মাত্র। এখানে বোদ্ধার সহিত শরীর, প্রাণ ও মনোময় কোষের স্মৃতিসম্বন্ধ থাকে না।

বিজ্ঞানের স্তরে অন্তর বাহির দুইই ভাঙ্গিয়া যায়। এখানে বিজ্ঞান ; দৃশ্যের বিজ্ঞান, স্পর্শের বিজ্ঞান, গন্ধের বিজ্ঞান ও রসের বিজ্ঞান। এখানে বিচার ফুটিবে না (গণেশ বা বিচারাংশ দেখুন), আকার ফুটিবে

না (সূর্য্য বা লীলা অংশ দেখুন), সুখ দুঃখ ফুটিবে না (বিষ্ণু বা চিত্ত অংশ দেখুন), ভেদও ফুটিবে না (শিব বা অভিমান অংশ দেখুন)। ভেদ ফুটিবে না সত্য, কিন্তু প্রত্যেকটী বিজ্ঞান-বোধের সঙ্গে শান্তিবোধ অংশ বিদ্যমান থাকে। অভিমানের কেন্দ্র হইতে দুইটী শক্তি বিকীর্ণ হয়; উহার একটীতে দ্রষ্টার ভেদভাব আনয়ন করে, আর অন্যটীতে শান্তি-বোধ স্থাপন করে। এসম্বন্ধে বিস্তারিত পরে বলা হইবে। দৃশ্যস্থিত রূপ-পরমাণু, দর্শন-শক্তি ও দ্রষ্টা একই লোহিতবর্ণ ব্যাপক শান্তি-বোধে আত্মহারা। স্পর্শস্থিত স্পর্শ-পরমাণু, স্পর্শন-শক্তি এবং স্পর্শ-বিজ্ঞাতা একই ধূম্রবর্ণ ব্যাপক শান্তি-বোধে আত্মহারা। গন্ধ-পরমাণু, ঘ্রাণ-শক্তি এবং ঘ্রাণ-বিজ্ঞাতা একই পীতবর্ণ ব্যাপক শান্তি-বোধে আত্মহারা।

অনেক সাধককে বলিতে শুনা যায় "এমন একটী স্তরে চলিয়া আসিলাম, যেখানে আমি আমার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিলাম এবং কি হইল কিছুই বলিতে পারিলাম না"। এরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারা মনোময় কোষে ভাব-জগতের উপর-স্তরের কোন খবরই রাখেন না। উহা একটা ভাবের খেলা মাত্র। উহা কতকটা শূন্য ভাব ও শূন্য বোধ এক বস্তু নহে, ইহা পাঠকগণ মনে রাখিবেন। শূন্য ভাব হইতে শূন্য-বোধ অনেক উন্নত স্তরের অনুভূতি। কাম-ভাব, শান্তি-ভাব, শূন্য-ভাব ও শোক-ভাব সবই এক ভাব-জগতের খেলা মাত্র। বোধ-জগৎ ইহা হইতে উন্নত-স্তরে (অবস্থিত) মাত্র। বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতির সময় শরীর হয়ত স্তব্ধ বা জড়-পিণ্ডের মত অবস্থিত হইতে পারে, কিন্তু শরীরের এ অবস্থার কথা বিজ্ঞানের অনুভূতিতে স্থিত সাধক ইহা জানিতে পারি বন না। শরীরের জড়তা আসিলেও একথা সত্য যে বিজ্ঞাতা সেখানে জড়তা প্রাপ্ত হন না। বিজ্ঞাতা সেখানে জাগ্রত মনোময় কোষ স্তব্ধ থাকিলেও ও শরীর নিশ্চল হইয়া গেলেও বিজ্ঞাতা

তাহার জ্ঞান-শক্তি হারায় না। কাজেই কেহ যদি বলেন যে 'একস্তরে আসিয়া আমি আমার জ্ঞান হারাইলাম', তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি চিত্তকেন্দ্রস্থিত কোন ভাবে আত্মহারা হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, বিজ্ঞানময় কোষে আসেন নাই। বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতিতে শরীর এবং মনের জড়তা আসিলেও সাধকের জ্ঞান-শক্তির জড়তা আসে না। পাঠকগণ আরও জানিয়া রাখুন যে আমাদের জ্ঞান-শক্তির জড়তা কোন অবস্থাতেই আসে না ; জ্ঞান-শক্তির জড়তা আসিলে শরীর সেই মুহূর্ত্তেই আত্মা হইতে খসিয়া পড়িবে। ক্রমে এসব কথা আরও স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতির ভেদ স্থির করিলে পাঠকগণের পক্ষে বুঝিতে সুবিধা হইবে। একটা পাকা আম ও একটী শশা হাতে লও। আম ও শশাটী হইতে গন্ধ-পরমাণু ব্যাপ্ত হইয়া চলিয়াছে ; তুমি দুই রকম গন্ধই অনুভব করিতেছ। আম ও শশাটী হইতে এক এক প্রকার রূপ-পরমাণু নির্গত হইয়া চলিয়াছে। তুমি এই উভয় রূপটীই দেখিতেছ। আমটী ও শশাটী তোমার হাতেই আছে। আমটী হইতে শশাটীর স্পর্শ একটু ঠাণ্ডা। আমটী ও শশাটী হইতে স্পর্শ-পরমাণু (বায়বীয় পরমাণু) সর্ব্বদা নির্গত হইয়া চলিয়াছে। তুমি তোমার হাতে উভয়-স্পর্শের ভেদসহ অনুভব করিতেছ। আম ও শশার আকার এক প্রকার নহে। ইহারা তোমার হাতে স্থিত হইলেও ইহারা তোমা হইতে অন্য বস্তু, ইহাও তুমি বুঝিতেছ। এরূপ ভেদ বিচার সহ যে জ্ঞান উহাই মনোময় কোষের জ্ঞান।

বিজ্ঞানময় কোষের বোধ ওরূপ হইবে না। বিজ্ঞানের স্তরে আসিলে তোমার অভিমান চিত্ত, (সূর্য্য ও বিষ্ণু), বুদ্ধি এবং মনঅংশের কাজ থাকিবে না। সেখানে তোমার আমিত্বও একটা বিন্দুরূপে পরিণত হইবে। বিজ্ঞানের স্তরে আমি, তুমি, রাম, শ্যাম প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের

স্ফুরন হয় না। সুতরাং এখানে আমরা 'বোদ্ধা' বা 'বিজ্ঞাতা' এরূপ প্রতিশব্দে কর্ত্তার প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিব। বিজ্ঞান-স্তরে না আসিলে বিজ্ঞান-বোধ ঠিক বুঝা যাইবে না। পাঠকগণ সুষুপ্তির স্তরে নিজেদের অবস্থিতি সম্বন্ধে বিচার করিয়া বিজ্ঞানময় কোষ বুঝিতে চেষ্টা করুন। আম ও শশা হইতে দুই প্রকারের গন্ধ-পরমাণু ব্যপ্ত হইয়া চলিয়াছে। বোদ্ধার সঙ্গে উহার সংযোগ হওয়া মাত্র বোদ্ধার বোধের যে স্তরে অবস্থিতি হইবে উহা গন্ধ-বোধের ক্ষেত্র। উহা একটা পীতবর্ণের ব্যাপক শান্তিবোধ মাত্র। বোদ্ধা, বোধ-শক্তি এবং ঐ গন্ধ-পরমাণু একই বোধ-সাগরে ডুবিয়া যাইবে। এখানে আম ও শশার গন্ধের কোন পার্থক্যবোধ ফুটিবে না (সুষুপ্তিতে গোলাপ ও বিষ্ঠার গন্ধের যে কোন পার্থক্য থাকে না ইহা প্রত্যেকেই অনুভব করিতে পারেন)।

আম ও শশাটী হইতে দুই প্রকারের রসজ-পরমাণু নির্গত হইয়া চলিয়াছে। তুমি আম ও শশা হইতে এক এক টুক্‌রা কাটিয়া নিজের জিহ্বার উপর রাখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। যাহা হউক উহার সহিত বোদ্ধার সংযোগ হইলে বোদ্ধা শুভ্রবর্ণ বোধ-সাগরে ডুবিয়া যাইবে।

আম ও শশাটী হইতে সর্ব্বদা রূপজ-পরমাণু বাহির হইয়া চলিয়াছে অর্থাৎ রূপ-কণা নির্গত হইয়া চলিয়াছে। বোদ্ধার সঙ্গে ইহার সংযোগ হইবা মাত্র বোদ্ধা বিজ্ঞানের যে স্তরে স্থিত হইবেন উহা রূপ-বোধের স্তর হইবে। বোদ্ধা, রূপবোধ-শক্তি এবং রূপ-পরমাণু একই লোহিতবর্ণ ব্যাপক শান্তি-বোধের রূপে ডুবিয়া যাইবে। এখানে বিজ্ঞানের স্তর, সুতরাং আম ও শশার রূপের ভেদ ফুটিবে না।

আম ও শশাটী হইতে এক এক প্রকার স্পর্শজ পরমাণু নির্গত হইয়া চলিয়াছে, যে কারণ তোমার হাতে আমটী হইতে শশাটী একটু ঠাণ্ডা মনে হইতেছে। ঐ স্পর্শ-পরমাণু বোদ্ধার সহিত মিলিত

হইলে বোদ্ধা ধূম্রবর্ণ বোধে পরিণত হয়। বোদ্ধা স্পর্শ-শক্তি ও স্পর্শ পরমাণু একই ধূম্রবর্ণ ব্যাপক শান্তি-বোধে ডুবিয়া যাইবে।

এই আম ও শশাটী সম্বন্ধে বিচার করিয়া আমরা যে সব তত্ত্বের সন্ধান পাইলাম তাহাতে আমরা বলিতে পারি ঐ শশা ও আমে বাস্তবিক কতকগুলি পরমাণুর সংস্থান আছে। উহারা গন্ধ-পরমাণু, রস-পরমাণু, তেজঃ-পরমাণু ও বায়ু-পরমাণু। এইরূপ বিচার করিলে এই সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুর উপাদানেই কতকগুলি পরমাণুর সংস্থান পাওয়া যাইবে। এক স্তরে শশাটী, আমটী ও আমাতে আকারে, রূপে ও স্থিতিতে ভেদ আছে। ইহা শশা, আম ও আমার মনোময় কোষ এবং প্রাণময় কোষ। শশা ও আমটীর প্রাণময় ও মনোময় কোষকে ভাঙ্গিয়া দিলে উহারা কতকগুলি পরমাণুতে পরিণত হইবে। প্রাণময় কোষ সেই পরমাণুগুলিকে একত্র জড়পিণ্ড করিয়াছিল। উহাদের মধ্যস্থিত মন-অংশ উহাদের আকারটি ফুটাইয়াছিল। উহাদের মধ্যস্থিত অভিমান উহাদিগকে পরস্পর হইতে এবং আমা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। উহাদের মধ্যস্থিত চিত্ত অংশ উহাদের মধ্যে না থাকিলে উহাদের সুখদুঃখ বোধ থাকিত না। সুখ-দুঃখ বোধ না থাকিলে উহাদের মধ্যস্থিত প্রাণ উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিত না। উহার একটিতে একটা কাটা ফুটাইয়া দাও, দেখিবে উহা হইতে রস ক্ষরিত হইতেছে (ফল যখন গাছে থাকে তখন এরূপ পরীক্ষায় ঠিক ফল পাওয়া যাইবে। মৃত ফলে সব সময় এইরূপ পরীক্ষায় ঠিক ফল নাও আসিতে পারে)। কিছুক্ষণ মধ্যে দেখিতে পাইবে কোন শক্তিবলে সেই ছিদ্রটি বন্ধ হইয়া রস পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চিত্ত-অংশ যে উহাদের মধ্যে আছে, সুখ-দুঃখ-বোধই তাহার প্রমাণ। বুদ্ধি-কেন্দ্র উহাদের মধ্যে কিরূপ কাজ করে উহা বুঝা একটু কঠিন। যাহা হউক উহাদের মনোময় এবং প্রাণময় অংশ

ত্যাগ করিয়া আমরা যদি ইহাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করি তবে আমরা ইহা বুঝিতে পারিব যে উহাদের মধ্যে কতকগুলি পরমাণুর সংস্থান রহিয়াছে। ইহাই বিজ্ঞানময় কোষের এক অংশ। বিজ্ঞানময় কোসের আরও উন্নত অংশ রহিয়াছে; ঐ সম্বন্ধে আমরা পরে বলিব। উন্নত বিজ্ঞান-স্তরে ইহা বুঝা যাইবে যে ঐ যে পরমাণু উহারা কতকগুলি ধ্বনি বা শব্দের সমষ্টি মাত্র।

শিব-অধ্যায়ে আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে কোন বাহ্য বস্তুর প্রথম সংযোগ আমাদের বিজ্ঞানের স্তরে প্রথম হয়। ক্রমে উহা মনোময় কোষের বিভিন্ন-কেন্দ্রে চলিয়া আসে। বিজ্ঞানের স্তরে বোদ্ধা, বোধ-শক্তি এবং বিষয়ের মধ্য হইতে বিনির্গত পরমাণু একই রূপতা প্রাপ্ত হয়। বোদ্ধা, বোধ-শক্তি এবং বোধিত বিষয়ের পরমাণু একই রূপে পরিণত হইলেও এই তিনটিতে গুণের বৈষম্য অবস্থান করে—অর্থাৎ বোদ্ধাতে বিজ্ঞানের সত্ত্বগুণের অবস্থান থাকে, বোধশক্তিতে বিজ্ঞানের রজোগুণ বিদ্যমান থাকে এবং বোধিত বিষয়-পরমাণুতে বিজ্ঞানের তমোগুণের প্রধানতা থাকে। গুণের এই বৈষম্য না থাকিলে বিজ্ঞানময় কোষ বিলুপ্ত হইয়া যাইত। এই বিজ্ঞান-স্তরকে এই ত্রিগুণ তিনভাগে ভাগ করিয়া জীবিত রাখিয়াছে।

বিজ্ঞান-স্তরের এই সব বিষয় লইয়া বেশী আলোচনা প্রয়োজন মনে করি না, কারণ ইহা বুঝিতে পারে এমন লোক খুবই কম পাওয়া যাইবে। যাঁহারা বুঝিবার মত শক্তিশালী তাঁহারা এই সামান্য ইঙ্গিতেই সব বুঝিতে পারিবেন। স্থূল সৃষ্টির মূল রহস্য এই বিজ্ঞানের স্তরেই অবস্থিত। মানুষ মনোময় কোষে দাঁড়াইয়া এই স্থূল সৃষ্টি-সম্বন্ধে যে সব জল্পনা কল্পনা করে তাহার কোনটাই সত্য নহে। ক্রম-বিকাশের পথে বিজ্ঞান-স্তরের আলোচনা করিলে একথা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

ক্রম-বিকাশবাদ এবং ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে এখন দু'এক কথা বলা প্রয়োজন। ক্রম-বিকাশে যাঁহার বিকাশ যতটা উন্নত-স্তরে আসিবে তিনি সেখান হইতেই বিবর্ত্তন সাজাইবেন। যাঁহার বিকাশ মনোময় কোষ পর্য্যন্ত হইয়াছে তিনি সৃষ্টিতত্ত্বে মনোময় কোষই (ভাববাদ) ফুটাইয়া তুলিবেন। যাঁহার বিকাশ বিজ্ঞান-স্তর পর্য্যন্ত আসিয়াছে তিনি বিজ্ঞান হইতেই সৃষ্টির বিবর্ত্তন সাজাইতে চেষ্টা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। যাঁহারা মানুষের ক্রম-বিকাশকে পশুত্বের সীমায় আবদ্ধ করিতে চান তাঁহারা সৃষ্টির কতটুকু অংশ জানিতে পারেন? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জীবের ক্রম-বিকাশটা ঠেলিয়া ঠুলিয়া পশু-স্তরে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন মাত্র। ঋষিগণ এই ক্রম-বিকাশকে শক্তি-স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জন্যই সৃষ্টিতত্ত্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনের স্তরের কথাই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিয়া চলিয়াছেন। ওদেশের কর্ম্মিগণও কর্ম্মবিজ্ঞানকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আসুরিকবাদের পরপারে দাঁড় করাইতে পারেন নাই। ঋষিগণ এই কর্ম্ম-বিজ্ঞানের পূর্ণস্তরে নিষ্কাম-কর্ম্ম ও শেষকালে কর্ম্মযোগে ঈশ্বরত্বকেও মূর্ত্ত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অটোক্রেসি হইতে ডিমোক্রেসি; পরে সোসিয়ালিজ্‌ম, কমিউনিজ্‌ম যাহাই দাঁড় করান না কেন উহার পরিণতিতে কিছুদিন বাদ আসুরিকতা আসিয়াই যাইতেছে। খাদ্য এবং যৌনসুখই তাঁহাদের ক্রম-বিকাশের ভিত্তি। অন্তর্বিকাশ সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও নিতান্ত বালক। পশু পর্য্যন্ত বিকাশ-ক্রমটা কতকটা খাদ্য ও যৌনসুখের উপর দাঁড় করান যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের বিকাশ-ক্রম খাদ্য ও স্ত্রীপুরুষ-মিলন-সুখে আবদ্ধ করা যায় না। প্রাণময় কোষ যে টুকুতে তৃপ্ত, মনোময় কোষের তৃপ্তি উহাতে নিয়মিত হয় না। যাহা হউক তাঁহাদের ভুল ঐখানে হইবার দরুণই তাঁহারা মানুষকে পশু-স্তরে নামাইয়া দিবার ব্যবস্থা

করিয়া অন্নের পিছনে লাগাইয়াছেন। পশুর মত মানুষেরও অন্ন এবং সৃষ্টির লীলাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য যৌন-সুখের বেগ রহিয়াছে, কিন্তু পশুর মত মানুষের বিকাশ ঐখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। এই পর্য্যন্ত প্রকৃতির ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ। ইহার পর মানুষের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া-শক্তির বিকাশ হয়। ইঁহারাই গণেশ, সূর্য্য এবং বিষ্ণু-চরিত্রের মানুষ। এই ক্রিয়া-শক্তির বাদ মানুষে প্রকৃতির জ্ঞান-শক্তির বিকাশ হয়। এই জ্ঞান-শক্তির বিকাশে মানুষ বিজ্ঞান ও জ্ঞান-স্তরের সন্ধান দিতে পারে। আবার কর্ম্ম-শক্তিকে শক্তি-স্তরের আদর্শে গড়িয়া দিতে পারেন। এই জ্ঞান-শক্তির উপরের স্তরে যখন মানুষের বিকাশ হয় তখন মানুষ পুরুষোত্তম হয়। পুরুষোত্তমের স্তরে আসিয়া দাঁড়াও, তার পর সৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা কর। ইহার পর সৃষ্টির বিবর্ত্তন-লীলা সাজাইলে সেই সৃষ্টিতত্ত্ব নির্ভুল হইবে। দুঃখের বিষয় ভারতের যাঁহারা বড় বড় খ্যাতনামা বিদ্বান্, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পদে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারাও পাশ্চাত্যের ঐ অত্যল্প বিকাশ-বিজ্ঞানে নিয়মিত সৃষ্টিতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া ভারতের কর্ম্ম-শক্তিকে সেই ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের অদূরদর্শিতাকে ক্ষমা করা যায় কি না তাহা আজ হইতে ১০০ শত বৎসর পর বিচার হইবে।

যাহা হউক ক্রম-বিকাশের পথে পূর্ণ-বিকাশের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেই বিবর্ত্তন-সিঁড়ি যে কিরূপ হইবে ইহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন। ক্রম-বিকাশে মানুষ যেমন উন্নত-স্তরের খবর পাইতে থাকিবেন, তেমনই উন্নত-স্তরে প্রতিষ্ঠিত নীতিকে জগতে স্থাপন করিতে পারিবেন। যাঁহারা বিকাশ-ক্রমকে পশু পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছেন. অর্থাৎ যাঁহারা প্রাণময় কোষটারই বিকাশ মাত্র বুঝিয়াছেন তাঁহারা ইহার চেয়ে বেশী কথা বলিতে পারেন না। তাঁহারাও শেষকালে মানুষকেও পশু-স্তরে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতে ইহার প্রচারের ফলে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

মানুষের ক্রম-বিকাশকে অন্ন ও যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া মনোবিজ্ঞানের ছাঁচে উন্নত বিকাশের পথে অগ্রসর করিবার চেষ্টা কর দেখিবে ঐ নিম্নস্তরের সৃষ্টিতত্ত্ব, ইতিহাসতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি মানুষের নিকট একটা বাজে কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। কর্ম্মীদের নিকট আমাদের কথা—"লক্ষ্য অন্ন নহে, লক্ষ্য পূর্ণ-শক্তিব বিকাশ"। ইহা ধরিয়া লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আগুয়ান হও, দেখিবে ঐ সব দর্শন-তত্ত্ব দু'চার বছরের মধ্যেই ছেঁড়া কাগজ পত্রের ঝুড়িতে চলিয়া গিয়াছে। নিজের বিকাশকে পশুত্বের স্তরে না রাখিয়া পূর্ণ-স্তরে লইয়া চল ; দেখিতে পাইবে স্তরে স্তরে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে নিত্য নূতন জ্ঞানের আলো পাইয়া চলিয়াছ।

বিজ্ঞানময় কোষে আমরা তন্মাত্র-সৃষ্টির স্তরে আসিয়া যাই। এ স্তরে সর্ব্বভূতের শরীরের সমস্ত উপাদান মাত্রারূপে অবস্থিত থাকে, আর জীব এখানে বীজরূপে অবস্থিত। এসব বিষয়ে পূর্ব্বে শিব-অধ্যায়ে কিছু বলা হইয়াছে ; বিস্তারিত এখানে বলিবার ইচ্ছা নাই। আমরা কর্ম্ম-বিজ্ঞান বুঝিয়া চলিয়াছি এবং ইহাই বুঝিয়া চলিব। ক্রম-বিকাশের পথে আমরা ক্রমেই উন্নত-স্তরে অগ্রসর হইতে থাকিব। আমাদের বিকাশ যখন মনোময় কোষে অবস্থান করে, তখন আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যেটুকু বুঝি সেটুকুই সব নহে, পাঠকগণ ইহা মনে রাখিয়া চলুন। বিচারবিজ্ঞান উন্নত-স্তরে স্থাপন করুন দেখিবেন নিম্নস্তরের দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দর্শন আপনার আর ভালই লাগিবে না। অনুভূতির পথে উন্নত-স্তরের বিকাশ আসুক চাই নাই আসুক সেজন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই। উন্নত-স্তরের চরিত্র এবং কর্ম্ম-শক্তির বিজ্ঞান বুঝিয়া চলুন, দেখিবেন উন্নত-স্তরের দর্শন অভাবে আপনার কিরূপ অসুবিধা বোধ হইতেছে ইহা বুঝিতে পারিবেন।

গন্ধ, রস, রূপ এবং স্পর্শ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়াছি। এবার আমরা শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিব, অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষে শব্দের বোধ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এখানে পাঠকগণ মনে রাখিবেন "শব্দতন্মাত্রা ও শব্দ-বিজ্ঞান এক কথা নহে"। শব্দ-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম পরিণতি শব্দতন্মাত্রা। যাহা হউক গন্ধাদির বিজ্ঞানের সঙ্গে শব্দ-বোধের কি সম্বন্ধ আছে তাহাই বলিতেছি। মাত্রার স্পর্শগুলি শব্দময় হইয়াই বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করে। রূপ-পরমাণু যখন বিজ্ঞাতাকে স্পর্শ করে তখন বিজ্ঞাতার সঙ্গে ঐ মাত্রার মিলনে যে ক্রিয়া হয় উহাতে 'রং' ধ্বনি উত্থিত হয়। যে কোন স্থানে দুই বস্তুর মিলনে একটা ধ্বনি উত্থিত হয়। এরূপে গন্ধ-পরমাণু ও বিজ্ঞাতা মিলনে 'লং' ধ্বনি হয়। রস-পরমাণু ও বিজ্ঞাতা-মিলনে 'বং' ধ্বনি হয়। স্পর্শ-পরমাণু বা বায়বীয় পরমাণু ও বিজ্ঞাতা-মিলনে 'যং' ধ্বনি হয়।

পাঠকগণের বুঝিবার পক্ষে যাহাতে জটিলতা না আসে সেইজন্য মস্তিষ্ক-কেন্দ্র চিত্রের সাহায্য লইয়া আমরা মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ বুঝিব। পাঠকগণ এবার মস্তিষ্ক-কেন্দ্র চিত্র দেখুন। বিজ্ঞানময় কোষে তিনটি কেন্দ্র কাজ করিতে থাকে। একটি গণেশ-কেন্দ্র (৭ চিহ্নিত কেন্দ্র), একটি শিব-কেন্দ্র (৪ চিহ্নিত কেন্দ্র) এবং অন্যটী মহৎ-কেন্দ্র (৫ চিহ্নিত কেন্দ্র)। গণেশ-কেন্দ্র মনোময় কোষেও কাজ করে বিজ্ঞাময় কোষেও কাজ করে। শিব-কেন্দ্রও মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোষে কাজ দেয়। গণেশ-কেন্দ্র যখন মনোময় কোষে কাজ দেয় তখন ইহা বিচার শক্তিরূপে পরিণত হয়। যখন এই কেন্দ্র বিজ্ঞানময় কোষের কাজে নিযুক্ত হয় তখন ইহার কাজ হয় বোধিত জগতের ভেদ করা; এই জন্যই বিজ্ঞানময় কোষে বোধিত বিষয় সমূহের ভেদ থাকে ; অর্থাৎ রসবোধের ও স্পর্শ-বোধের কেন্দ্রে একই বিজ্ঞাতা থাকিলেও বোধের মধ্যে রং এর তারতম্য থাকে। একই বুদ্ধি-কেন্দ্র (৭ চিহ্নিত কেন্দ্র) মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে কিরূপ কাজ দেয় তাহা বলা হইল।

এবার শিব-কেন্দ্রের (৪ চিহ্নিত কেন্দ্র) দুই প্রকারের কাজের কথা বলা যাইতেছে। পাঠকগণের মনে থাকিবে, ইহাই অভিমান-কেন্দ্র। অভিমান-কেন্দ্র যখন মনোময় কোষে সম্বন্ধ রাখে তখন ইহা দ্রষ্টা ও কর্ত্তার ভেদ করে; অর্থাৎ আমি, তুমি, রাম, শ্যাম, বৃক্ষ ইত্যাদির কর্তৃত্বের ভেদ সৃষ্টি করে (যেমন একটা বস্তু আমিও দেখিতেছি, রামও দেখিতেছে)। আবার এই অভিমান যখন বিজ্ঞানময়-কোষে সংযোগ রাখে তখন এই অভিমানই বিজ্ঞাতাকে মহত্তত্ত্ব (পূর্ণ-বোধ-কেন্দ্র; ৫ চিহ্নিত কেন্দ্র) হইতে এক স্তর নিম্নে শান্তিবোধে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই অভিমানই বিজ্ঞানময় কোষে সাংখ্যের 'অহং-তত্ত্ব'। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটী-বোধের সঙ্গে শান্তিবোধ বিদ্যমান থাকে। এই শান্তিবোধ অভিমান কেন্দ্র হইতে বিচ্ছুরিত হয়। এই শান্তিবোধ যতক্ষণ বিজ্ঞানের স্তরে অবস্থিত থাকে, ততক্ষণ—মহৎ-তত্ত্ব এবং অহং-তত্ত্বের ভেদ বিদ্যমান থাকে। এই শান্তিটুকু না থাকিলে অহং-তত্ত্বটী মহৎ-তত্ত্বের কেন্দ্রে মিলিয়া যায়। সুষুপ্তিতে আমরা এই শান্তি-বোধেই নিবিষ্ট থাকি। সুষুপ্তির মধ্যে এই শান্তিবোধটুকুই যদি মিটিয়া যাইত তবে অহং-তত্ত্ব মহৎ-তত্ত্বের কেন্দ্রে চলিয়া আসিত, বা অহং-তত্ত্ব মিলিয়া যাইত। সুষুপ্তিতে উহা হয় না, ইহা সমাধির দ্বারা আয়ত্ত হইয়া থাকে।

শব্দ-বিজ্ঞান অর্থে—বিজ্ঞানময় কোষে ধ্বনি-বোধ বুঝিতে হইবে। শিব-অংশে গন্ধ-তন্মাত্রা, রস-তন্মাত্রা, রূপ-তন্মাত্রা, স্পর্শ-তন্মাত্রা ও শব্দ-তন্মাত্রার কথা বলা হইয়াছে। শব্দ-তন্মাত্রা এবং শব্দের সূক্ষ্মতম বোধ একই কথা। বিজ্ঞানময় কোষে শব্দ-বোধে পাঁচটি ধ্বনি বিদ্যমান. কিন্তু শব্দের সূক্ষ্ম বিজ্ঞানে ঐপাঁচটী ধ্বনি একটী ধ্বনিতে পরিণত হয়; ইহাই শব্দ-তন্মাত্রা॥

'শব্দ-তন্মাত্রা' শব্দের বা ধ্বনির সূক্ষ্মতম পরিণতি। শব্দের সূক্ষ্মতম পরিণতিতে শব্দে মাত্র 'অং'কার বিদ্যমান থাকে; এই 'অং'কারই মহৎ-তত্ত্ব। এই 'অং'কারের ধ্বনি যেখানে যাইয়া একেবারে স্থির হইয়া যায় উহাই ':' (বিসর্গ)। এই ':'ই অব্যক্ত-তত্ত্ব। এই ':' এবং 'অং'কার যোগ করিয়া দিলে (: + অং =) 'হং' হয়। (অকারকে বাদ দিলে কোন ধ্বনিই হইতে পারে না, কাজেই ধ্বনি মানিলেই অকার মানিতে হইবে)। সুতরাং শব্দ-তন্মাত্রার সূক্ষ্মতম পরিণতিতে 'অং' বা 'হং' কার বিদ্যমান থাকে।

'লং, বং, রং, যং, হং' ইহারা বিজ্ঞানময় কোষের পাঁচ প্রকার বোধের ধ্বনি-বোধ। 'লং, বং, রং, যং এবং হং' ইহারা ৫টী বিজ্ঞান-ধ্বনি। ইহাদের মধ্যে 'হং'কার এই ধ্বনি পাঁচটীরও সূক্ষ্মতম পরিণতি। তাই 'হং'কারই শব্দের সূক্ষ্মতম মাত্রা। ইহার মধ্যে 'অং'কার ক্রিয়াশীল মাত্রা এবং ':' ক্রিয়াশীলতার শেষ আধার।

বিজ্ঞানময় কোষের বোধের দুইটা দিক আছে। উহারা স্পর্শ-বোধ এবং ধ্বনি-বোধ। গন্ধ-পরমাণু, রস-পরমাণু, রূপ-পরমাণু এবং স্পর্শ-পরমাণু। স্পর্শের সহিত 'লং, বং, রং, যং' ধ্বনিও বিদ্যমান থাকে। এবার আমরা বিজ্ঞানের বোধের মধ্যে স্পর্শ-অংশ ত্যাগ করিয়া ধ্বনি-অংশে স্থিত হইতে চাই। বিজ্ঞাতা যদি বোধের মধ্যে স্পর্শ-অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল ধ্বনি-অংশে স্থিত হইতে পারেন তবেই বিজ্ঞাতা শব্দ-বিজ্ঞানে স্থিত হইলেন। শব্দ-বিজ্ঞানে 'লং, বং, রং, যং' এবং ইহাদের সূক্ষ্মতম মাত্রাতে 'হং' এই পাঁচটী শব্দ বিদ্যমান। তুমি সুষুপ্তির স্তরে নিদ্রিত আছ; তোমার নিকট দুইজন লোক বাক্‌যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া ঝগড়া করিতেছে। তুমি হঠাৎ জাগিয়া দেখিলে দুইজন লোক ঝগড়া করিতেছে। নিদ্রাভঙ্গে তুমি বুঝিতে পারিলে যে ইহাদেরই ঝগড়ার

জন্য তুমি জাগিয়া গিয়াছ। এবার তুমি বিচার কর "তুমি কেমন করিয়া জাগিলে"। তুমি যদি উহাদের ঝগড়ার শব্দ না শুনিতে পাইতে তবে তুমি জাগিতে পারিতে না। আর যদি তুমি উহাদের ঝগড়ার বিষয় কোন কথা শুনিয়া থাক তবে তুমি বল, তুমি কি শুনিয়াছ? এখানে তোমার শুনা যদি অসিদ্ধ হয় তবে তোমার জাগিয়া উঠাও সিদ্ধ হয় না! আবার তোমার শুনা যদি সিদ্ধ হয় তবে তুমি কেন বলিতে পারিবে না "তুমি কি শুনিয়াছ"? এবার নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর:—

বিজ্ঞানময় কোষে ধ্বনিগুলির মূল অংশ শ্রুত হয়; অর্থাৎ যত রকমের কথাই হউক না কেন, বিজ্ঞানময় কোষে 'হং, যং, রং, বং এবং লং' ভিন্ন কোন ধ্বনিই বিজ্ঞাত হইবে না। অ হইতে অঃ পর্য্যন্ত ১৬টী স্বর এবং ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ৩৪টী ব্যঞ্জনের সৃষ্টির মূলে 'হং, যং, রং, বং এবং লং' শব্দস্থিত ধ্বনিগুলিই বিদ্যমান।

'হং, যং, রং, বং এবং লং' এই শব্দগুলির মধ্যে যে কয়টা মূল ধ্বনি আছে উহা বাহির করিয়া লওয়া যাক্।

ঃ+অ+ং=হং

ই+অ+ং=যং

ঋ+অ+ং=রং

উ+অ+ং=বং

ঌ+অ+ং=লং

এই কয়টীতে ঃ, অ, ং, ই, ঋ, উ এবং ঌ এই ৭টী ধ্বনি বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে মন্ত্র-অংশে বর্ণিত অ, উ, ঋ, ঌ, ং এবং ঃ এই ৭টী ধ্বনিই বিদ্যমান আছে।

ধ্বনিগুলি অনাদি শক্তিরূপে অবস্থিত থাকিলেও মহতের মধ্য দিয়াই ইহারা ধ্বনি-আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সমস্তটা

সৃষ্টিই (জ্ঞান সৃষ্টি, বিজ্ঞান-সৃষ্টি, মানস-সৃষ্টি ও স্থূল-সৃষ্টি) মহতের মধ্য দিয়া অনাদি শক্তি হইতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। অ, ই, প্রভৃতি শক্তিরূপে অনাদি, কিন্তু মহৎ-তত্ত্বের মধ্য দিয়া না আসিলে ইহারা ধ্বনি রূপে পরিণত হইতে পারে না। যতক্ষণ ইহারা ধ্বনিরূপে পরিণত হইবে না, ততক্ষণ জীবের কণ্ঠ হইতে ইহারা ধ্বনিরূপে * বিকশিত হইতেও পারে না। ইহারা যতক্ষণ অনাদি শক্তিরূপে অবস্থিত ততক্ষণ ইহারা শক্তি বা সৃষ্টির মূল উপাদান। ইহারা তখন আমাদের শ্রুতির বিষয় হয় না। শক্তিস্তরে শক্তিকণার গতি আছে, কিন্তু ধ্বনি নাই। পরে যথাসময়ে আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল। সমস্তটা সৃষ্টিই মহতের কোলে অবস্থিত। মহৎ হইতে ধ্বনিগুলি কি ভাবে বিকশিত হইয়াছে তাহা আমরা পরে বলিতেছি।

'কং, খং, গং, ঘং, ঙং' এই শব্দগুলি বিজ্ঞানের কেন্দ্রে কেবল 'হং হং হং হং হং (?)' এরূপ বিজ্ঞাত হইবে। এই বিজ্ঞানে শান্তি-মিশ্রিত স্ফটিক বর্ণ মাত্র ফুটিবে। এই ৫টী ধ্বনিতে কেবল 'সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ' এর ভেদ মাত্র হইবে; অর্থাৎ 'কং' এর প্রতিনিধি 'হং' (?) সত্ত্ব-গুণ-সম্পন্ন 'হং' (?), 'খং' এর প্রতিনিধি 'হং' (?) সত্ত্বঃ-রজঃ মিশ্রিত গুণ সম্পন্ন 'হং' (?), 'গং' এর প্রতিনিধি 'হং' (?) রজো গুণ সম্পন্ন 'হং' (?) 'ঘং' এর প্রতিনিধি রজস্তমঃ গুণ সম্পন্ন 'হং' (?) এবং 'ঙং' এর প্রতিনিধি 'হং' (?) তমোগুণসম্পন্ন 'হং' (?) হইবে। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমোভেদে সমস্ত

---

* এখানে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে ধ্বনিগুলি যে "শক্তি" ইহার প্রমান কি? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমান যাহারা বুঝিতে চাহে তাহারা উপযুক্ত গুরুর নিকট বীজ মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ১০।৫ দিন মন্ত্রযোগ অবলম্বন করিয়া সাধনা করুন। মন্ত্রশক্তির প্রভাবে মনে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় বুঝিতে পারিবেন। বহুদিন সাধনার পর ধ্বনিগুলির মধ্যে যে শক্তির সন্ধান আছে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

'ক' বর্গে একই 'হং' অবস্থিত। বিজ্ঞানের স্তরে ক বর্গের প্রতিনিধি 'হং' (ইহার উচ্চারণ ঠিক'অং' কারের মত ; এসম্বন্ধে পরে বলা হইবে)। যত উচ্চ স্বরেই চিৎকার কর, আর ধীরেই বল, বিজ্ঞানময় কোষে সব ধ্বনিই একই মাত্রাতে বিজ্ঞাত হইবে। তুমি তোমার অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা তোমার শরীরের কোন এক স্থানে খুব ধীরে স্পর্শ কর, বিজ্ঞানের স্তরে ধ্বনি-কম্পন বিজ্ঞাতাকে উহা হইতে অতি ধীরে স্পর্শ মাত্র করে ; চীৎকারেও উহা অতি সামান্য স্পর্শ-বোধ হইবে ; ধীরে বলিলেও ঠিক ঐরূপই হইবে। বিজ্ঞানের বোধে শব্দের উচ্চ বা ধীরের ভেদে কোন ভেদ হইবে না। যে কোন শব্দ-বোধই উচ্চ এবং ধীরে একই পরিমাপে বিজ্ঞাতাকে স্পর্শ করিবে। 'ক'কে যত উচ্চেই বল, আর ধীরেই বল, উহা খ হইতে কম বেগে বিজ্ঞাতাকে স্পর্শ করিবে। ওখানে ক, খ এর ভেদ আছে, কিন্তু একই ধ্বনির উচ্চ নীচ ভেদ নাই।

'চ' বর্গের বিজ্ঞান-প্রতিনিধি 'যং' ; অর্থাৎ চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করে না। ইহাদের যে কোন শব্দের বিজ্ঞান প্রতিনিধি 'যং' ; ইহা ধূম্রবর্ণ শান্তি-বোধ। ট বর্গের (টং, ঠং, ডং, ঢং, ণং) বিজ্ঞান-প্রতিনিধি 'রং' ; ইহা লোহিতবর্ণ শান্তি-বোধ। প বর্গের (পং, ফং, বং, ভং, মং) বিজ্ঞান-প্রতিনিধি 'বং' ; ইহা শুভ্রবর্ণ শান্তি-বোধ। ত বর্গের (তং, থং, দং, ধং, নং) বিজ্ঞান-প্রতিনিধি 'লং' ; ইহা পীতবর্ণ শান্তি-বোধ। বোধটাই ধ্বনি জানিতে হইবে। অর্থাৎ পীতবর্ণ শান্তি-বোধ এবং লং ধ্বনি এক কথা জানিতে হইবে। সাধক বোধে ডুবিয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন। বোধের ~~কম্পন~~ স্পন্দন বা ক্রিয়া আছে। ক্রিয়া হইলেই ধ্বনি হইবে। যাহা হউক পাঠক জানিয়া রাখুন বোধই এখানে ধ্বনি। সাধক ভূতশুদ্ধির স্তরে অবস্থিত হইয়া লং জপ করুন, দেখিবেন পীতবর্ণ শান্তি-বোধ ফটিয়া উঠিয়াছে।

আমরা সুষুপ্তিতে স্থিত হইলে আমাদের বিজ্ঞানময় কোষ যে জাগ্রত থাকে তাহার প্রমাণ আমরা দিয়াছি। আবার সুষুপ্তিকালে আমরা যে ধ্বনি শুনিতে পাই কিন্তু কি শুনিনাম উহা কেন বলিতে পারি না উহা মোটামুটি বুঝিয়া লইলাম; অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আমাদের বিজ্ঞানময় কোষ জাগ্রত থাকে, আর বিজ্ঞানময় কোষে 'হং, যং, রং, বং, লং' ভিন্ন অন্য কোন ধ্বনি প্রবেশ করে না। সুষুপ্তিতে মনোময় কোষ অর্থাৎ চিত্ত, বুদ্ধি এবং মন অংশ নিদ্রিত থাকিলেও আমরা বিজ্ঞান স্তরের মধ্য দিয়া ধ্বনিরূপেই গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ মাত্রাকে বোধ করিয়া থাকি। একটী ছোট বটবীজের মধ্যে একটী বটবৃক্ষ যেমন সূক্ষ্ম রূপে বিরাজ করে, ঠিক সেইরূপ মাত্রা বোধ-বীজের (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধমাত্রা) মধ্যে আমাদের জ্ঞেয় বিষয়ের সমস্ত উপাদান বীজরূপে অবস্থান করে। মনোময় কোষের বিভিন্ন কেন্দ্র স্পর্শ করিয়া সেই মাত্রা স্পর্শটী নাম, রূপ, আকার, দেশ, কাল, পাত্র, ভাল, মন্দ, প্রিয়, অপ্রিয়, রূপে পরিণত হয়।

জীবের প্রাণক্রিয়া ও মনের চিন্তাগুলিও ধ্বনিময়; সেই সব ক্রিয়াও ধ্বনিরূপে আমাদের বিজ্ঞানময় কোষের মধ্য দিয়াই আমাদের মনোময় কোষের নিকট উপস্থিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় কোনস্থানে নিদ্রিত আছি; কোন কিছু ভীষণ বিপদের সূত্রপাত হইবার পূর্ব্বক্ষণেই জাগিয়া গেলাম। সেই সময়েও বিজ্ঞানময় কোষের মধ্য দিয়া বোধধারা আসিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া দিয়াছে। জাগিয়াই দেখা গেল "কালরূপী শত্রু নিকটে অবস্থিত"। সে নিতান্ত নিঃশব্দে নিজের কাজ হাসিল করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু তাহার মনোময় কোষে উত্থিত ভাবরাশী ধ্বনিরূপে আসিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া শত্রুর মানস-ক্রিয়া ধ্বনিরূপে আমাদের বিজ্ঞাতাকে যে স্পর্শ করে ইহার প্রমাণ

বহুলোকই নিজের জীবনে বুঝিতে পারিবেন। বিজ্ঞান-বোধের দুইটা দিকের একটা ধ্বনি-বোধ এবং অন্যটা স্পর্শ-বোধ। স্পর্শ-বোধের সহিত বিজ্ঞানের বোধের শান্তি-বোধ বিদ্যমান থাকিবে; অর্থাৎ এই শান্তি-বোধ যতক্ষণ বিদ্যমান ততক্ষণ বিজ্ঞানের স্তরে স্পর্শ-বোধ হইতেছে এবং 'অহঙ্কারটী' আছে জানিতে হইবে। বিজ্ঞানের বোধে শান্তি-বোধটী না থাকিলে স্পর্শ-বোধটী আর ফুটিবে না। তখন ধ্বনি-বোধ (স্ফটিকবর্ণ বোধ) মাত্রই বিদ্যমান থাকিবে। (সুষুপ্তিতে ধ্বনি-বোধ এবং শান্তি-বোধ দুইই বিদ্যমান থাকে)।

কথাগুলি একটু পরিষ্কার করিয়া দিই। বিজ্ঞানময় কোষে ৩টী কেন্দ্রে কাজ হয়। একটী বুদ্ধি-কেন্দ্র; ইহার কাজ হইল স্থিরভাবে একটা বস্তুকে ধরিয়া রাখা। দ্বিতীয়টী অহঙ্কার কেন্দ্র; ইহার কাজ হইল শান্তিকে বিকীরণ করা। তৃতীয়টী মহৎ-তত্ত্ব; ইহাই বোধ-শক্তি। বোধ (জ্ঞান) শান্তি এবং স্থিরতা এই তিনটী মিলিয়া বিজ্ঞানময়-কোষের অনুভূতি হয়। গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ বিজ্ঞানের প্রত্যেকটীতেই ঐ তিনটী কেন্দ্রীয় শক্তি বিদ্যমান। বোধ মানেই ধ্বনি-বোধ ধ্বনিগুলিই বোধ বা জ্ঞান-প্রতীক। মহৎ-তত্ত্বের কেন্দ্রে বোধকে আমরা ধ্বনি-বোধ নামে প্রকাশ করিতে পারি।

মহৎ-কেন্দ্রকে মিটাইয়া দিলে বোধ আর হইবে না। অহঙ্কার কেন্দ্রকে মিটাইয়া দিলে কোন বোধ ধারাই মনোময় কোষে প্রবেশ করিবে না। বিশুদ্ধ বোধ বিজ্ঞান-কেন্দ্রে আসিয়া বিভক্ত বোধ হয়, অহং-কেন্দ্রে আসিয়া উহাতে শান্তি সংযুক্ত হয় এবং এই শান্তি-বোধের মধ্য দিয়াই উহা মনোময় কোষে প্রবেশ করে।

প্রথমে 'ধ্বনি-বোধ'। এই ধ্বনি-কেন্দ্রই মহৎ-কেন্দ্র। সমস্তটা সৃষ্টিই এই মহতের আশ্রয়ে অবস্থিত। এই মহৎই (গীতার) মহৎ ব্রহ্ম। এই মহৎ ব্রহ্মই জীবমাত্রের আদি জননী। এই মহতের গর্ভেই

সমস্তটা সৃষ্টি অবস্থিত। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সবই এই মহতের গর্ভ-মধ্যস্থিত। এই মহতের গর্ভেই আমি, তুমি ও সকলে। মৎস্য যেমন জলের গর্ভে বিচরণ করে ঠিক সেইরূপ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এই মহতের গর্ভেই স্থিত। সকলেই এই মহতের গর্ভে ডুবিয়া রহিয়াছে এই মহৎ মানে জ্ঞান-জগৎ, ধ্বনি-জগৎ। এখানে কেবলই ধ্বনির খেলা আমাদের যত কিছু বোধধারা বাহিরে বা ভিতরে—এই মহতের মধ্য দিয়াই আসা যাওয়া করে। তোমাতে আমাতে কোনপ্রকার আদান প্রদানের প্রথম স্থান মহৎ জগৎ। বিস্তারিত বলিবার নাই, ইহা এতই জটীল বিষয় বিস্তারিত বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা পরিশ্রম হইবে। যাঁহারা বুঝিবেন তাঁহারা এই সামান্য ইঙ্গিতেই বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক প্রথম ধ্বনি-বোধ, তাহার পর বিজ্ঞান ও শান্তি-বোধ। যে কোন বোধই প্রথমে মহতের কেন্দ্রে যায়। তাহার পর বিজ্ঞানময় কোষের অন্যান্য কেন্দ্রে ঐ বোধ চলিয়া আসে। ইহার পর ঐ বোধ মনোময় কোষের বিভিন্ন কেন্দ্রে আসিয়া থাকে। মহতের কেন্দ্রে ধ্বনি-মাত্রায় উহার প্রথম বোধ; পরে বিজ্ঞানময় কোষে গণেশ এবং অভিমানের কেন্দ্রে আসিলে উহাতে শান্তি-স্পর্শ-বোধ মিলিত হয়। ইহাকেই আমরা স্পর্শ-বোধ বলিয়াছি। তন্মাত্রার ধ্বনি-বোধই বিজ্ঞানময় কোষের মহৎ অংশ এবং তন্মাত্রার স্পর্শ-বোধই বিজ্ঞানের নিম্নাংশ। বিজ্ঞান ক্ষেত্রকে বুঝিবার জন্য বিজ্ঞানাংশ এবং জ্ঞানাংশ এইরূপ ভাবে ভাগ করিয়া লইলাম। মহৎ অংশই জ্ঞানাংশ, ইহাই ধ্বনি-বোধ; এবং নিম্নাংশই বিজ্ঞানাংশ। বিজ্ঞানাংশে কেন্দ্র তিনটী; গণেশ, শিব ও মহৎ (৭, ৪, ৫ কেন্দ্র) এবং জ্ঞানাংশে কেন্দ্র দুইটী; গণেশ ও মহৎ (৭, ৫ কেন্দ্র)।

বিজ্ঞানাংশে শব্দসমষ্টি পাঁচটী ; 'হং, যং, রং, বং, লং'। এবং জ্ঞানাংশে শব্দ মাত্র একটীঃ- 'হং', বিজ্ঞানাংশের শব্দ ৫টীকে বিশ্লেষণ করিলে ঃ, ং, অ, ই, উ, ঋ, ৯ এই ৭টী ধ্বনি পাওয়া যায়। জ্ঞানাংশকে বিশ্লেষণ করিলে ৩টী ধ্বনি পাওয়া যায় ঃ, অ, ং।

ঃ, অ, ং মিলিয়া 'হং' হয় ; এই 'হং'ই পুরুষ। ইহাই সাংখ্যের পুরুষ। গীতাকার এই পুরুষকেই অক্ষর পুরুষ বলিয়াছেন। অক্ষর-পুরুষ অর্থে অবিনাশী পুরুষ। এই পুরুষ না মানিলে সৃষ্টি মানা চলে না। সৃষ্টি না মানিলে এই সব বিচার বিতর্কও চলে না। (বেদান্তবাদীরা সৃষ্টি মানেন না, কিন্তু বিচার বিতর্কটা খুব করেন)। বেদান্তদর্শনের ভিত্তি শক্তি-স্তর। আমরা এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। সে স্তরে না দাঁড়াইলে বেদান্ত কেবল কথার কথা হয় মাত্র। সে স্তরে দাঁড়াইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টি না মানা অর্থে-আত্ম-প্রবঞ্চনা করা। যাহা হউক সাংখ্যের পথে সৃষ্টি তত্ত্ব মানিতে হইলে পুরুষ প্রকৃতিকে অনাদি মানিতে হয়। পুরুষ প্রকৃতিকে অনাদি মানিতে হইলে সৃষ্টি-কেও অনাদি মানিতে হইবে। মহৎ-তত্ত্ব পর্য্যন্ত বিকাশে সাধক সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহাতে পুরুষ প্রকৃতিকে অনাদি মানিতেই হইবে। ইহাই সাংখ্য ভিত্তিতে সৃষ্টি-তত্ত্ব। সাংখ্য বহু পুরুষ মানিয়াছেন। বহুপুরুষ অনাদি কি করিয়া হইবে? এরূপ প্রশ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তাই যতক্ষণ একই তত্ত্বে যাইয়া আমরা দাঁড়াইব না ততক্ষণ সৃষ্টির মূল বাহির হয় নাই জানিতে হইবে। কাজেই সাংখ্য যতটা বলিয়াছেন উহা খুব ঠিক কথা হইলেও সৃষ্টির শেষ মীমাংসা এখানে হয় নাই। বহুপুরুষ মানিলে এই বহুপুরুষ কোথা হইতে আসে ইহাও স্থির করা প্রয়োজন। কাজেই সৃষ্টির শেষ মীমাংসা এই স্তরে হইবে না।

এখানে আমরা যে সব কথার আলোচনা করিয়া চলিয়াছি ইহা সকলে বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না তাঁহারা বুঝিবার জন্য ব্যস্তও হইবেন না। সকল কথা সকলের প্রয়োজনেও আসিবে না। আসল কথা সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা না হইলে কর্ম্ম-তত্ত্বের মীমাংসা হয় না; তাই কর্ম্ম-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি-বিজ্ঞানের সূত্রপাত করিতে হয়।

সাংখ্যমতে সৃষ্টি-তত্ত্বের শেষ মীমাংসা হয় নাই। সাংখ্য মতে সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষের বিজ্ঞান এবং জ্ঞানাংশ সম্বন্ধে নিখুঁত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে. সৃষ্টির আনন্দময় * কোষ সম্বন্ধে কোন আভাষ উহাতে নাই।

সৃষ্টির আনন্দময় কোষে :, ँ, অ, ই, উ, ঋ, ৯, ইহারা শক্তিরূপে অবস্থিত। এই স্তরে ইহাদের এক একটীতে এক এক প্রকার শক্তি নিহিত আছে। ইহাদের সকলের মিশ্রনে শক্তির পূর্ণ বিকাশ। ইহাই পূর্ণ শক্তি-কণা বা পুরুষোত্তম। এই কথাগুলি আমরা একটু ভাষান্তর করিয়া প্রকাশ করিতে চাই। সৃষ্টির মূলে পূর্ণ-শক্তি বিদ্যমান। এই পূর্ণ-শক্তিতে সাত প্রকারের শক্তির সংস্থান আছে; এই সাত প্রকার শক্তি মহৎ আদি ব্যক্ত সৃষ্টির মূলে অবস্থিত। ইহারাই অব্যক্ত শক্তি (কর্তৃত্ব-শক্তি), জ্ঞান-শক্তি,

---

*আনন্দময় কোষ শব্দটী আমরা যে স্তরের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করিয়াছি উহা শক্তিস্তর। অনেক দার্শনিকগণ ইহাকে যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন উহাতে আমাদের দেওয়া সংজ্ঞায় ভেদ হইবে। সে সব দর্শন ব্যাখ্যাকারগণ আনন্দময় কোষ ও বিজ্ঞনাময় কোষের যেরূপ লক্ষণ প্রদান করেন তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে তাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষ অর্থে বুদ্ধি কেন্দ্রের কাজ এবং আনন্দময় কোষ অর্থে চিত্ত-কেন্দ্রের কাজকে (সুখের স্তরকে) নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। আমরা আনন্দময় কোষ যেরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি পাঠকগণ ইহা শক্তি-স্তর রূপে গ্রহণ করিবেন।

ইচ্ছা-শক্তি, বিজ্ঞান-শক্তি, শান্তি-শক্তি, কর্ম্ম-শক্তি ও প্রাণ-শক্তি। অব্যক্ত-শক্তি কৃষ্ণবর্ণ শক্তি-কণা, জ্ঞান-শক্তি স্ফটিকবর্ণ শক্তি-কণা, ইচ্ছা-শক্তি অরুণবর্ণ শক্তি-কণা, বিজ্ঞান-শক্তি ধূম্রবর্ণ শক্তি-কণা, শান্তি-শক্তি শুভ্রবর্ণ শক্তি-কণা, কর্ম্ম-শক্তি অগ্নিবর্ণ শক্তি-কণা ও প্রাণ-শক্তি পীতবর্ণ শক্তি-কণা। এই স্তরে শক্তির গতি আছে, কিন্তু ধ্বনি নাই। ইহাই সৃষ্টির আনন্দময় কোষ। সৃষ্টির আনন্দময় কোষ এবং আমাদের শক্তি-স্তর এক কথা বুঝিতে হইবে।

সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষে সমস্ত সৃষ্টি জ্ঞান বা ধ্বনিময়। সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছি; সে সম্বন্ধেও বলা হইবে। সৃষ্টির আনন্দময় কোষের জ্ঞান-শক্তি এবং ইচ্ছা-শক্তির মিলনে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইচ্ছা-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তি মিলিত হইলে মহৎ-তত্ত্ব হয়। এই মহৎ-তত্ত্বই প্রথম ধ্বনি। ইচ্ছা-শক্তি 'অ' এবং জ্ঞান-শক্তি '৺' এই দুইএর মিলনে 'অং' ধ্বনিই মহৎ-তত্ত্ব। ব্যক্ত সৃষ্টির মূলে মহৎ-তত্ত্ব অবস্থিত। এই মহৎ-তত্ত্ব একাধারে ইচ্ছা এবং জ্ঞান-শক্তির আধার। এখান হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ এবং এখানেই সৃষ্টির অন্ত হয়।

শক্তি হইতে প্রথম সৃষ্টি ধ্বনিময়, নাদময় বা জ্ঞানময়। এই ধ্বনির প্রথম বিকাশ 'অং' ই মহৎতত্ত্ব। এই 'অং'এর সহিত ঃ বা অব্যক্ত শক্তি (কর্ত্তৃত্ব শক্তি) মিলিত হইলে (ঃ+অং) হং হয়। এই 'হং'ই গীতায় অক্ষর পুরুষ। ইনিই সাংখ্যের পুরুষ (ইনি পুরুষোত্তম নহেন)।

শক্তিস্তরের আশ্রয়ে এইরূপ ইচ্ছা-শক্তি কণাও জ্ঞান-শক্তি কণার মিলনে হয় ত বা কতশত সহস্র ব্যক্ত সৃষ্টির সূত্রপাত হইতেছে আবার কতশত সৃষ্টির প্রথম ব্যক্ত ভাব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইচ্ছা এবং জ্ঞানের মিলনেই সৃষ্টি; ইচ্ছা এবং জ্ঞানের মিলন ভাঙ্গিয়া গেলেই সৃষ্টি আর থাকে না। ইচ্ছার প্রাধান্যে সৃষ্টির আরম্ভ এবং জ্ঞান-প্রাধান্যে সৃষ্টির শেষ হয়।

ইচ্ছা ও জ্ঞান-শক্তির মিলনে যে স্তর সৃষ্ট হইল ইহা মহৎ-জগৎ। এই মহতের কোলে অন্যান্য শক্তিগুলি আসিতে থাকিলে শক্তিরূপে স্থিত সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার অনাদি উপাদান ধ্বনিরূপে পরিণত হয়। শক্তি হইতে ধ্বনিরূপে পরিণত সৃষ্টির এই স্তরই বিজ্ঞানময় কোষের জ্ঞানাংশ। মহৎ-তত্ত্ব বা ইচ্ছা+জ্ঞানশক্তি সৃষ্টির শক্তিরূপস্থিত অনাদি উপাদানকে নিজের কোলে আশ্রয় দিলে ধ্বনিময় সৃষ্টি হয়; শক্তিরূপী সৃষ্টির উপাদান ধ্বনিরূপে বিবর্ত্তিতা হয়। এই ধ্বনিময় সৃষ্টিকে বিজ্ঞান-শক্তি (ই) এবং শান্তি-শক্তি (উ) নিজের কোলে তুলিয়া লয়। এইরূপে তুলিয়া লইবার দরুণ ধ্বনিময় সৃষ্টি বিজ্ঞানময় হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞান অংশ বুঝিবার জন্য দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিলাম। উহার একাংশ ধ্বনিময় অন্যাংশ শান্তি-ময়। জ্ঞানময় সৃষ্টিকে বিজ্ঞানময় করিবার মূলে বিজ্ঞান-শক্তি (ই) বিদ্যমান্; এই বিজ্ঞান-শক্তি জ্ঞানময় সৃষ্টিকে নিজের কোলে স্থান দিয়া জ্ঞানময় সৃষ্টিকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করে ইহার পর 'উ'কার শক্তি (শান্তি-শক্তি) আসিয়া ঐ বিভিন্ন প্রকারে বিভাজিত সৃষ্টির ধ্বনিময় উপাদানকে নিজের কোলে টানিয়া লয়, যাহার ফলে সেই উপাদানে শান্তির অংশ আসিয়া যায়। এই পর্য্যন্তই সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষ। ধ্বনিময় অংশই জ্ঞানাংশ এবং শান্তিময় অংশই বিজ্ঞানাংশ। শক্তি হইতে সৃষ্টির বিবর্ত্তনে যে স্তরে সৃষ্টির অনাদি উপাদানগুলি ধ্বনিরূপে পরিণত হয় ব্যক্ত শক্তির ঐ স্তরের নাম জ্ঞান-জগৎ। এই ধ্বনিময় সৃষ্টির উপাদানকে শান্তি ও বিজ্ঞান-শক্তি নিজের কোলে তুলিয়া লয়। এই বিজ্ঞানও শান্তি মিশ্রিত জ্ঞান বা ধ্বনিময় সৃষ্টিই সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষ। বিজ্ঞানের স্তরে 'ই' এবং উ' শক্তি জ্ঞানময় সৃষ্টিকে ধারণ করিয়াছে। এই পর্য্যন্তই সৃষ্টির বিজ্ঞানময় কোষ। ইহাই আমাদের গ্রন্থে বিবর্ত্তনের দিক দিয়া শিব। পাঠকগণ! ক্রম-বিকাশের পথে শিব-স্তরের আলোচনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন।

বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত সৃষ্টির বিবর্ত্তন ইঙ্গিত চিত্র।
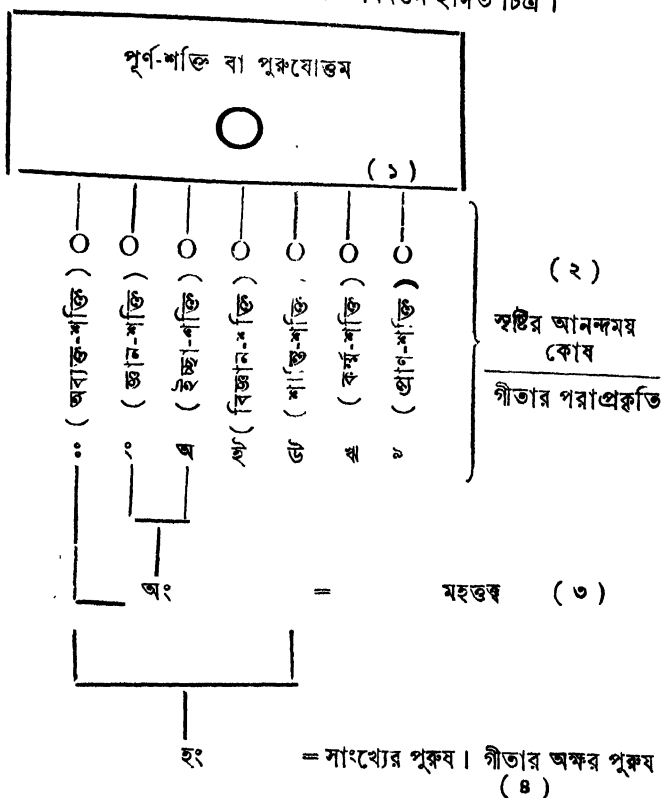
(১) পূর্ণশক্তি স্তর। এই স্তরে সপ্ত শক্তি ঃ, ং, অ, ই, উ, ঋ ঌ একই শক্তিরূপে অবস্থিত; ইহাই গীতার পুরুষোত্তম।

(২) সপ্ত-শক্তির স্তর। এই স্তরে সপ্ত শক্তি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত; বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে, ইহাই সৃষ্টির আনন্দময় কোষ। এই আনন্দময় কোষ হইতেই সৃষ্টির বিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহাই

গীতার পরা-প্রকৃতি। (সাধকগণ জানিয়া রাখিবেন—অনুভূতিতে পুরুষোত্তম স্তর ও সপ্ত শক্তির স্তর রূপে দুইটা স্তর পাওয়া যায় না। সপ্ত শক্তি পুরুষোত্তম স্তরের অন্তর্গত সপ্তশক্তি। একটা স্তরকেই পাঠকগণের সুবিধার জন্য দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন মনে করি না।)

(৩) মহত্তত্ত্ব। ইহাই সমস্ত ব্যক্তসৃষ্টির প্রথম জননী। মূল সপ্ত শক্তির দুইটী শক্তি মিলনে এই স্তর প্রথম সৃষ্টি হয়। চিত্রে 'অ' ইচ্ছা-শক্তি এবং '৺' জ্ঞান-শক্তি এই দুইএর মিলন দেখান হইয়াছে এই 'অং' ই মহত্তত্ত্ব।

(৪) গীতার অক্ষর পুরুষ; ইনিই সাংখ্যের পুরুষ। অব্যক্ত-শক্তি (কর্তৃত্ব শক্তি 'ঃ') মহত্তত্ত্বে মিলিত হইলে এই পুরুষ উৎপন্ন হয়। চিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। এই পুরুষ হইতেই সমস্ত ধ্বনি-জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইনি অক্ষর-পুরুষ; ইঁহার প্রকৃতিকে আমরা অক্ষরা-প্রকৃতি নামে অভিহিত করিব। 'হং' অক্ষর-পুরুষ। ক্ষ য স ইহারা অক্ষরা-প্রকৃতি। গীতায় বা কোন শাস্ত্রেই ক্ষরা বা অক্ষরা প্রকৃতির উল্লেখ নাই। আমরা বুঝিবার জন্য এইরূপ নাম প্রয়োগ করিলাম। এ সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে। সাংখ্যের মতে এই অক্ষর-পুরুষ এবং এই অক্ষরা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। অর্থাৎ এই অক্ষর-পুরুষ এবং অক্ষরা প্রকৃতি সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি। সাংখ্যে শক্তি-স্তরের সন্ধান নাই, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাংখ্যের বিচারে যাহা পুরুষ শক্তি-স্তরের বিচারে উহা অব্যক্ত, জ্ঞান ও ইচ্ছা-শক্তির মিলন। আবার সাংখ্য বহুপুরুষ যদি বলিতে চান তবে উহা অহং-তত্ত্বই হইবে। পরে বিস্তারিত বলা যাইতেছে।

সৃষ্টির মনোময় কোষের মূল বুঝিতে হইলে অহং-তত্ত্ব প্রথম বুঝা প্রয়োজন। অহং-তত্ত্বের উৎপত্তি না হইলে মনোময় কোষও উৎপন্ন

হয় না। অহং-তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মনোময় কোষ জীবিত থাকে। অহং-তত্ত্ব ভাঙ্গিয়া গেলে মনোময় কোষও ভাঙ্গিয়া যায়। তখন মনোময় কোষের শক্তিগুলি মূল সপ্ত-শক্তির অন্তর্গত হইয়া যায়।

মহত্তত্ত্বে পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বিত হইলে অহং-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়; এই অহং-তত্ত্বই জীব মাত্রের অভিমান। মহত্তত্ত্বের যে অংশে (১ কলা, ২ কলা ইত্যাদি) পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বিত হয়, অহংকারটী তেমনই শক্তিসম্পন্ন বীজরূপে পরিণত হয়। ১ হইতে ৭৷৷০ কলা পর্যন্ত্য অহং-তত্ত্বে বিকাশ থাকিতে পারে।

অহংতত্ত্বের মাতৃস্থান মহৎগর্ভ, পিতৃস্থান পুরুষোত্তম প্রতিবিম্ব। এই অহং-তত্ত্বই বীজরূপী জীব। মহত্তত্ত্বে ইহার উৎপত্তি হয় এবং শান্তি-শক্তি ইহাকে নিজের কোলে আশ্রয় দেয়।

শান্তির কোলে অবস্থান করিতে করিতে শান্তির প্রভাব এই বীজে আসিয়া যায়। শান্তি উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে অহংতত্ত্বে অভিমান আসিয়া যায়। পাঠকগণের মনে থাকিবে "আমরা শিব অংশে বলিয়াছি সুষুপ্তিকালে জীবমাত্রই নিজ নিজ অহংকারস্থিত শান্তির কোলে বিশ্রাম কর।" শান্তি মিশ্রিত অহংতত্ত্বে বিজ্ঞানশক্তির প্রভাব আসিলে এই বীজে বিজ্ঞান শক্তি (বুদ্ধিশক্তি আসিয়া যায়। পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বকে মহত্তত্ত্ব নিজের কোলে স্থান দিবার দরুণ সেই প্রতিবিম্বের জ্ঞান ও ইচ্ছা শক্তি আসিয়াই গিয়াছিল। জ্ঞানের অংশ-তারতম্যই বীজটিকে স্থূল পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জাদি বিভিন্ন স্তরের জীবে পরিণত করিবে। যাহা হউক বীজটিতে মনোময় কোষের শান্তি (অভিমান) বুদ্ধি, মন ও জ্ঞান-শক্তির অংশ যে ভাবে আসিয়াছে তাহা পাঠকগণ বুঝিলেন। বীজ জগতে অবস্থান কালেই বীজে ঐ সব শক্তি আসিয়া যায়। ইহার মধ্যে জ্ঞান ও ইচ্ছা শক্তি সে মহৎ গর্ভেই লাভ করিয়াছে। এই জ্ঞান শক্তিই মুক্তির প্রেরণা দেয় (মুক্তি মানে নিজেকে জানা) এবং ঐ ইচ্ছা

শক্তি জীবের অন্তরে সৃষ্টির চেষ্টা রূপে অবস্থিত। এই পর্য্যন্ত ও বীজ টী প্রকৃতির বিজ্ঞানময় কোষেই আছে। এবার প্রকৃতির মনোময় কোষ এই বীজটীকে নিজের কোলে টানিলে মনোময় কোষস্থিত শক্তি ইহাতে সংযোজিত হইবে।

অহং তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থূল শরীর পর্য্যন্ত সমস্তটাই গীতার ক্ষর-পুরুষ। ভূমি, অপ, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং অহংকার ইহারা এই ক্ষর পুরুষের(অহংতত্ত্বই গীতার ক্ষর পুরুষ)৮টী ক্ষরা, প্রকৃতি। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জড়ায়ুজ, সাধারণ, মানুষ গণেশ সূর্য্য ও বিষ্ণু স্তরের মানুষ সকলেই ক্ষর-প্রকৃতির কোলের পুতুল। ক্ষর-পুরুষ (অহং তত্ত্বই গীতার ক্ষর-পুরুষ)এবং ক্ষর-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা এখানে করিলাম না। বিজ্ঞানময় কোষের উপাদানগুলি মনোময় কোষে কিরূপে, ভূমি, অপ, আদি স্থূল পঞ্চভূতে পরিণত হয় এবং আমাদের শরীরে ঐ পঞ্চভূত কিরূপে স্থান পাইয়াছে, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় গুলির মূল উপাদান কোথ হইতে আসিয়াছে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অসম্ভব। তাই তৎসম্বন্ধে আলোচনা আমরা করিব না।

এপর্য্যন্ত আমরা পুরুষ তিনটী পাইলাম। প্রথম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ, ও তৃতীয় ক্ষর পুরুষ। প্রকৃতি ও তিনটী সাজান হইল পরা প্রকৃতি, অক্ষরা প্রকৃতি ও ক্ষরা প্রকৃতি।

সাধক ক্ষরা প্রকৃতির পরপারে অক্ষরা প্রকৃতির কোলে যাইবেন। মনোময় কোষের সৃষ্টি এবং আমাদের গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু স্তরের জ্ঞান এবং কর্ম্ম ক্ষরা প্রকৃতির অন্তর্গত বিকাশ জানিতে হইবে। অক্ষরা প্রকৃতি শিব-স্তরের বিকাশের অন্তর্গত। ক্ষরা প্রকৃতির পরপারে অক্ষরা প্রকৃতি অবস্থিত। অক্ষরা প্রকৃতির মূলে অনাদি শক্তি রূপে পরা প্রকৃতি বিদ্যমান। সাধক অক্ষরা প্রকৃতির কোল অতিক্রম

করিলে এ কথা স্পষ্ট জানিতে পারিবেন যে তিনি সব যুগেই পরা প্রকৃতির কোলেই ছিলেন। পরা প্রকৃতি আপন খেলা ঘরে পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বকে লইয়া খেলিতেছেন মাত্র। এই খেলার সঙ্গে সাধকের জ্ঞানউদয়ে আর কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না। সাধক তখন পুরুষোত্তম হইবেন। এরূপ খেলা প্রকৃতির স্বভাব। সাধক এক স্তরে ক্ষরা প্রকৃতির অধীন থাকেন, পরে অক্ষরা প্রকৃতির অধীন হন এবং অবশেষে পরা প্রকৃতির পরপারে পুরুষোত্তমে উপস্থিত হন।

অক্ষর পুরুষ হং। ইহার প্রকৃতি ক্ষ য স। অক্ষর পুরুষই সাংখ্যের পুরুষ। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি। অতএব পুরুষকে মানিবার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিচারে প্রকৃতিকেও মানিতে হইবে।

ঃ এবং অং বলিয়া হং হয়। এই 'হং'ই পুরুষ ক্ষ য স ইহারা এই 'হং' এর নিত্য প্রকৃতি।

প্রথম ধ্বনি অং। এই ধ্বনি স্থির হইলেই ঃ হয়। অতএব প্রথম ধ্বনিকে হং বলা যায়।

হং = পুরুষ।
|
ক্ষ য স = প্রকৃতি
| | |
সত্ত্ব রজঃ তমঃ

'হং' পুরুষ। ইঁহার প্রকৃতি ক্ষ য স ইঁহারা (ধ্বনি[illegible] প্রকৃতি) (শক্তি হইতে) প্রথম সৃষ্টির উপাদানে ধ্বনিই বিদ্যমান। পাঠকগণ এখন শক্তিস্তরের কথা ভুলিয়া যাইয়া এই পুরুষ প্রকৃতিকেই সৃষ্টির

মূলে স্থাপন করুন। 'হং' পুরুষ ধ্বনি ; ক্ষ ষ স * ঐ স্তরেরই ধ্বনি-প্রকৃতি। ক্ষ সাত্ত্বিক ধ্বনি-প্রকৃতি, ষ রাজস্-ধ্বনি প্রকৃতি ও স তামস ধ্বনি-প্রকৃতি।

---

* "স" সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়—ভারতীয় বর্ণমালায় তালব্য, মূদ্ধ'ণ্য ও দন্ত্য এই তিনটি 'স' আছে। আমরা ক্ষ (খ), ষ, স এই তিনটি 'স'কে হং এর প্রকৃতি রূপে প্রকাশ করিতেছি। 'ক্ষ' কে কেহই 'স' বলে না (?) কিন্তু আমরা 'ক্ষ' কে 'স' রূপে না হইলেও 'স' এর সমকক্ষ বা হংএর প্রকৃতি রূপে প্রকাশ করিয়াছি। 'স' গুলির উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলা যাইতেছে। তাহাতেই 'ক্ষ'কে 'স' বলিবার কারণ বুঝা যাইবে। লিখিবার বেলায় আমরা যেরূপ আকারেই লিখি না কেন, উচ্চারণ কে অবলম্বন করিয়াই জপে শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে। মূদ্ধ'ণ্য ষ'কে মূদ্ধ'ণ্য 'ষ' ও বলে আবার ইহাকে "খ" (ক্ষ) এর মত উচ্চারণ করিবার প্রথাও আছে। ইহারও কারণ থাকা প্রয়োজন। তালব্য শ কে আমরা প্রকৃতির কোন গুণেরই প্রতীক-রূপে স্থাপন করি নাই। কারণ তালব্য শ টি সত্ত্ব ও রজো গুণের মিশ্রন-ধ্বনি। যাহা হউক তালব্য শকে লইয়া 'স' হয় মোট চারটী।

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যেরূপ উচ্চারণ 'স' এর হয় উহা খাঁটী মূদ্ধ'ণ্য ষ। বাংলায় লিখিবার বেলায় তিনটি 'স' এর ব্যবহার থাকিলেও বলিবার বেলায় শুধু মূদ্ধ'ণ্য 'ষ' ই উচ্চারিত হইয়া থাকে। কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে 'স' এর তিন প্রকার উচ্চারণ হইয়া থাকে। দন্ত্য 'স' (ঠিক দন্ত্য স বলা যায় না ইহার উচ্চারণ পশ্চিমদেশে কতকটা দন্ত্য তালব্য স্থান হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে), মূদ্ধ'ণ্য ষ এবং কণ্ঠ্য 'ষ' (ক্ষ. খীয় বা খ) তালব্য 'শ'কে ঠিক তালু হইতে উচ্চারণ করিলে ইহার আওয়াজ প্রায় দন্ত্য 'স'এর মতই হইয়া থাকে। ঠিক ঠিক দন্ত্য 'স' সাধারণতঃ কেহই উচ্চারণ করে না। দন্ত্য 'স' কে সাধারণতঃ দন্ত্য-তালব্য স্থান হইতেই উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। তালব্য 'শ'কে কাশী অঞ্চলে ঠিক মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারণ করা হয়। মূর্দ্ধণ্য 'ষ' কে কথনও (খুব কম স্থানে) মূর্দ্ধা হইতে কখনও কণ্ঠ হইতে ('খ' এর মত) উচ্চারণ করিতে শোনা যায়। যাহা হউক কাশী অঞ্চলে উচ্চারিত 'স' তিনটী একটি দন্ত্য স, ২য় টি

হ এবং স একই ধ্বনির পুরুষ প্রকৃতির ভেদ লইয়া অবস্থিত হইবার দরুণই বহুস্থানের ভাষার মধ্যে স স্থানে হ বলিবার স্বাভাবিক প্রকৃতি

মূর্দ্ধণ্য 'ষ' (তালব্য 'শ'কে ইহারা মূর্দ্ধা হইতেই উচ্চারণ করে), ৩য় টী কণ্ঠ্য 'ষ', 'ক্ষ' (ক্ষীয়) বা 'খ'।

ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণের জন্য অ, ই, উ, ঋ এবং ঌ এই পাঁচটী ঘাট আছে। 'অ' কার সাত্ত্বিক ঘাট, ইকার সত্ত্বরাজস ঘাট, উকার রজঃতামস ঘাট, 'ঋ' কার রাজস্ ঘাট এবং 'ঌ' তামস ঘাট। 'অ' কারের ঘাট হইতে যে সব ধ্বনি উচ্চারিত হয় উহারা সাত্ত্বিক স্তরের ধ্বনি, ইহারা অ, হ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং ক্ষ (খ)। ইহারা জ্ঞানবর্দ্ধক ধ্বনি। 'ই' কারের ঘাট হইতে ই, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ এবং শ উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহারা সত্ত্ব-রাজস স্তরের ধ্বনি। ইহারা ত্যাগ এবং বিচারশক্তিবর্দ্ধক ধ্বনি। 'উ' কারের ঘাট হইতে উ, প, ফ, ব, ভ, ম উচ্চারিত হয়। ইহারা শান্তি বর্দ্ধক ধ্বনি। ইহারা রজ তামস স্তরের ধ্বনি। 'ঋ' কারের ঘাট হইতে ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, এবং (মূর্দ্ধণ্য) ষ উচ্চারিত হয়। ইহারা রাজস স্তরের ধ্বনি। ইহারা কর্ম্ম-শক্তি ও তেজ-বর্দ্ধক। ঌ কারের ঘাট হইতে ঌ, ত, থ, দ, ধ, ন এবং স (দন্ত্য) উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহারা তামস স্তরের ধ্বনি। ইহারা প্রাণশক্তি বর্দ্ধক ধ্বনি।

ঌ কারের ঘাটের বর্ণগুলি উচ্চারণ করুন ঐ স্থানে জিহ্বা রাখিয়া সিস্ দিলে যে 'স' উচ্চারণ হইবে উহাই দন্ত্য 'স'। ইহাই তামস স। কাশী অঞ্চলে এই স বেশ উচ্চারিত হয়। ঋ কারের ঘাটের বর্ণগুলি উচ্চারণ করিয়া 'ঋ' কার ঘাট স্থির করুন। এখানে জিহ্বা রাখিয়া সিস্ দিলে যে 'ষ' হইবে। উহাই মূর্দ্ধন্য ষ। বাঙ্গালী মাত্রই এই 'ষ' উচ্চারণ করিয়া থাকেন। (তালব্য 'শ' উচ্চারণ করিতে হইলে 'ই' কারের ঘাটে সিস্ দিন)। 'অ'কার ঘাটস্থিত বর্ণ উচ্চারণ করিয়া সেই ঘাটে জিহ্বা রাখিয়া সিস্ দিলে 'খ' এর মত উচ্চারণ হইবে ইহাই আমাদের সত্ত্ব গুণের ষ' বা ক্ষ (ক্ষিয়)। 'ষ'কার গুলি সিস্ ধ্বনি (Whistling Sounds)। ইহারা অন্যান্য ব্যঞ্জন বর্ণের মত স্থান স্পর্শে উচ্চারিত হয় না। 'ক্ষ' (ক্ষিয় 'স') এর ঠিক উচ্চারণ হয় না। ইহা পুরুষের ('হং' এর) খুব নিকটস্থ প্রকৃতি।

পাঠকগণ আমাদের এই সব কথা পড়িয়া কথা বলিবার বা পুস্তক পাঠ ব্যাপারে উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটাইবেন না। ভাষায় যাহা আছে থাকুক, যেমন

দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে কিছুদিন ভ্রমন করিলে একথা পরিষ্কার দেখা যাইবে। স এর ব্যবহার বেশী লোকই জানে না। স কে হ রূপে উচ্চারণ করার প্রথা অত্যন্ত প্রবল।

বলিয়া অভ্যস্ত বলিয়া চলুন, যেমন শিখিতে হয় শিখুন; ভাষা ও ধ্বনির যে বিজ্ঞান আছে ইহা বুঝানো ভিন্ন আমাদের অন্য কোন লক্ষ্য নাই। যাঁহারা মন্ত্রজপ করিবেন তাঁহারা ঠিক ঠিক উচচারণ শিখিয়া লইবেন। তাহা না হইলে শক্তি সঞ্চিত হইতে বাধা পাইবে। যাঁহারা ভাববাদী তাহারা ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভাবিয়া যাহা ইচ্ছা করুন, তবে যাঁহারা শক্তিলক্ষ্যে অগ্রসর হইবেন তাহারা যে বৈজ্ঞানিক ভাবে অগ্রসর হইবেন ইহা স্বাভাবিক।

ভারতীয় বর্ণমালা সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন চেষ্টা মাঝে মাঝে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধকদের মধ্যে ইহার পরিবর্ত্তন কখনও হয় নাই। ইহার কারন মন্ত্রযোগ সাধনায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রক্ষা করিয়াই ইঁহাদিগকে চলিতে হয়। বৌদ্ধ যুগে এই বর্ণমালায় ছাট কাট হইয়াছিল কিন্তু সাধকগণ ঐ ছাট কাটের বাহিরে থাকিতে বাধ্য ছিলেন। তাই যুগ পরিবর্ত্তনে বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা আবার ভাষায় স্থান পাইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় ভারতের নব্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বর্ণমালার ছাট কাটের স্বপ্ন জাগিয়াছে, কাজেই বর্ণমালার ছাটকাট হয় তো শীঘ্রই ফলবতী হইবে। কিন্তু প্রকৃত সাধকগণের মধ্যে ইহার কোন প্রভাবই প্রতি ফলিত হইবে না। ধ্বনি যে শক্তির স্বরূপ ইহা বুঝিবার মত শক্তি সাধন-জ্ঞানহান পুঁথিগত বিদ্যার পণ্ডিতের কোন যুগেই হইবে না। দেশের এবং সমাজের মঙ্গলের ছুঁতা ধরিয়া কাজের মত কাজ কিছু না করিয়া নাম করিবার সুযোগ করিবার জন্য যে সব নামী পণ্ডিত ফাঁদ পাতিয়া দিন কাটান তাঁহারা এসব সুযোগ ত্যাগ কেন করিবেন? বর্ণমালাগুলিকে কাজের মত ব্যবহার করিবার জন্য ইহাদের আকারের কিছু পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইতে পারে উহাতে বাধা দিবার লক্ষ্যে আমরা কোন কথাই বলিতেছি না। বর্ণমালার আকার সম্বন্ধেও তন্ত্রে যে সব কথা আছে তাহাতে এইরূপ আকারগুলি পরিবর্ত্তনও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। এক একটী বর্ণের আকারের কোন অংশটায় কিরূপ শক্তির সংস্থান. উহাও তন্ত্রে উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আমরা

সাত্ত্বিক প্রকৃতির সহিত পুরুষ-মিলনে যে ধ্বনি হইল উহা 'হং (?) "। রাজস প্রকৃতির সহিত পুরুষ-মিলনে যে ধ্বনির সৃষ্টি হইল উহা 'রং'। তামস-প্রকৃতির সহিত পুরুষ-মিলনে যে ধ্বনি হইল উহা 'লং'। সত্ত্ব রজঃ মিশ্রিত ধ্বনি-প্রকৃতির সহিত পুরুষ-মিলনে ধ্বনি হইল 'যং' এবং রজঃ তামস প্রকৃতির সহিত পুরুষ মিলনে ধ্বনি হইল 'বং'।

পুরুষ ভোক্তা প্রকৃতি ভোগ্যা। ধ্বনির বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থা আছে। দুইটা বস্তুর মিলনেই ধ্বনি হয়। এই ধ্বনির উত্থানে বাল্য, ধ্বনির পূর্ণ পুষ্ট অবস্থাই যৌবন এবং ধ্বনির লীন অবস্থাই বৃদ্ধাবস্থা জানিতে হইবে। ধ্বনির পূর্ণ যৌবনেই পুরুষ ধ্বনিকে ভোগ

করিতে চাই না। আমরা শুধু ধ্বনির দিক দিয়াই আলোচনা করিলাম। আকারের দিকটার আলোচনা যন্ত্রতত্ত্বের কথা। আমরা ধ্বনি-বিজ্ঞান (যন্ত্রতত্ত্ব নহে) লইয়া কথা বলিতেছি। ধ্বনিগুলিকে লিখিবার সুবিধার জন্য কোন কোন বর্ণের পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন যদি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না। তবে ইহা অত্যন্ত সত্যকলা যে আমরা বিদেশী অক্ষরে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার বিরোধী।

* এই হং আকাশ-তত্ত্ব। এই হংকারের ধ্বনিটী-প্রায় অংকারের মত। পুরুষ হং আর এই আকাশ-তত্ত্বের হং (?, এক নহে। এই আকাশ-তত্ত্বের প্রতীক 'হং' কারের সহিত আমরা (?) এইরূপ চিহ্ন ব্যবহার করিব। কারণ ইহার উচ্চারণ ঠিক 'হং' নহে। ইহা অনেকটা অ+অং ধ্বনি। বহুস্থানের কথার মধ্যে 'হ'কে 'অ' অভ্যাস আছে। ইঁহারা সব 'হ'কেই 'অ'কার উচ্চারণ করেন না। যাহা হউক আকাশ তত্ত্বের প্রতীক 'হং'=অ+অং জানিতে হইবে। কিন্তু পুরুষ-তত্ত্বের প্রতীক 'হং'টী 'অ+অং' নহে। উহা "ঃ+অং"।

করেন। এখানে ভোগকরা মানে মিলিত হওয়া বা জানা। একটা ধ্বনিকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ধ্বনি উত্থিত হয়। আবার সেই উত্থিত ধ্বনিটা পূর্ণ-বিকাশের অবস্থায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ আবার তাহাকে জানিয়া ফেলেন। এই ভাবেই ধ্বনি জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ক্ষ ষ স প্রকৃতির এই গুণ-ত্রয়ের মূল উপাদানে শক্তি-স্তরের অ, ঋ, ঌ এই তিনটী অনাদি শক্তি বিদ্যমান আছে। পুরুষ ও প্রকৃতির মূল উপাদানে যেমন ঃ এবং অং বিদ্যমান ঠিক তেমনই প্রকৃতির ত্রিগুণ উপাদানের মূলে অ, ঋ, ঌ বিদ্যমান। ইহারা মূলে (অর্থাৎ শক্তি-স্তরে) বিদ্যমান আছে বলিয়াই ধ্বনি-স্তরে ক্ষ ষ স হইয়াছে। ঃ এর প্রাধান্যে পুরুষ এবং ৺ এর প্রাধান্যে প্রকৃতি (ইহা 'ঃ' ভিন্ন সমস্ত ধ্বনির সমষ্টি)। অ এর প্রাধান্যে সত্ত্ব, ঋ এবং প্রাধান্যে রজঃ, ঌ এর প্রাধান্যে তমঃ, ই এর প্রাধান্যে সত্ত্বরজঃ এবং উ এর প্রাধান্যে রজস্তমঃ। অনাদি শক্তিরূপে ঃ কর্তৃত্ব-শক্তি, ৺ জ্ঞান-শক্তি, অ ইচ্ছা-শক্তি, ঋ ক্রিয়া-শক্তি, ঌ প্রাণ-শক্তি, ই বিজ্ঞান-শক্তি, উ শান্তি-শক্তি। অ এবং ৺ মিলিয়া অং হয়। এই অং (মহত্তত্ত্ব) ব্যক্ত সৃষ্টির আরম্ভ। ইহা প্রথম ধ্বনি। ব্যক্তসৃষ্টির মূলে ঃ এর প্রাধান্যে পুরুষ ইহাই হং। হং এর উপর অ এর প্রাধান্যে ক্ষ, ঋ এর প্রাধান্যে ষ, ঌ এর প্রাধান্যে 'স' হইয়া থাকে। ধ্বনি সৃষ্টির উপাদানের মূলে শক্তি-স্তর যে বিদ্যমান ইহা বুঝাইবার জন্য এই সব কথা লিখিলাম। আমরা এখন সাংখ্য-ভিত্তিতেই নাদ বা ধ্বনি জগতের সৃষ্টির আলোচনা করিব।

ধ্বনি-জগতের দ্বিতীয় বিকাশে

হং = পুরুষ
|
ক্ষ ষ স = প্রকৃতি
| | |
সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ
| | |

হং(?) রং লং
| |

যং বং
ং (?) — — রং — বং লং
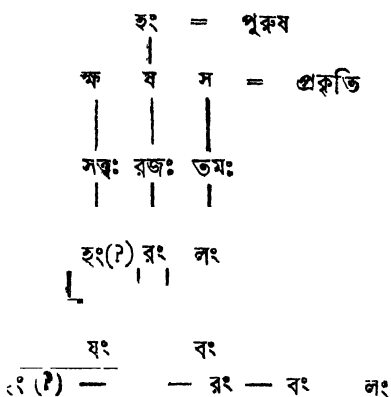
আকাশ তন্মাত্রা | বায়ু তন্মাত্রা | অগ্নি তন্মাত্রা | জল তন্মাত্রা | পৃথিবী তন্মাত্রা

এই পর্য্যন্ত বিজ্ঞানময় কোষ; অর্থাৎ এ পর্য্যন্ত যে সব ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে ইহারা বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত স্থিত জানিতে হইবে। ইহার পর যে সব ধ্বনি হইবে উহারা বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আর শ্রুত হইবে না; উহারা মনোময় কোষের ধ্বনি।

এবার পুরুষ হং এবং ইহার প্রকৃতি হং (?) * যং, রং, ষং ও লং এই পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে উত্থিত ধ্বনি হইবে কং, চং, টং, পং, তং।

ইতি পূর্ব্বে ফুট নোটে 'হং' পুরুষতত্ত্ব, এবং 'হং' (?) আকাশ তত্ত্বের উচ্চারণ ভেদ দিয়াছি। হং, যং এবং বং এর দুই প্রকার উচ্চারণ আছে। হং কে হং উচ্চারণ করিলে পুরুষ তত্ত্ব জানিতে হইবে আবার অ+হং উচ্চারণ করিলে আকাশ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। যং কে য়ং (ই+অ+ং) ও বলা যায় আবার যং ও বলা যায়। 'যং' বলিলে ইহাতে 'ং' এর অংশ মিশ্রিত হইল জানিতে হইবে। 'বং' কে 'বং' ও বলা যায় আবার

ধ্বনি-জগতের তৃতীয় বিকাশ

হং = পুরুষ।

হং (?)	যং	রং	বং	লং	= প্রকৃতি
|	|	|	|	|	
কং	চং	টং	পং	তং	

পুরুষ হং, প্রকৃতি কং, চং, টং, পং, তং,। ইহাদের মিলনে উৎপন্ন ধবনি হইবে খং, ছং, ঠং, ফং, থং। এইভাবে পুরুষ হং, প্রকৃতি খং, ছং, ঠং, ফং, থং। উৎপন্ন ধবনি হইবে গং, জং, ডং, বং, দং। পুরুষ হং, প্রকৃতি গং. জং, ডং, বং, দং। উৎপন্ন ধবনি হইবে ঘং. ঝং, ঢং, ভং, ধং,। পুরুষ হং, প্রকৃতি ঘং, ঝং, ঢং, ভং, ধং। উৎপন্ন ধ্বনি হইতে ঙং, ঞং, ণং, মং, নং।

'উ+অ+ং' ও বলা যায়। 'বং' বলিলে ধ্বনির মধ্যে বিসর্গের অংশ আসিল বুঝিতে হইবে। কাজেই মন্ত্রযোগী সাধক জপ কালে যেমন জপ করিবেন শক্তিও তেমনই হইবে। পাঠকগণের মনে রাখা প্রয়োজন যে আমরা মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধেই বলিয়া চলিয়াছি। শক্তিই বিবর্ত্তিত হইয়া বিজ্ঞান সৃষ্টির স্তরে আসিয়াছে। ধ্বনিগুলি যে শক্তির বিবর্ত্তন ইহা বুঝানো ভিন্ন আমাদের কোনই লক্ষ্য নাই।

হং = পুরুষ।

কং	চং	টং	পং	তং	= প্রকৃতি।
|	|	|	|	|	
খং	ছং	ঠং	ফং	থং	
|	|	|	|	|	
গং	জং	ডং	বং	দং	
|	|	|	|	|	
ঘং	ঝং	ঢং	ভং	ধং	
|	|	|	|	|	
ঙং	ঞং	ণং	মং	নং	

ঙং, ঞং, ণং, মং, এবং নং কে আর প্রকৃতি বলা চলে না। ইহারা শক্তিস্তরেই ফিরিয়া আসিয়াছে। যে মূল উপাদান হইতে (অর্থাৎ হং (?), যং, রং, বং, লং) কং, চং, টং, পং, তং এর বংশবর্গ চলিয়াছিল ঙং, ঞং, ণং, মং, নং-এ সেই মূল-তত্ত্ব ফিরিয়া আসার দরুণ এই ধ্বনিগুলি আর যুবাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই; তাই পুরুষ ইহাদিগকে ভোগ করিতে আর ধাবিত হন নাই বাল্যাবস্থা আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা ধ্বনি-জগতের মূল-তত্ত্বে ফিরিয়া আসিয়াছে; অর্থাৎ মকারে লীন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের ধ্বনিগুলির যেন বাল্যাবস্থার শেষ হইল না। জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মায়ের কোলে লীন হইয়া গিয়াছে।

হং (?), যং, রং, বং, লং এই ধ্বনি হইতেই ক, চকারাদির বংশবর্গ চলিয়াছিল। শেষকালে ইহা ঙং, ঞং, ণং, মং, নং পর্য্যন্ত আসিয়া স্থির হইল। পাঠকগণ আরম্ভ এবং শেষ অবস্থার মিল করিয়া বুঝিয়া লউন। এ সম্বন্ধে আমরা আর বেশী আলোচনা করিতে চাহি না।

আরম্ভ প্রকৃতি হ (?) = ঃ (?) + অ   শেষ পরিণতি * ঙ = ঃ (?) + ং + অ

---

* পাঠকগণের মনে থাকে যেন ঃ (?) = অ। অনেক স্থানের ভাষাতে 'হ'কে 'অ' বলিবার প্রাকৃতিক অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। "হইবে"কে "অইবে, বলায় অভ্যাসকে একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বাস্তবিক 'হু' দুইটী উহার একটীতে প্রায় 'অ'কারের উচ্চারণ হইয়া থাকে।

আরম্ভ প্রকৃতি	য	=ই+অ	শেষ পরিণতি	ঞ=ই+ং+অ
"	র	=ঋ+অ	"	ণ=ঋ+ং+অ
"	ব	=উ+অ	"	* ম=উ+ং+অ
"	ল	=ঌ+অ	"	† ন=ঌ+ং+অ

যে কোন ধ্বনিই হউক না কেন, উহার মূলে হং-কার বিদ্যমান থাকে। এই হং কারের প্রকৃতি ক্ষ ষ স। তন্ত্রে 'হংস' মন্ত্র আছে; ইহাকে মহামন্ত্র বলা হয়। যত প্রকারের সন্ন্যাস পন্থী আছেন সকলেই এই 'হংস' মন্ত্রের উপাসক। বাঙ্গলার বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণও এই 'হংস' মন্ত্রের উপাসক। এই মন্ত্রকে উলটাইয়া দিলে "সঃ হং"="সোহং" হয়; অপভ্রংশে সোহহং। সম্প্রদায় ভেদে এই 'হংস'-স্তরের মন্ত্রের কিছু কিছু ভেদ আছে। কোন কোন সম্প্রদায়ে ইহা "হে্সোঃ" বীজরূপে পরিণত হইয়াছে।

এই মন্ত্রটীকে যিনি যেমন ভাবেই গ্রহণ করুন না কেন, ইহা 'পুরুষ-প্রকৃতি' মন্ত্র। এই একটী বীজ মন্ত্রে সমস্তটা ব্যক্ত-সৃষ্টি জ্ঞান বা ধ্বনিরূপে যে অবস্থিত তাহার পরিচয় পাঠকগণ পাইলেন। বাঙ্গলার বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মধ্যে এই বীজমন্ত্রটীর অদ্ভুত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাঁহারা 'সোহং' বলিতে -আমিই সেই পরমাত্মা' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া

---

* ম-এর উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে মনে মনে উ বলিয়া পরে ং+অ বলিতে হয়। তবেই ইহার ঠিক উচ্চারণ হইবে। মনে থাকে যেন ইহা ওষ্ঠবর্ণ নহে; ইহা অনুনাসিকবর্ণ। সাধারণতঃ মকারকে ওষ্ঠবর্ণরূপে উচ্চারণ করিতে দেখা যায়। সমস্তগুলি স্বর ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ইহার সমকক্ষ মধুর ধ্বনি একটীও নাই। জপকালে উচ্চারণের দিকে নজর না রাখিলে মন্ত্রশক্তির কাজ মোটেই হইবে না। যে সব ধ্বনিগুলি ঠিক ঠিক স্থান হইতে উচ্চারিত হইবে না, সেগুলির শক্তি সঞ্চিত হইবে না।

† ন ধ্বনির উচ্চারণের উপাদানে ঌ+ং+অ আছে. ইহাও অনুনাসিক বর্ণ। ইহার উচ্চারণ সকলেই ঠিক মত করিয়া থাকেন। ঌ কারের উপর জোর দিয়া উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিলে ইহার উচ্চারণ ভুল হইবে।

লইয়া ইহাতে গোল বাধাইয়াছেন। শ্রীমৎ চৈতন্যদেবও এই 'হংস' বা 'সোহং' মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। আমিই যে পরমাত্মা এইরূপ ভাবনা বৈষ্ণবদের জন্য বিশেষ মনঃপীড়াদায়ক কথা। আসল কথা 'আমিই ঈশ্বর', 'আমিই পরমাত্মা' এরূপ যুক্তি কোন দর্শন-শাস্ত্রের যুক্তি নহে। ইহা কোন ভাবপ্রবণ ভাবুকের কল্পনা ভিন্ন কোন দর্শনেরই মত নহে। যাঁহারা সোহহংএর সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা সোহংএর তত্ত্ব জানেন না। আমিই সেই পরমাত্মা এরূপ ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব সাধকগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা 'আমি দাস' এ কথার সঙ্গে উহার অসামঞ্জস্য হয় দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া যান। শেষকালে নাকি ইহার অর্থ করা হইয়াছে 'তাঁহার আমি'। পাঠকগণ জানিয়া রাখুন 'হংস এবং সোহং' একটী বীজ-মন্ত্র। ইহার অর্থ পুরুষ-প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-পুরুষ ; তত্ত্বতঃ একই। অর্থাৎ 'হং' ও যাহা—'সঃ'ও তাহা ; আবার 'সঃ'ও যাহা—'হং'ও তাহাই।

এই 'হংস' মন্ত্রই অজপা মন্ত্র। পাঠকগণ মস্তিষ্ককেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৫ ও ৬ চিহ্নিত কেন্দ্র দেখুন। এই ৫ চিহ্নিত কেন্দ্রই মহত্তত্ত্ব ; ইহাই 'অং'। ৬ চিহ্নিত কেন্দ্রই অব্যক্ত কেন্দ্র ; উহাই 'ঃ'। এই ঃ এবং অং মিলিয়া 'হং' হয়। এই 'হং' ধ্বনি পুরুষ, 'সঃ' ইহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি। জীবের শ্বাস প্রশ্বাসের কেন্দ্রস্থান এবং ঐ মহৎ-অব্যক্ত স্থান একই স্থান জানিতে হইবে। আমরা যে শ্বাসটা টানি এবং ছাড়ি ইহার মূল যোগসূত্র ঐ মহৎ ও অব্যক্তকেন্দ্রে বিদ্যমান। কি ভাবে উহা বিদ্যমান তাহা বলিতেছি। শ্বাসটা টানিবার সঙ্গে স্থূলভাবে দুইটা গতি যে কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শ্বাসটা টানিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গতি নাভি হইতে লিঙ্গমূল পর্য্যন্ত গমন করে দেখিতে পাওয়া যায়। আসল কথা এই গতিটী মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত মূলাধারের কেন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। নাভি হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত গতি-

সম্বন্ধযুক্ত বায়ুকে অপান বায়ু বলে। এই বায়ুই প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া ভিতরে টানিয়া লয়। এইভাবে টানিয়া লইয়া অপান বায়ুটা মূলাধার হইতে ফিরিয়া নাভি পর্য্যন্ত চলিয়া আসে ; সঙ্গে সঙ্গে আমরা শ্বাসটা ছাড়িয়া দিই। অনেকে স্থূল শ্বাসপ্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া অজপা জপে উপদেশ দেন। এরূপ মোটা উপদেশের হাল দেখিলেই বুঝা যায় যে ইঁহারা অজপা-জপ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নিজেরা কোন সিদ্ধ মহা-পুরুষ হইতে লাভ করেন নাই। ইহা অজপার অত্যন্ত স্থূল কথা। মস্তিষ্কের ৯ চিহ্নিত কেন্দ্র দেখুন। ইহাকে আমরা প্রাণ-কেন্দ্র নাম দিয়াছি। মূলাধার হইতে এই কেন্দ্র পর্য্যন্ত একটা নাড়ী আছে (মেরু-দণ্ড মধ্যস্থিত এই পথে বহু নাড়ী আছে, ইহাদের মধ্যে এই প্রাণ নাড়ী একটী)। এই নাড়ী পথে একটা সূক্ষ্ম প্রাণ-গতি উঠা নামা করে। এই প্রাণগতিটা যখন মূলাধার হইতে মস্তিষ্কে প্রাণকেন্দ্রে গমন করে, তখন এই গতিটাই স্থূল নাভি হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত অপান-বায়ুকে টানিয়া মূলাধারে আনে। আমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাস টানি ও ফেলি উহার মূলে অপান বায়ুর আকর্ষণ বিকর্ষণ বিদ্যমান। আবার অপান বায়ু যে একবার নাভি হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত যাতায়াত করে তাহার মূলে মেরুদণ্ড মধ্য পথস্থিত মূলাধার হইতে মস্তিষ্কের প্রাণকেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রাণগতির আকর্ষণ-বিকর্ষণ বিদ্যমান। পাঠকগণ নিজেদের শ্বাস প্রশ্বাসের গতির সহিত মিলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। এবার মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত ৫ ও ৬ চিহ্নিত কেন্দ্র দেখুন। এই কেন্দ্র হইতে মস্তিষ্কস্থিত প্রাণকেন্দ্র পর্য্যন্ত একটা সূক্ষ্ম গতি বিদ্যমান। এই গতিটা যখন প্রাণকেন্দ্র (৯ চিহ্নিত কেন্দ্র) হইতে মহৎ তত্ত্ব পর্য্যন্ত গমন করে তখন মূলাধার হইতে প্রাণের গতি মস্তিষ্কের প্রাণকেন্দ্র পর্য্যন্ত গমন করে। আবার ঐ গতি যখন মহৎ অব্যক্ত কেন্দ্র হইতে প্রাণকেন্দ্রে ফিরিয়া আসে তখন মস্তিষ্কের প্রাণকেন্দ্র হইতে প্রাণগতিটা মূলাধার

পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। এখন পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাসটা টানি ও ফেলি উহার মূলস্থানে বিদ্যমান দুইটী গতি—যাহার একটা গতি মহৎ অব্যক্ত কেন্দ্র হইতে প্রাণকেন্দ্র পর্য্যন্ত আসে, আবার আর একটা গতি প্রাণকেন্দ্র হইতে ফিরিয়া মহৎ অব্যক্ত-কেন্দ্রে যায়, যখন গতিটা অব্যক্ত হইতে নামিয়া প্রাণকেন্দ্র পর্য্যন্ত আসে, তখন ধ্বনি হয় 'হং'। আবার যখন গতিটা প্রাণকেন্দ্র হইতে ফিরিয়া অব্যক্ত কেন্দ্রে যায় তখন ধ্বনি হয় 'সঃ'। অজপা-জপের মূলে এই 'হংসঃ' বিদ্যমান। আমরা চলিত কথায় যাহাকে ব্রহ্ম-তালু বলি উহারই নিম্নে মস্তিষ্কের মধ্যে মহৎ অব্যক্ত-কেন্দ্র বিদ্যমান। সদ্যঃজাত শিশুদের এই স্থানটী খুবই কোমল থাকে, সদ্যঃজাত শিশুদের ব্রহ্মতালু দেখিলে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে এই স্থানটা যে সম্বন্ধ রাখে ইহা বুঝা যাইবে।

ভারতের বর্ণমালার সহিত বিশ্বসংসারের বিবর্ত্তন-লীলা কি সুন্দর ফুটিয়াছে তাহা অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত দেখিবার বিষয়! ক্রম-বিকাশের শেষ স্তরে বিকশিত হও তবেই বিবর্ত্তন-লীলা-রহস্য ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবে। এই পৃথিবীতে মানুষের শাসন, ধর্ম্ম, সমাজ এবং শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে 'তুমি' ভাব তোমার বিকাশটা কোন্ স্তরে আসিয়াছে; তাহার পর যাহা ইচ্ছা বল। আর মানুষকেও আমাদের ইহাই বলিতে হইতেছে "তুমি কোন একটা নীতি বিধি মানিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া লইও তোমার উহা বিকাশে কতটা সাহায্য করিবে। যাহারা আসুরিক প্রকৃতির মানুষ তাহারা নিজেদের বিকাশের কথা ভাবে না; সমাজেরও বিকাশের বিষয় ভাবে না। তাহারা চায় নিজের ভোগটী ষোল আনা বুঝিতে আর সেই টুকুর সুবিধার জন্য সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বনাশ করিতে। সত্য কথা ত ইহারা কোন দিনই বলিবে না। যে কোন প্রকারে মিথ্যা সংস্কারে তোমাকে আবদ্ধ করিয়া

রাখিয়া তাহাদের স্বার্থটি নিষ্কণ্টক করিয়া লইতে চায়। কাজেই তুমি সাবধানে চলিও।

ভারতের সর্ব্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা, নীতি, ধর্ম্ম সবটাই সৃষ্টির বিবর্ত্তন-ধারার সহিত গ্রথিত। চিকিৎসা, জ্যোতিষ, সঙ্গীত * সমাজ-নীতি, রাজনীতি একই ধারার সহিত গ্রথিত। বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতীয় বর্ণমালার মধ্যে এমন বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তন-সৌন্দর্য্য সহ্য করিতে পারিতেছেন না তাঁহারা তিনটা স (শ, ষ, স) থাকাকে অসভ্যতা মনে করেন। দুইটা ন (ণ ন) দুইটা য (জ, য), তিনটা র (র, ড়, ঢ়) আবার ছয়টা অনুনাসিক বর্ণ (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং) ইহা তাঁহাদের নিতান্তই চক্ষুশূল। আবার কেহ কেহ স্বপ্ন দেখিতেছেন (প্রায়) ৫০টা বর্ণের স্থলে ইংরাজী ২৬টি বর্ণের প্রবর্ত্তন করা যায় কি না। কাহারও মতে ভারতীয় অক্ষরে লেখাপড়া বড়ই কষ্টকর। অক্ষরের কোণাকাণি থাকিবার দরুন উহা নাকি তাহাদের চক্ষের মধ্যে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দেয়। শেষকালে কেহ কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছেন ইংরাজী বর্ণমালা এবং ২৬টা বর্ণের সাহায্যে তাঁহারা লেখাপড়ার প্রবর্ত্তন করিবেন। এই কোণাকাণিগুলি ঘষিয়া মাজিয়া না দিলে নাকি প্রেসের কাজেরও ক্ষতি হইতেছে!

* সঙ্গীত শাস্ত্রে ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণীর উল্লেখ আছে। (সঙ্গীত অবলম্বনেও বিজ্ঞানময় কোষের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যাওয়া যায়)। এই ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণী (৬ × ৬) শিবের ছয়টী মুখের স্বরূপ। ইহাদিগকে 'ধ্রুপদ' বলে। সঙ্গীতের এত উন্নত বিকাশ সম্বন্ধে কাহারও যদি কিছু বুঝিতে হয় তবে ভাল সঙ্গীত সাধকের গান শ্রবণ করুন। আপনি নিবিষ্ট হইয়া শুনিবার পর সঙ্গীত শেষে আপনার মনে হইবে যে আপনি নিদ্রা হইতে উঠিয়াছেন। ঐ রাগ-রাগিণীগুলি সম্পূর্ণরূপে অভি-মান ও বিজ্ঞানময় কোষের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দেয়। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি সুষুপ্তি কালে আমরা অভিমানের কেন্দ্রে আসিয়া যাই।

বাল্যকালে প্রথম শিক্ষার সময় এইরূপ অক্ষরগুলি তাঁহাদের নাকি ভাঁর যাতনার কারণ হইয়াছিল। যাঁহারা এরূপ ভাবেন তাঁহাদের এই অস্বাভাবিক স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছি! হাজার বৎসরের অধীনতা একটা জাতকে কি রকম অন্ধ অনুকরণের কথা ভাবাইতে পারে তাহার প্রমাণ বোধ হয় ইহা হইতে স্পষ্ট আর কোনটাতেই হইতে পারে না!

এই বর্ণমালাগুলি ভারতের গৌরব। অনেকের ধারণা—ভারতের অধঃপতনের মূলে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীই দায়ী। ভারতের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যাইবার মূলে দায়ী ভারতের অধ্যাত্মবাদ নহে, বরং ভারতের শক্তি ও গৌরব উহাতেই বিদ্যমান। ভারতকে সর্ব্বনাশের স্তরে আনিয়াছে ব্রাহ্মণ্যবাদ বা পুরোহিতবাদ। পদাঘাত করিতে হইবে এই ভণ্ডামীর মূলে। ভারত জড়বাদের ভিত্তি লইয়া কখনও স্বাধীন হইবে না, এ কথা আপনারা স্থির জানিয়া রাখিবেন। ভারত স্বাধীন হইবে অধ্যাত্মবাদের ভিত্তি লইয়াই। পাশ্চাত্যের হাওয়ার গতি দেখিয়া সে তালে নাচানাচি করিয়া "নামকো-ওয়াস্তে" যিনি যতই স্বপ্ন দেখুন না কেন, যাঁহাদের চরিত্রবল আছে এমন কর্ম্মিগণ ইঁহাদিগকে সহজেই চিনিতে পারেন। ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দী ভাষাকে আরবী অক্ষরে লিখিবার চেষ্টা করা হয়। ক্রমে উহা উর্দ্দু ভাষাতে পরিণত হইয়াছে। ইহার যে কি ভীষণ বিষময় ফল হইয়াছে তাহা এখন ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। ইহার ফলে এক প্রকাণ্ড অংশ ভারতবাসী (কেবল মুসলমানই নহে, বহু হিন্দু) নিজেদের সভ্যতার মূল সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিদেশীয় মুসলমান শাসকগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে কায়েম রাখিবার জন্য ইহাই হইয়াছিল প্রধান সহায়। এখন ভারতের এক প্রকাণ্ড অংশ নিজেদের সভ্যতাকে এমনভাবে ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই ভাষার মধ্য দিয়া যদি আরবীয় সভ্যতারও প্রতিবিম্ব দেখা যাইত তবুও

কোন কথা ছিল না, কিন্তু কেমন একটা কাল্পনিক সভ্যতা বহু উর্দ্দু ভাষা-ভাষীগণ আয়ত্ব করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারা যেন ভারতবাসীও নহেন, আরবীয়ও নহেন। ভারতের সুখ-দুঃখে ইহাদের বেদনা হয় না, ভারতের গৌরবকেও ইঁহারা গৌরব মনে করেন না। এখন চেষ্টা চলিয়াছে ভারতীয় টাইপকে ইংরাজী টাইপে কি ভাবে পরিণত করা যায়। তাহা হইলে সোনার সঙ্গে সোহাগার মিল হইয়া ইহার রং আরও জাঁকাল হইয়া উঠিবে। ইহার ফলে ভারতের সুখ-দুঃখ ও চিন্তাধারা হইতে বঞ্চিত থাকিবার জন্য আরও একটা দল গড়িয়া উঠিতে পথ পাইবে। বালকগণকে বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দ্দু টাইপের অক্ষর তো শিক্ষা করিতেই হইতেছে, এবার আবার ইংরেজী টাইপের বর্ণমালাও বালকগণকে আয়ত্ব করিবার জন্য বৃথা পরিশ্রম বৃদ্ধি করিতে হইবে।

যাঁহারা ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবের কথা ভাবিতেছেন তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য আমরা জানাইতেছি যে ভারতের উন্নতির পথ ভারতীয় সভ্যতার উপাদানকে ভিত্তি করিয়া করিতে চেষ্টা করিবেন। ঐ ভিত্তির উপর পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান এবং কর্ম্মশক্তিকে টানিয়া আনুন, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু সাবধান! বাহিরের সভ্যতার উপাদানকে ভিত্তি করিয়া কিছু করিতে গেলে ইহার ফল অত্যন্ত বিষময় হইবে। মনে রাখিবেন কুচক্রীর চক্র ভারতের ভাগ্যাকাশে আজ সহস্র বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই চক্রের লক্ষ্য যে কোন ভাবে ভারতের সমাজকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেওয়া। আপনি আপন সভ্যতার ভিত্তি ত্যাগ করিয়া যাহা কিছু গড়িবেন উহাই ভারতের অমঙ্গলের কারণ হইবে। বেশী বলার প্রয়োজন নাই; নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিবেন না। এখন চাই সমাধান, সমস্যার সময় নাই। যাহা হউক এবার আমরা আমাদের মূল বিষয়ে প্রবেশ করিব।

বিজ্ঞানের বোধের মধ্যে যতক্ষণ শাস্তির অংশ বিদ্যমান থাকে

ততক্ষণ বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানের স্তরে বদ্ধ থাকেন। এই শান্তির অংশ কাটিয়া গেলে বিজ্ঞানের কেন্দ্রে অহং তত্ত্বেরও বিলয় হয়। অহং তত্ত্বের বিলয় হইলে বিজ্ঞাতা জ্ঞাতারূপে পরিণত হন। অর্থাৎ বোধ মহত্তত্ত্বের কেন্দ্রে চলিয়া আসে এবং বোধকর্ত্তা 'জ্ঞাতা' নাম ধারণ করেন।

এই জ্ঞাতা এবং বিজ্ঞাতা তত্ত্বতঃ এক বস্তু বলিয়াই মানিয়া লওয়া যায়। অষ্টম কলার বিকাশে যিনি বিজ্ঞাতা পঞ্চদশ কলার বিকাশে তিনি জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতাই সাংখ্যের পুরুষ। মহত্তত্ত্বই জ্ঞানশক্তি। জ্ঞাতা-পুরুষ এই জ্ঞান-শক্তির জ্ঞাতা। আমাদের পুরুষোত্তম এবং সাংখ্যের পুরুষে যাহা ভেদ তাহা এখানে এবার স্পষ্ট হইয়া যাইবে। সাংখ্যকার বহু পুরুষ বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা বহু পুরুষ স্বীকার করি না। আমরা বহু অহংকার (অহংকারই ক্ষর-পুরুষ) (পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বই অহংতত্ত্ব, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) স্বীকার করি কিন্তু বহু পুরুষ স্বীকার করি না। বিজ্ঞান ক্ষেত্রের বিজ্ঞাতাই অহংকার আর ঐ অহংকার যখন পঞ্চদশকলা বিকাশের ক্ষেত্রে আসেন তখন তিনি জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতাই সাংখ্যের পুরুষ। এই জ্ঞাতাপুরুষই অক্ষরপুরুষ। পুরুষ এক কি বহু বলা যায় না। বিচার করিলে এ পুরুষকে বহু পুরুষ স্বীকার করা যায়। কারণ তিনটী শক্তি (ঃ+অ+ং) মিলিয়া ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। শক্তিস্তরের আধারে এইরূপ বহু অক্ষর পুরুষ থাকিতে পারেন। একটী অক্ষর পুরুষের মুক্তি হইলে একটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মুক্তি হইয়া যাইবে। একটী ক্ষয় পুরুষের মুক্তি হইলে একটী মাত্র জীবের মুক্তি হইল। সাংখ্য এই স্তরের অক্ষর-পুরুষকেই বহু পুরুষ বলিতে চান কিনা ইহার বিচার আমরা করিব না। আমরা যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিতেছি তিনি যদি সাংখ্যের পুরুষ হইতেন তবে সাংখ্যকার বহু পুরুষ বলিতে পারিতেন না। মহতের কেন্দ্রে স্থিত হইলে বহু পুরুষের কোন আভাষই পাওয়া যাইবে

না। তবে বহু অহংকারকে দেখিয়াই সাংখ্য বহু পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পুরুষোত্তমের স্তরে আসিলে ইহা বুঝা যাইবে অহং-তত্ত্বের বাস্তবিক কোন ভিত্তিই নাই; উহা মহৎ-গর্ভে পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্ব মাত্র। এই প্রতিবিম্বই জীবরূপে এই বিশ্বে বিচরণ করিতেছে।

এখন পাঠকগণের ধারণা হইতে পারে যে সাংখ্য-পথে তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত বিকাশের কথা নাই। সেরূপ ধারণাও ঠিক হইবে না। সাংখ্য শেষ-বিকাশ (ষোড়শ কলা) পর্য্যন্ত গিয়াছেন, কিন্তু সাংখ্য পুরুষোত্তম স্তরের কথা জানেন নাই। ইহার কারণ সাংখ্যকার গণেশ ও শিব-স্তর প্রধান অনুভূতির পথে আসিয়াছিলেন, এ কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিষ্ণু-স্তবের অনুভূতির পথ ধরিয়া আসিলে পুরুষোত্তম-স্তরে আসা যাইবে। আবার গণেশ শিব-পথে আসিলে পুরুষোত্তম-স্তরে না আসিলেও বিকাশ উভয় পথেই ষোড়শ-কলা পর্য্যন্ত হইবে। বিকাশের দিক দিয়া বিচার করিলে কোন পথই কম নহে।

পুরুষোত্তম-স্তর তিন গুণের অতীত। সাংখ্যের পথেও তিন গুণের অতীত অবস্থা লাভ হয়। সাংখ্যের ত্রিগুণাতীত অবস্থা এবং পুরুষোত্তম-স্তরের ত্রিগুণাতীত অবস্থায় সামান্য ভেদ আছে। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ তিনগুণ। জ্ঞানে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, কর্ম্মে রজোগুণের এবং ভোগ-মোহে তমোগুণের আধিক্য বুঝিতে হইবে। সত্ত্বগুণযুক্ত পুরুষই জ্ঞাতা পুরুষ। রজোগুণযুক্ত পুরুষ কর্ম্মী পুরুষ এবং তমোগুণ-যুক্ত পুরুষ বদ্ধ পুরুষ। বৃক্ষাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পাখী, পশু ও গণেশ-স্তরের বিকাশ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষ বদ্ধ জীবের অন্তর্গত। ইহারা বাঁচিয়া থাকা, আহার করা এবং সন্তান উৎপাদন ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তব্যই বুঝে না। গণেশ চরিত্র-মানুষ, গণেশ + সূর্য্য-চরিত্র মানুষ, গণেশ + বিষ্ণু-চরিত্র মানুষ 'কর্ম্মী'। সূর্য্য – গণেশ (গণেশহীন

সূর্য্য), বিষ্ণু—গণেশ (গণেশহীন বিষ্ণু) এবং অপুষ্ট বিষ্ণু (নিম্ন স্তরের শিব হইতে সঙ্গ প্রভাবে যাহারা বিষ্ণু-চরিত্র আয়ত্ব করে) মানুষই অসুর হয় বা অসুরের সাহায্যকারী হয়। ইহারা বদ্ধ জীবের মতই বাঁচিয়া থাকা, আহার করা এবং সন্তান উৎপন্ন করাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু ইহারা বদ্ধ-স্তরের জীবের মত অন্যের বিকাশে অবিরোধী নহে। ইহারা নিজেদের ভোগ ও আহারাদির সুবিধার জন্য অন্যের বিকাশ রুদ্ধ করিবার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। 'খাও, সন্তান জন্মাও আর অন্যকে বিকাশে বাধা দাও' ইহারই জন্য ইহারা বিপুল কর্ম্মী। কর্ম্মী হইলেও ইহারা মোহবদ্ধ জীব। উন্নত শিব-স্তরের মানুষই জ্ঞানী। এই জ্ঞানের পূর্ণস্তরে মহৎ-তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের পরপারে অব্যক্ত-তত্ত্ব। অব্যক্ত-তত্ত্বের অনুভূতি আসিলে সাধকের আর জ্ঞান-মোহ থাকে না, ইহারই নাম ত্রিগুণাতীত অবস্থা। সাংখ্য-পথেও এ অবস্থা লাভ হয়।

শক্তি অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে অব্যক্তের গর্ভে যাঁহার জ্ঞানরাশি নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায় তিনি এখানেই শেষ সমাধি লাভ করেন। তিনি আর পুরুষোত্তমের স্তরে যান না। এরূপ মহাপুরুষদিগকেই শাস্ত্রে ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলা হইয়াছে। যাঁহারা যোগ পথে (কর্ম্মের পথে) অব্যক্তের অনুভূতি লাভ করেন তাঁহাদের সমস্ত জ্ঞানরাশি অব্যক্তের গর্ভে বিলীন হয় না, কিছু থাকিয়া যায়। এই জ্ঞানরাশি বিলীন হওয়া বা না হওয়া কাহারও ইচ্ছাধীন ব্যাপার নহে। ইহা সাংখ্য এবং যোগ-পথের ফল মাত্র। যাঁহারা যোগ পথে আসেন তাঁহারা পুরুষোত্তম-স্তরে স্থিত হন। ইঁহারাই ঈশ্বরকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও ত্রিগুণাতীত। আবার ঈশ্বর-কোটীর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও ত্রিগুণাতীত।

ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। বিকাশের

বিচারে উভয়েই সমান। ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্তগণ অব্যক্তের সন্ধান পাইবার পর অব্যক্তে জ্ঞানাংশ নিঃশেষ করিতে করিতে যতদিন কাটে ততদিন থাকেন। এভাবে বহু বৎসরও থাকিতে পারেন। ঈশ্বরকোটীর জীবন্মুক্তগণ অব্যক্তের সন্ধান পাইবার পর পুরুষোত্তম-স্তরে স্থিত হন এবং কর্ম্মাংশ নিঃশেষ হইতে হইতে যতদিন কাটে ততদিন অপেক্ষা করেন। ইঁহারাও বহুদিন থাকিতে পারেন। অহংকার উভয়েরই কাটিয়া গিয়াছে। সৃষ্টির যাহা রহস্য তাহা উভয়েই জানিয়া লইয়াছেন। অভিমানের ভ্রান্তির উপরই সৃষ্টির খেলা অবস্থিত। উহা ৭॥০ কলা বিকাশের পরেই শেষ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, অষ্টম কলায় অভিমান শেষ হইয়া গিয়াছিল; পরে জ্ঞানশক্তির পূর্ণ বিকাশে উভয়েই মহতের কেন্দ্রে আসিয়াছেন। একজনের জ্ঞান কলায় কলার শেষ হইয়া —১৫ কলাই শেষ হইয়া গিয়াছে। এইভাবে তিনি ত্রিংশ কলায় (১৫ জ্ঞান-কলা + ১৫ অব্যক্ত-কলা) বিকশিত হইয়াছেন! আর একজন কর্ম্মের বেগ লইয়া আসিয়াছেন; কর্ম্মশেষে ইঁহারও শরীর পতন হইবে। ৭॥ কলা পর্য্যন্তই জগৎ। এই ৭॥ কলা ৩০ কলার ৪ অংশের ১ অংশ; ইহাতেই পরিবর্ত্তনশীল জগৎটা অবস্থিত। গীতায় বিভূতিযোগ অধ্যায়ে সে কথা বলা আছে; অর্থাৎ ৪ অংশের ১ অংশে জগৎটী স্থিত। তুমি যে জগৎটীকে দেখিতেছ উহার স্থিতি তোমার অভিমানটি পর্য্যন্ত। ইহার পর বিজ্ঞান-স্তরও ১৫ কলার শেষ হইয়া গিয়াছে। ৩০ কলার জ্ঞানও অন্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এ প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা গীতা করিয়াছেন। "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতেঃ স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।" সাংখ্য-পথে যে স্থান লাভ করা যায় —যোগ পথেও সেই স্থান লাভ হয়। সাংখ্য ফল এবং যোগফল একই; এরূপ যিনি দেখেন তিনিই ঠিক দেখেন। সাংখ্য-দর্শনে বহু পুরুষ উল্লেখ

থাকিলে, একটা ত্রুটী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু বিকাশের পথে উভয়েই ত্রিগুণাতীত।

সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্য পুরুষোত্তম-স্তরই শ্রেষ্ঠ স্থান মনে হইবে। তাহার পর যাঁহার যেমন ইচ্ছা বলিতে পারেন। আমাদের লক্ষ্য কর্ম্ম-বিজ্ঞান বুঝা। আমরা দার্শনিক মতবাদ লইয়া ঝগড়া করিতে চাহি না। উহা কোন কাজে আসিবে না। যিনি সাধক তিনি সাধনায় বুঝুন, যিনি কর্ম্মী তিনি কাজে করুন। যাঁহারা সাধনার ধার ধারেন না, কর্ম্মও করেন না, তাঁহারা তর্ক করিয়া হাত চাপড়াইয়া টেবিল ফাটাইতে চান ফাটান। যিনি কর্ম্মী তিনি ঠিক কর্ম্মের উপাদান বাছিয়া লইবেন। আর যিনি সাধক তাঁহারও যেখানে যেটুকু প্রয়োজন তাহা ঠিকই পাইবেন। এবার আমরা পুরুষোত্তম-স্তরের অন্যান্য কথা বলিব।

অব্যক্ত অনুভূতি-স্তরে যাঁহারা জ্ঞান বা বোধ নিঃশেষে অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায় তাঁহার শরীর তখনই ত্যাগ হইয়া যায়। বোধের সঙ্গেই শরীরের সমস্ত প্রকার ক্রিয়া কলাপ চলিয়াছে। বিকাশ যে কোন স্তরেই থাকুক না কেন বোধের মধ্য দিয়াই শরীর রক্ষা হইয়া থাকে। বোধের কেন্দ্র নষ্ট হইয়া গেলে শরীর তখনই মৃতবৎ পতিত হইবে। শক্তি-স্তর হইতেই আমাদের শরীরটা যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে, একথা সত্য। কিন্তু শক্তিস্তরের সঙ্গে শরীরের প্রত্যক্ষ আদানপ্রদান বোধের মধ্য দিয়া হইয়া থাকে। শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন শক্তির কেন্দ্র থাকুক না কেন বোধশক্তি শরীরের সমস্ত অণু পরমাণুতে মহৎ কেন্দ্র * হইতে

* মস্তকে যেমন মহৎ কেন্দ্র আছে মেরুদণ্ডের মধ্যেও তেমনি মহৎ কেন্দ্র বিদ্যমান। যে সব জীবে বিকাশাল্পতার জন্য মস্তিষ্ক-অংশ প্রস্ফুটিত হয় নাই তাহাদের বোধ-কেন্দ্র বিশুদ্ধ চক্রে বিদ্যমান থাকে। বিশুদ্ধাখ্য এবং মহৎ কেন্দ্র একটি নাড়ী দ্বারা সংযুক্ত আছে। ইহার একটি কেন্দ্র স্পন্দিত হইলে অন্যটিও স্পন্দিত হয়। নাড়ী সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই; সুযোগ হইলে আমরা সময়ান্তরে বলিব।

বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। শরীরের সুখ দুঃখ আমাদের অভিমান কেন্দ্রে বা মনোময় কোষে আসুক চাই নাই আসুক শক্তিস্তরে উহা পৌঁছিলেই শরীরের কাজ ঠিক মত চলিতে থাকিবে। বোধ-শক্তি যে মুহূর্ত্তে অব্যক্ত-শক্তিতে বিলীন হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই শরীরটা নিশ্চল হইবে। শরীরের অণুপরমাণুর অভাব অভিযোগ সবটাই বোধের মধ্য দিয়া শক্তি স্তরে যায়। শক্তিস্তর ইহার জন্য যখন যেটুকু করাইবার প্রয়োজন হয় তাহা অন্যান্য কেন্দ্রশক্তি-সাহায্যে করাইয়া থাকে। শরীরের মধ্যস্থিত শক্তিলীলা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। বিজ্ঞান এবং জ্ঞান স্তরে প্রতিষ্ঠিত যোগী মহাপুরুষ বহুদিন সমাধিস্থ থাকিলেও তাহাদের শরীর নষ্ট হয় না। শরীরের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সেই সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন না। সে সময় শক্তিস্তর হইতেই তাহাদের শরীর রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা যথাযথরূপে হইয়া থাকে। শরীরের সম্বন্ধে সুখ দুঃখ তাহাদের মনোময় কোষে প্রবেশ না করিলেও তাঁহাদের শরীর শক্তি-স্তরের মধ্য দিয়াই রক্ষিত হইয়া থাকে। যতদিন এই স্তরের যোগীগণ-মহত্তত্ত্বে স্থিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের শরীর নষ্ট হইবে না। কিন্তু যদি তাঁহারা অব্যক্ত স্তরের শেষ কলায় আসিয়া যান, তবে তাঁহাদের শরীর আর থাকিবে না।

মানুষ যখন মানুষের উপর অত্যন্ত নির্দ্দয় নির্ম্মম অত্যাচার করে তখন অত্যাচারিত মানুষকে সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতে দেখা যায়। মানুষ যতটা দুঃখ সহ্য করিতে পারে দুঃখের মাত্রা উহা হইতে অধিক হইলে ঐ দুঃখবোধধারা আর মনোময় কোষে প্রবেশ করিবে না। (মানুষ যতটা সুখ-স্পন্দন সহ্য করিতে পারে, সুখ-স্পন্দন উহা হইতে অধিক হইলেও সেই সুখ স্পন্দনও আর মনোময় কোষে প্রবেশ করিবে না; অর্থাৎ অত্যধিক সুখে মানুষ সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইবে)। অর্থাৎ মানুষের মনোময়কোষের চিত্ত-অংশ তখন স্তব্ধ হইয়া যায়। তখন বিজ্ঞানের মধ্য

দিয়া অত্যাচারের পীড়ন শক্তি-স্তরে গমন করে এবং প্রাণশক্তি নিতান্ত অন্ধের মত হাত-পা ছুড়িতে আরম্ভ করে। হয়ত কেহ কাহাকেও ফাঁসি-রজ্জুতে মারিবার চেষ্টা করিল। অসহায় ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে সংজ্ঞাহীন হইয়া গেল। সে অবস্থায় তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিলে সে নিজের সুখ-দুঃখ কিছুই জানিতে পারিবে না, কারণ তাহার অন্তঃকরণস্থিত সুখ-দুঃখবোধ-স্থান চিত্ত-কেন্দ্র শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহারা সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুলীলা নিকটে অবস্থান করিয়া দর্শন করিবে তাহারা হয়ত দেখিবে লোকটা ছটফট করিতেছে, মৃত্যু-যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করিতেছে। কিন্তু পাঠকগণ জানিয়া বিস্মিত হইবেন যে যাহার মৃত্যু সে কিছুই জানিতে পারিবে না! যে ঐরূপ ভাবে একজনকে মারিতে প্রস্তুত হয় সে তাহার নিজের মনুষ্যত্বকে নিজের বিবেকের নিকট এবং সমাজের নিকট হীন করে। সে তাহার বিকাশকে অত্যন্ত হীনস্তরে আবদ্ধ রাখিবার আয়োজন মাত্র করে। কিন্তু যাহাকে হত্যা করা হইল তাহার কষ্ট ততক্ষণ যতক্ষণ সে সংজ্ঞাহীন হইয়া যায় নাই, (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত রহস্য আমরা এখানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কারণ স্থানাভাব)। এরূপ মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে কোন শক্তিমান পুরুষের কৃপায় সে যদি জীবন-লাভ করে তবে তাহাকে চৈতন্য সঞ্চার করিয়া—সে যে হাত পা ছুড়িতেছিল এবং গোঁ-গোঁ করিতেছিল সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলিতে পারিবে না। এ সব ব্যাপারের সবটাই শক্তিস্তর হইতে হইতেছিল। আমাদের শরীরের মধ্যে যে সব ঘটনা প্রতিনিয়ত হইয়া চলিয়াছে তাহার অতি সামান্য জ্ঞানও আমাদের হওয়া অসম্ভব। যাহা হউক বিজ্ঞান ও জ্ঞান জগতের মধ্য দিয়া বোধ-ধারা শক্তিস্তরে গমন করিলে সেখান হইতে যে ইহার প্রতিক্রিয়া আসিতে থাকে এরূপ প্রমাণ পাঠকগণ এরূপ বহু ঘটনা হইতে জানিতে পারিবেন। এই শক্তিস্তরই আমাদের আনন্দময়-কোষ। জ্ঞান-জগৎ মিটিয়া গেলে এই

আনন্দ-জগৎ এর সঙ্গে আমাদের শরীরের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়া যায়।

অব্যক্তের পরপারে শক্তিস্তরের অবস্থিতি। এ স্তরের সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক করা সহজ নহে। এখানের যাহা তত্ত্ব তাহা বেদান্ত-দর্শনের প্রথম তিনটী সূত্রে উল্লেখ আছে। শ্রীসপ্তশতী-চণ্ডীতে লীলারূপেও এই শক্তি-লীলা বর্ণিত আছে। দুর্গাপূজা, কালীপূজার মধ্যেও এই শক্তিস্তরের কথাই স্পষ্ট রহিয়াছে।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—(১। অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা)। দ্বিতীয় সূত্রে তাহারই উত্তরে বলা হইয়াছে—যাহা হইতে সৃষ্টি আদি হয় তিনি ব্রহ্ম"। (২। জন্মাদ্যস্য যতঃ)। তৃতীয় সূত্রে বলিতেছেন "যাহা হইতে নিখিল শাস্ত্র (জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়াছে তিনি ব্রহ্ম" (৩। শাস্ত্রযোনীত্বাৎ)।

জ্ঞান হইতেই সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। যে যেমন জানে সে তেমন বলে ও লিখে। বিকাশ যাঁহার যেমন স্তরে তিনি সে স্তরের জ্ঞানকে প্রকাশ করেন। আত্মবিকাশের স্তর ধরিয়া বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। উহাই বিদ্যালয়ে পড়ান হইয়া থাকে। আত্মা হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

আমরা দর্শন-শাস্ত্রের কথার কাটাকাটি না করিয়া—খুব সরলভাবে এই সূত্রগুলির লক্ষ্য বুঝিতে চেষ্টা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিব যে "শক্তি হইতে সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং ধ্বনি হইতে সমস্ত জ্ঞান আসিয়াছে"। অ, ই, উ, ঋ, ঌ, অং, অঃ,—ইহারাই ধ্বনি। পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্রের পাতা খুলিয়া দেখ অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত মৌলিক ও মিশ্র ধ্বনির প্রতীকগুলিকে সাজাইয়াই সমস্ত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। আকারে প্রকারে মতভেদ যতই থাকুক না কেন সমস্ত দেশের শাস্ত্রের উপাদানে ঐ ধ্বনি-সপ্তকই বিদ্যমান। অ, ই, উ, ঋ, ঌ, অং, অঃ ইহারাই শক্তি।

সমস্ত জগৎ এই শক্তিরই বিবর্ত্তন। মন্ত্র-অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সমস্তটা সৃষ্টি এই সপ্ত-শক্তির খেলা। এই শক্তিগুলি সকলে যখন একই শক্তিরূপে পরিণত হয় তখন পুরুষোত্তমের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

পূর্ণ শক্তিতে সাতটী শক্তি রহিয়াছে। সমস্ত স্তরের সৃষ্টি এই সাতটি শক্তি লইয়াই অবস্থিত। সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু আলোচনা হইয়াছে, এখন আবার কিছু বলা হইবে।

'ঃ' অব্যক্ত শক্তি। এই শক্তিকণাগুলি অন্ধকার বর্ণ; ইহা সমস্ত সৃষ্টির বিলয়কারিণী শক্তি, মহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থূল ব্যক্ত-সৃষ্টি যখন প্রতিলোমগতিতে প্রলয়মুখী হইতে থাকে, তখন জীবের স্থূল শরীর নষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম শরীর লাভ হয়। সেই সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হইয়া কারণ শরীর বা বীজ শরীররূপে পরিণত হয়। এরূপে প্রকৃতির অন্নময় (ও প্রাণময়) ও মনোময়কোষ প্রলয়মুখী হইয়া বিজ্ঞানময় কোষে স্থিত রয়। এই বীজগুলি প্রকৃতির বিজ্ঞানময় কোষের বিলয়ে অব্যক্ত স্তরের (ঃ শক্তিতে) শক্তির আশ্রয়ে আসিয়া আশ্রয়লাভ করে। পুনরায় নূতন সৃষ্টির সময় ইহারা আবার বীজ-জগতে আসে এবং ক্রমে স্থূল-জগতে বীজরূপ সৃষ্ট হইয়া থাকে। বীজ-জগৎটাই 'উ' (শান্তি) শক্তির আশ্রয়ে অবস্থিত। মহত্তে (ং) পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বিত হইয়া বীজ সৃষ্ট হইয়া শান্তি-জগতে অবস্থান করে। আবার অব্যক্ত-জগৎ হইতেও পূর্ব্বসৃষ্টির প্রলয়ের বীজ আসিয়া শান্তি-জগতে বীজরূপে স্থিত হয়, এখানে আমরা দুই রকমের বীজ পাইতেছি। এক তো পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বে বীজ হয়। ইহাদিগকে আমরা সত্তঃ-প্রতিবিম্বিত বীজ বলিব, আর এক রকম বীজ হয়, যাহারা পূর্ব্ব সৃষ্ট জীবের অব্যক্ত-গর্ভস্থিত বীজ। যে সব বীজ কখনও স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর একবারও ধারণ করে নাই উহারা সৃষ্টি-বিলয়ে অব্যক্ত স্তরে অবস্থান করে না,

যে সব বীজ একবার স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর লাভ করিয়াছে তাহারাই বীজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির এই অব্যক্ত আধারে আশ্রয় লাভ করে। বিলোমে যখন সমস্ত সৃষ্টির বিলয় হয়, তখন সত্তোঃ প্রতি-বিম্বিত বীজগুলি আর অব্যক্ত-স্তরে গমন করে না। ইহারা তখন নিজেদের অস্তিত্ব হারায়।

যে সব মহাপুরুষ অনুভূতিতে পূর্ণ শিব-স্তরের সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহারা স্থূল শরীরে, সূক্ষ্ম শরীরে বা বীজ-শরীরে যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন ইঁহারাও সদ্য-প্রতিবিম্বিত বীজগুলির মত বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অভিমানের কেন্দ্র ভেদ হয় নাই, এমন লোক যদি বলেন যে তিনি মৃত্যুর পর একেবারেই থাকিবেন না (যেমন নাস্তিকবাদীরা বলেন) (সূক্ষ্ম শরীরেও) তাহা হইলে জানিতে হইবে তিনি মিথ্যা কথা বলিতে-ছেন, কারণ অভিমানের কেন্দ্র ভেদ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবমাত্রেরই এরূপ ধারণা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। জীবমাত্রই নিজের অন্তরে জানে "আমি চিরদিন আছি এবং চিরদিনই থাকিব", ইহার ব্যতিক্রম কখনও হইতে পারে না। পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্বকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রকৃতি নিজে লীলা করিয়া চলিয়াছেন, জীবন্মুক্তির দশায় সাধকমাত্রই ইহা জানিতে পারেন। পুরুষোত্তম যেমন এই সৃষ্টির কোন স্থানেই লিপ্ত নহেন, পুরুষোত্তমে যেমন অভিমান বলিয়া কোন বস্তু নাই, ঠিক তেমনি জীবন্মুক্তির দশায় সাধকমাত্রেই অভিমান বলিয়া কোন বস্তু থাকে না। তাঁহার দিক দিয়া যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। শরীরটা খসিয়া গেলে পৃথিবীর লোকমাত্র জানিবে "তিনি গেলেন", কিন্তু জীবন্মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন মানুষের অন্তরই একথা বলিতে বা ভাবিতে পারিবে না যে তিনি শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই মরিয়া যাইবেন। ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক কথা। জীব জীবন্মুক্তির স্তরেই থাকুন বা

জীব-দশায় থাকুন তাঁহার অন্তরাত্মা একথা প্রমাণ দিবে না যে তিনি থাকিবেন না। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ জানেন তাঁহার যাহা আসল সত্ত্বা তাহা চিরদিনই আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। অভিমানের বেড়াপাকে পড়িয়া তাঁহার জীবত্বের ভ্রান্তি হইয়াছিল, সেই ভ্রান্তির নেশাতেই তিনি জন্ম-মৃত্যুর পেষণে এতকাল নিষ্পেষিত হইতেছিলেন। এখন তাঁহার আর সে ভ্রান্তি নাই। যাঁহারা জীবত্বের দশায় আছেন তাঁহারা যদি বলেন শরীর গেলে তিনিও মিটিয়া যাইবেন, আর এই কথাই তাঁহার অন্তরের কথা—পাঠকগণ জানিয়া রাখুন ইহা কখনও হয় না। তিনি মুখে ঐ কথা বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ঐ কথা কিছুতেই মানিতে পারে না। ইহা একেবারে মনোবিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কথা। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাকথা বলিতেছেন।

"আমি থাকিব না বা ছিলাম না" একথার ঠিক ঠিক স্মরণ হওয়া মাত্র মানুষের হৃদয় মুশড়াইয়া যাইবে। ছোট ছোট বালক-বালিকা-গণকে নিদ্রা হইতে জাগার পর কাঁদিতে দেখা যায়, এই কান্নার কারণ পাঠকগণ বোধ হয় জানেন না। ইহার কারণ উহারা জাগিয়াই কোথায় ছিল, সে কথা বুঝিতে চেষ্টা করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ধারণা হয় যে উহারা ছিল না। এরূপ ধারণা আসিবার সঙ্গে উহাদের হৃদয়ের তন্তুতে ভীষণ আঁচড় লাগে; উহাতেই উহারা কাঁদিতে থাকে। "আমি ছিলাম না বা থাকিব না" একথা জীব যে মুহূর্তে ভাবিতে চেষ্টা করে তখনই তাহার হৃদয় কাটিয়া-ছিঁড়িয়া যায়। পাঠকগণ নিজের জীবনেও ইহার অনুভব করিতে পারিবেন। নিদ্রা হইতে জাগিয়াই কোন কোন দিন যদি ঠিক ঠিক প্রশ্ন জাগে "কোথা ছিলাম", আর যদি মনে হয়, "ছিলাম না"—তখনই দেখিবেন হৃদয়ের মধ্যে কি ভীষণ অবসাদ আসিয়া আপনাকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে।

যাহা হউক জীবের অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত হয় না। সৃষ্টিকালে কখনও বীজরূপে, কখনও সূক্ষ্মরূপে, কখনও স্থূল শরীরে অবস্থান হয়; আবার মহাপ্রলয়ে বীজাকারে অব্যক্ত আধারে নিমজ্জিত থাকে। আবার পুনরায় সৃষ্টির সময় অব্যক্ত হইতে মহতের মধ্য দিয়া বীজ-জগতে আসিয়া থাকে। (অব্যক্ত-জগতে যত বীজ আছে সকলেই যে একেবারে বীজ-জগতে চলিয়া আসিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। অব্যক্ত-জগতে যত বীজ আছে তাহার অতি সামান্য অংশ মাত্র বীজ-জগতে আসিয়া থাকে)। অব্যক্তস্থিত বীজ যেমন মহতের কোল হইয়াই বীজ-জগতে আসে তেমনই পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্ব বীজও মহতের কোলের মধ্য দিয়াই বীজ জগতে আসিয়া থাকে।

'ং' জ্ঞানশক্তি। এই শক্তি জীবকে জীবের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়া দেয়। সাতটি শক্তির মধ্যে শুধু এই শক্তিই জীবকে নিজের প্রকৃতিকে জানাইয়া দিয়া মুক্ত করিয়া দেয়। জ্ঞান + ইচ্ছাশক্তিতেই (মহত্তত্ত্বে) পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব-বীজ হয়। জ্ঞান-শক্তি স্ফটিকবর্ণ শক্তিকণা। এই শক্তির গতি এরূপ যে ইহা সৃষ্টিকে শুদ্ধ করিয়া দিতে চায়।

'উ' শান্তিশক্তি। এই শক্তির আশ্রয়েই সৃষ্টিকালে জীবের বীজ রক্ষিত থাকে। বীজকে অঙ্কে ধারণ করাই ইহার কাজ। ইহা শুভ্রবর্ণ শক্তিকণা; ইহা স্থৈর্য্য শক্তিদানকারিণী কণা। ইহার কোন দিকেই বেগ নাই। যোগিগণে এই কণাশক্তির বিশেষ বিকাশ থাকে। এই কণা যেখানে বেশী সংগঠিত সেখানেই মানুষ আত্মসমর্পণ করিয়া বেশী শান্তিলাভ করিয়া থাকে। গুরুর নিকট হইতে শিষ্য এই কণাই আহরণ করিতে চায়। গুরু যখন আর দিতে পারেন না তখন শিষ্য আর অধীন থাকিতে চান না। এই শক্তিকণার আবেশ না থাকিলে গুরুগিরি করা চলে না। এই কণাশক্তি মানুষকে দীর্ঘজীবি করে।

'ই' ত্যাগ-শক্তি। ইহা ধূম্রবর্ণ কণা ; ইহা জীবকে উন্নত-বিকাশে অগ্রসর করিয়া দিতে বেগ প্রদান করে। ইহা বিকাশমুখী গতিসম্পন্ন শক্তিকণা। ইহা সৃষ্টি-বিরোধী শক্তি-বেগ প্রদান করে। ইহা ত্যাগ-প্রধান মনোবৃত্তি প্রস্তুত করে। এই শক্তির সংগঠন যাহার মধ্যে যত বেশী সে যুবকদের তত বেশী প্রিয় হয়। ইহা জীবকে সহিষ্ণু ও দৃঢ় করে। খুব অল্প অবলম্বনের মধ্যে বৃহৎ কর্ম্ম করিবার শক্তি ইহা হইতে মানুষ লাভ করে।

'অ' ইচ্ছা-শক্তি। এই শক্তি সৃষ্টিকে প্রকাশ করে। ইহা সৃষ্টিমুখী বেগদায়িনী শক্তি-কণা। ইহা অরুণবর্ণ শক্তি-কণা। এই শক্তি সৃষ্ট বস্তুতে আকার দান করে। 'ই' শক্তি 'অ' শক্তির কাজকে ছাঁটিতে কাটিতে চায়, 'অ' এবং 'ই' বিপরীত কার্য্যকারিণী শক্তি।

'৯' প্রাণশক্তি। ইহা বহু জড়কণাকে জড় করিয়া রাখিতে চায়। ইহার কাজ হইল জড়িত বা একত্রিত করিয়া লওয়া। ইহা অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং যুদ্ধপ্রিয়-কণা। ইহা কোন দিকেই বেগ দেয় না। পঞ্চ-মহাভূতের কণারাশি একত্র করিয়া লইয়া—এই শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং আমাদের এই শরীরটা গড়িয়া চলিয়াছে। প্রাণশক্তি অন্ধের মত কেবল গড়িতেই থাকে। 'অ' শক্তি সেই গড়াটার উপর আকার দেয়। 'ই' শক্তি ছাঁটিয়া কাটিয়া আকারটাকে বিকাশের অনুকূল করিয়া দিতে চেষ্টা করে।

'অ' কার সৃষ্টিমুখী বেগ দেয়। ৮ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদের শরীরে এই শক্তি-কণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহার সৌন্দর্য্যে মেয়েদের উপর ছেলেদের আকর্ষণ হয়। সেই শক্তিকণাগুলিকে ভোগ করিবার জন্য পুরুষের মন ধাবিত হয়। স্ত্রীর শরীরে পুরুষ এই শক্তিকণা আহরণ করিতে যাইয়াই ভোগে বদ্ধ হয় এবং সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। যাহারা খুব স্নেহশীলা তাহাদের শরীরে এই শক্তিকণা

বহুদিন বর্ত্তমান থাকে। তাহাদের সৌন্দর্য্যও যায় না। স্ত্রীর শরীরে যত বেশী স্নেহের বিকাশ থাকিবে পুরুষ ততই তাহার অধীন থাকিবে।

যৌবনকালে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই স্বভাবতঃ 'ই' শক্তি বৃদ্ধি হয়। 'ই' শক্তি হইতে সংযম আসিয়া থাকে। যৌবনকালে স্ত্রীতে যেমন 'অ' শক্তি বৃদ্ধি হয় সেইরূপ পুরুষেও যৌবনকালে 'ঃ' শক্তি (কর্ত্তৃত্ব-শক্তি) বৃদ্ধি হয়। ইহা কেবল সৃষ্টিলীলাকে স্থায়ী রাখিবার জন্য হইয়া থাকে। যৌবনকালে পুরুষে 'ঃ' শক্তি এবং স্ত্রীতে 'অ' শক্তি বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের 'ই' শক্তিও বৃদ্ধি হয়; কাজেই প্রকৃতি সে সময় উভয়কেই প্রচুর সংযম-শক্তিও প্রদান করিয়া থাকে, কাজেই উচ্ছৃঙ্খল হইবার কোন ইসারা প্রকৃতির ইচ্ছা নহে, ইহা বুঝা যায়।

'ঋ' কার কর্ম্মশক্তি। ইহা অগ্নিবর্ণ-কণা। প্রাণশক্তির কাজ জড় করা, ইহার কাজ ছিৎরাইয়া দেওয়া। '৯' এবং ঋ' বিপরীত কার্য্যকারিণী শক্তি। 'ঋ' জীবনীশক্তি ক্ষীণ করে।

'ঋ' শক্তিই অগ্নিরূপে জীবশরীরে বিদ্যমান। এই শক্তিই আমাদের মধ্যে ক্ষুধারূপে অবস্থিত। অন্নকে পরিপাক করিয়া এই শক্তি অন্নকে রূপান্তরিত করে। প্রাণ এই রূপান্তরিত অন্নকণাকে নিজের কাজে লাগাইয়া লয়; ইহাতেই আমাদের শরীর প্রস্তুত হয়। শরীরের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিকণা নিজ নিজ কাজ স্বভাবতঃই ঠিক মত করিয়া চলিয়াছে। কাহারও মুখের দিকে কেহ তাকায় না, ভাঙ্গা-গড়া যাহার যেমন কাজ সে তেমন নিজের শক্তি অনুসারে করিয়া চলিয়াছে। অথচ শরীর-যন্ত্রের কাজটী ঠিক মতই চলিয়াছে। অগ্নিকণা প্রাণের দ্বারা একত্রিত কণাগুলিকে প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বংশ করিয়া দিতেছে। প্রাণ-কার্য্যকে এই অগ্নিকণা যেন দাবিয়া মারিয়া ফেলিতে চায়। অগ্নি

নিত্য নূতন চায়, নচেৎ ইহার অস্তিত্ব রক্ষা হয় না। তাই জীবের ক্ষুধারূপে অগ্নি জীবকে তাড়না করে। জীব ক্ষুধা-তৃষ্ণা তৃপ্তির জন্য যাহা আহুতি দেয় অগ্নি তাহাকে গ্রাস করিতে যাইয়া ছোট ছোট কণায় ভাঙ্গিয়া চূরিয়া দেয়। প্রাণ আবার ঐ কণাকে আহরণ করিয়া জীবের শরীরের যেখানে যেমন প্রয়োজন গড়িতে থাকে। অগ্নি এবং প্রাণের এই কার্য্যধারা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এসব শক্তিস্তরের কথা। বিস্তারিত আলোচনা করিবার সুযোগ আমাদের হইবে না।

দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তিপূজাতে অষ্ট-শক্তির পূজা হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি অষ্ট-শক্তিকে পূজাতে 'আ ঈ' ইত্যাদির প্রতিভূ করা হইয়াছে। 'আ' ব্রহ্মাণী। ইহা সৃষ্টিকারিণী শক্তি। আমরা হ্রস্ব স্বরগুলিকে লইয়াই শক্তি বিচার করিয়াছি। পূজাদিতে দীর্ঘস্বরগুলিকে 'শক্তি' এবং হ্রস্ব স্বরগুলিকে সেই শক্তির 'ভৈরব'-রূপে পূজার ব্যবস্থা আছে। ইহা লইয়া আমাদের বেশী মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। ইহা একই শক্তির পুরুষ-প্রকৃতি ভেদ মাত্র। কোন শক্তিকণারই পুরুষ-প্রকৃতি মিলনেই ঐ শক্তির কাজ হয়। কোন-শক্তিকণাই যখন প্রকৃত কর্ম্মশক্তিরূপে পরিণত হয় তখন উহার পুরুষ প্রকৃতি মানিতেই হইবে। তাহা না হইলে শক্তিবেগ আসা এবং যাওয়া সিদ্ধ হয় না। 'ঈ' বৈষ্ণবী ; ইনি পূজা-পদ্ধতির বিচারে পালনী-শক্তি। আমাদের বিচারে 'ঈং'-এর সহিত ইহার পার্থক্য আছে। আমরা 'ই'-কারকে ধূম্রবর্ণা শুষ্ককণারূপে স্থান দিয়াছি। আমাদের 'ই'-কারে এবং এই 'ঈ'-কারে পার্থক্য আছে। পাঠকগণ শুধু বুঝিয়া লইবেন। এ সব লইয়া তর্ক করা ঠিক হইবে না। 'ঊ' মাহেশ্বরী। আমাদের দেওয়া নির্দ্দেশের সহিত ইহার অমিল নাই। মাহেশ্বরী অর্থে ধর্ম্মশক্তি বা শিবাণী। 'ঋ' চামুণ্ডা ; চামুণ্ডা অর্থে অসুর নিধনে অত্যন্ত কর্ম্মশক্তির বেগ বুঝায়। আমাদের সঙ্গে ইহারও

অমিল নাই। ‘৯’ কৌমারী; কৌমারী অর্থে ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্মচর্য্যই প্রাণের শক্তি। বালিকারা পরিশ্রমকাতরা হয় না, খাটাইতে পারিলে খুব খাটিতে পারে। প্রাণকেন্দ্রের কোন স্বাধীন বিচার শক্তি নাই। ইহা মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের অধীন হইয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কেবল খাটিয়াই চলিয়াছে। অন্ধের মত নির্ব্বিচারে খাটিয়া যাওয়া প্রাণশক্তিরই কাজ। আমাদের দেওয়া নির্দ্দেশের সঙ্গে ইহারও অমিল নাই। ‘ঐ’ অপরাজিতা; ইহা একারের দীর্ঘস্বর, এ, ঐ, ও এবং ঔ সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি নাই, কারণ ইহারা মৌলিক ধ্বনি নহে; ইহারা মিশ্র ধ্বনি। যাহা হউক ঐ কারে অ+ই আছে। ‘অ কার কোমল হৃদয়, ‘ই’ কঠোর। অপরাজিতার স্তোত্রে (চণ্ডী দেখুন) দেবীকে কোমল হৃদয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কঠোর হৃদয় বলিয়া বর্ণনা করা আছে। “ও” বারাহী; বারাহী অর্থে পৃথিবীকে দাঁতে চিরিয়া ওলট-পালট করিতে পারে এরূপ শক্তি। ইহাও আমাদের বিজ্ঞানে মিলিবে না। ও কারে অ+উ আছে। ‘অ’ কোমল হৃদয়, ‘উ’ শক্তি। ইহা দৈবী সম্পদ-সম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্র পুষ্ট চরিত্র-লক্ষণ। শ্রীরামচন্দ্র এরূপ প্রকৃতির ছিলেন। ‘ঃ’ নারসিংহী; ইহা পুরুষ-সিংহেরই (স্ত্রী) নামান্তর। ধ্যানে পুরুষসিংহের কথা আছে, ‘ঃ’ পূর্ণশক্তির বিকাশ; ইহা আমাদের দেওয়া বিজ্ঞানে মিলিবে। পূজা-পদ্ধতিতে ‘অং’ কারের স্থান নাই। ইহাকে ‘অঃ’ কারের হ্রস্ব স্বরের স্থানে রাখা হইয়াছে। ‘অং অঃ, একই স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ নহে। আমরা অনুভূতির ভিত্তি ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। শাস্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এসব কথা বলা হইল। কেহ যেন শাস্ত্রবিধির উপর হস্তক্ষেপ করেন না। আমরা কর্ম্ম বিজ্ঞান বুঝিতে চাই সাধনার দ্বারা শক্তিশালী হইতে চাই, সাধক এবং কর্ম্মিগণ জানিয়া রাখুন মূল শক্তিতে যে সব শক্তির

সমাবেশ আছে, যাহা হইতে সৃষ্টির বিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, ঐ সব শক্তির সব উপাদানই জীবের মধ্যে আছে। ঐ সব শক্তি বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট ইসারা ইঙ্গিত দেওয়া হইল। আমরা খুব সংক্ষেপে এ সবের আলোচনা করিলাম; পাঠকগণ নিশ্চয় চিন্তাশীল হইয়া ইহার আলোচনা করিবেন।

শক্তিতত্ত্ব বিচার-বিতর্কে বুঝাইয়া দেওয়া খুব কঠিন। চণ্ডীতে শক্তি-তত্ত্বকে লীলারূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনে দার্শনিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া শক্তি-তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দার্শনিকগণের কথার মারপ্যাচে পড়িলে ইহার কোন কথাই বুঝা যাইবে না। বেদান্তদর্শন শক্তিস্তরের শেষ প্রান্তের দর্শন; উহা দুইটা কথা দিয়া বুঝান যাইবে না। বেদান্তবাদ বুঝিবার পূর্ব্বে শক্তিবাদ বুঝা প্রয়োজন। যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করিলেও বেদান্তের আভাষ পাইবেন। বেদান্তবাদী-দের টীকা কেবল অন্যান্য দর্শনকে কাটিয়া ছাঁটিয়া বেদান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। বেদান্তের আসল মূল কথা হইল "প্রথম তিনটি সূত্রের মধ্য", বেদান্তের সর্ব্বপ্রধান প্রচারক আচার্য্য শঙ্কর একজন বিরাট কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃত শক্তিশালীই (কর্ম্মবাদীই) বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী। চণ্ডীর লীলাকথা শক্তিবাদী কর্ম্মীদিগকে বিশেষ সাহায্য করিবে। গীতা, চণ্ডী ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ একই স্তরের আদর্শের উপর স্থাপিত। চণ্ডীর লীলাকথা, কর্ম্মযোগীর দিগদর্শন—ইহার ভাষা এবং মন্ত্রমাধুর্য্য সাধকগণের সাধনশক্তি উদ্দীপক। এমন মধুর এবং সাধন-শক্তিদায়ী গ্রন্থ আর নাই বলিলেই চলে। শক্তিবাদীগণ এই লীলাপ্রসঙ্গে কর্ম্মের যে ধারা পাইবে ইহাদ্বারা কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ কাজ দিবে।

চণ্ডীর তিনটি রূপ আছে। এই তিনরূপে তেরটি অধ্যায় আছে।

প্রথম রূপে একটি অধ্যায়, দ্বিতীয় রূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় অবহিত। পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত তৃতীয় রূপের অন্তর্গত।

চণ্ডীর প্রথম রূপের সংক্ষেপ কথা—ব্রহ্মা চণ্ডীর স্তুতি করিয়া বিষ্ণুকে জাগাইয়া দিলেন। বিষ্ণু জাগিয়া মধু এবং কৈটভকে বধ করিলেন। ব্রহ্মা এখানে সূর্য্যস্তরের কর্ম্মশক্তি, মধু-কৈটভ ব্রহ্মাকে (এখানে শিক্ষাবিভাগকে) গিলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু জাগিয়া ব্রহ্মাকে রক্ষা করিলেন। অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগ অসুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। আসুরিক শক্তির কর্ম্মবৈশিষ্ট্যের ইহা একটা দিক। 'মধু' এবং 'কটু' অর্থাৎ মিষ্ট এবং তিক্ত ভাব আনিয়া প্রথমে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করাইতে হয়, আমাদের সভ্যতার সমস্ত উপাদানই মধু আর তোমাদের সভ্যতার সমস্ত উপাদানই কটু (তিক্ত)। এই ভাব শিক্ষাশক্তিকে বিষাক্ত করিয়া দিলে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। সমাজ (বিষ্ণু) যতদিন জাগিবে না ততদিন ইহার প্রতিকার নাই। শিক্ষাবিভাগ নিজে কখনও অস্ত্র ধারণ করে না; ইহার কাজ সমাজকে জাগাইয়া দেওয়া। শিক্ষাবিভাগ সমাজকে না জাগাইয়া যদি 'মধু-কটুর' সহিত কথা কাটাকাটি করে তবে ইহার ফল ভাল হইবে না। প্রচারের ইহাই মূল বিজ্ঞান।

চণ্ডীর দ্বিতীয় রূপের প্রধান বিষয় সংগঠন। চণ্ডীর প্রথম রূপের উদ্বোদ্ধা 'ব্রহ্মা' (শিক্ষক)। দ্বিতীয় রূপের প্রধান কর্ত্তা বিষ্ণু (সমাজ-কর্ত্তা)। ব্রহ্মা এখানেও আছেন, কিন্তু প্রধানকর্ত্তা বিষ্ণু। দেবতাদের (দৈবী-সম্পদ-সম্পন্ন কর্ম্মীই দেবতা) উপর পীড়নে ইনি ব্যথিত হন। কি করা প্রয়োজন ইহা স্থির করিবার জন্য বিষ্ণু শিবের নিকট গমন করিলেন। শিব অর্থে 'ভোগ, মোহ এবং অভিমানের পরপারস্থিত জ্ঞানী মহাপুরুষ'। শিব সমাজের জ্ঞানশক্তি।

ছুইটা লেক্‌চার দিতে পারেন বা ছুই পাতা প্রবন্ধ লিখিয়া দেশ-বিদেশে নাম অর্জ্জন করিয়াছেন এমন লোককে কেহ যেন জ্ঞানী না মনে করেন। ইহা শিক্ষাবিভাগ; জ্ঞান-বিভাগ নহে। শিব, বিষ্ণু-প্রমুখ দেবতাদের উপর আসুরিক শক্তির পীড়নের মর্ম্মস্পর্শী করুণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন। শুনিতেই শিবের অন্তরে তেজের সঞ্চার হইল (অন্যায় অত্যাচার হইতে থাকিলে জ্ঞানীদেরও সমাধি ভঙ্গ হয়), তাঁহার চক্ষুর মধ্য হইতে এক প্রকাণ্ড জ্যোতি বাহির হইয়া আসিল; সেই জ্যোতির সঙ্গে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের জ্যোতিও আসিয়া মিলিত হইল। সেই জ্যোতি পর্ব্বত পরিমিত হইয়া উঠিল এবং সেই জ্যোতির সমষ্টিতে এক শক্তি-মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। শিব, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাগণ ঐ শক্তিকে নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সজ্জা দান করিলেন।

একটা প্রপীড়িত সমাজ কিরূপে সংগঠিত হইয়া একই বিরাট শক্তিরূপে পরিণত হয় ইহাতে তাহারই বিজ্ঞান দেওয়া হইয়াছে। প্রথম চরিত্রে ব্রহ্মা মধু-কৈটভের সহিত যুদ্ধ করিতে যান নাই; তিনি বিষ্ণুকে (সমাজকে) জাগাইয়া দিয়াছিলেন। এখানে পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে কোন পরাধীন ও প্রপীড়িত জাতির শিক্ষাবিভাগই রাজশক্তির চালের সহিত পাল্লা দিতে পারে না। শিক্ষাবিভাগ সব সময় রাজশক্তির অধীন। শিক্ষাবিভাগে যাঁহারা উন্নত সম্মানে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদিগকে চতুর রাজশক্তি অর্থ ও যশদানে বশ করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহেন। কিন্তু যিনি ব্রহ্মার মত চতুর তিনি সমাজকে সজাগ করিয়া নীরব হন।

এই সংগঠন-অধ্যায়ে বিষ্ণুর কার্য্যাবলীও ভাবিবার কথা। বিষ্ণু (সমাজকর্ত্তা) নিজে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি শিবের নিকট গমন করিলেন। শিবের (ধর্ম্ম-গুরুর) শক্তিতে তিনি

এবং অন্যান্য দেবতাগণ নিজেদের শক্তি দান করিলেন। সেই সংগঠিত শক্তির সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল।

যখনই কোন সংগঠিত শক্তির সম্মুখীন হইতে হয় তখন কর্ম্মের একটা বিজ্ঞান স্থির করিয়া সেই বিজ্ঞানে সমাজের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয়। কর্ম্মসম্বন্ধে বহু দূর ভাবিয়া একটা বিজ্ঞান দেওয়াই শিবের জ্যোতি। সেই বিজ্ঞানটাকে খুব ভাবিয়া বুঝিয়া উহাতে বিষ্ণু (সমাজকর্ত্তা) ও অন্যান্য দেবশক্তি মিলিত হইলেই প্রকৃত শক্তি প্রস্তুত হয়।

মানুষের কর্ম্মনীতি যখন বিকাশ-বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া ইহসর্ব্বস্ব হয়, তখন একদল মানুষ সমাজে উৎপন্ন হইয়া প্রকাশ্য ভোগ অবলম্বন করে এবং ভোগকে স্থায়ী রাখিবার জন্য এমন নিয়ম প্রস্তুত করিয়া লয় যাহাতে অন্যের উপর দিনের পর দিন কেবল দুঃখের বোঝাই বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাই আসুরিক অত্যাচার। এই অত্যাচারের প্রতিকার জন্য মানুষ নূতন কর্ম্ম-বিজ্ঞানে প্রস্তুত হইতে বাধ্য হয়, যুগ যুগান্তর ধরিয়াই মানবসমাজে এই অত্যাচার-লীলা চলিয়াছে—আবার ইহার প্রতিকারের জন্য নূতনভাবে কর্ম্মশক্তির উদ্বোধন হইয়া চলিয়াছে। মানুষের জ্ঞানশক্তিই এই যুগান্তরের পুরোহিত। সেই অত্যাচারের সময় কোন বহুদর্শী চিন্তাশীল মহাপুরুষ সমাজের সামনে নূতন এক কর্ম্মবিজ্ঞান দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। সমাজ সেই বিজ্ঞানে চালিয়া যাইয়া আসুরিক অত্যাচারের প্রতিকার করিয়া লইয়াছে। জ্ঞানী যত দূরদর্শী হন তাঁহার নির্দ্দেশে সমাজ তত বেশীদিন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে। জ্ঞানীর দূরদর্শিতা কম থাকিলে সমাজের উপর এই অত্যাচার একটা নিত্যকর্ম্মে দাঁড়ায়। কারণ এই প্রকার আসুরিকতার মূলোচ্ছেদ করিতে যাইয়া জ্ঞানীদের দূরদর্শিতার অভাবে আর একটা আসুরিক মতই দাঁড়াইয়া যায়।

চণ্ডীর তৃতীয় রূপের ভিত্তিতে আর কোন নূতন কর্ম্মভিত্তি দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় লীলার সংগঠনবিজ্ঞানের উপরেই এই যুদ্ধলীলা অঙ্কিত আছে। সেই চণ্ডী আবির্ভূত হইয়া তৃতীয় রূপের সমস্ত যুদ্ধলীলা শেষ করেন। এই তৃতীয় লীলার যুদ্ধব্যাপারে শেষ শুম্ভ-বধ। এই যুদ্ধব্যাপারে শক্তিস্তরের সমস্ত উপাদান স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির অন্তর্ভূত কর্ম্ম এবং যুদ্ধলীলা কত সুন্দর এবং কত গভীর ইহা দু'কথায় লিখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। স্থূল শরীরস্থিত রক্তমাংস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় (শক্তিস্তর) কোষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই যুদ্ধলীলা প্রকটিত। যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই স্থিতি। যুদ্ধই প্রাণ, যুদ্ধই বহিঃ, যুদ্ধই অন্তঃ এবং যুদ্ধই সব। ইহা চণ্ডীলীলার মর্ম্মকথা! শরীরতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, বিকাশতত্ত্ব, যে কোন স্তরের তত্ত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা কর না কেন সকল স্থানেই সকল ক্ষেত্রেই একই যুদ্ধলীলা দেখিতে পাইবে। সর্ব্বত্র একদল আসুরিক আদর্শ লইয়া ক্ষেত্রকে কলুষিত ও ধ্বংস করিতেছে। অন্য একদল ইহার প্রতিকার করার জন্য যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। একদলে বিকাশ-বিরুদ্ধ শক্তি অন্যদলে বিকাশ-অনুকূল শক্তি জাগ্রত থাকিয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধলীলা চালাইয়া চলিয়াছে, তুমি চণ্ডী পাঠ কর, তোমার চক্ষু খুলিয়া যাইবে।

শুম্ভ-বধের পূর্ব্বক্ষণে শুম্ভের সমস্ত সৈন্য শেষ হইয়া গিয়াছে। একদিকে শুম্ভ একা, অন্যদিকে চণ্ডীর সঙ্গে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী আদি অষ্ট শক্তি থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। একা শুম্ভ একদিকে, অন্যদিকে অষ্ট শক্তি সহ মূলশক্তি। উল্লাসের সহিত চণ্ডী ও অষ্টশক্তি যুদ্ধ করিতেছেন। শুম্ভ দেবীকে বলিলেন "তুমি আটজন সহ যুদ্ধ করিতেছ, আর আমি একা; তুমি একা হইয়া আইস, দুজনে যুদ্ধ করি।" একথা শুনিয়া চণ্ডী বলিলেন "আমি একা নইত আমার আবার দ্বিতীয়

(পাঠকগণ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বুঝুন) কে আছে।" এই কথা বলিবামাত্র ঐ অষ্ট শক্তি চণ্ডীর শরীরে প্রবেশ করিলেন। দেবী বলিলেন "এবার দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।" শুম্ভ বধ হইয়া গেলেন।

যে শক্তি একদিন শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের শক্তিসমষ্টি হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, মূলতঃ সেই শক্তি যে কে তাহা শুম্ভ বধে প্রকটিত হইয়া গেল। আমার, তোমার ও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কোন জীবের যে তেজ, যে কর্ম্ম ও যে জ্ঞানশক্তি ইহাদের সকলেরই মূলে যে ঐ অষ্ট শক্তি (আমরা ইহাকে সপ্ত শক্তি বলিয়াছি) বিদ্যমান, আর ঐ অষ্ট শক্তিই যে একই শক্তির আশ্রয়ে অবস্থিত তাহা চণ্ডীর তৃতীয় রূপে প্রকটিত হইয়া গেল। পাঠকগণ এবার সমস্ত মন্ত্র-শক্তি অধ্যায় পাঠ করিয়া যদি তাহা অনুধাবন করিতে পারেন তবে বেদান্ত-দর্শনের যে মূল কোথায় তাহা বুঝিতে পারিবে।

সমস্তগুলি শক্তিকণাই একই মূলশক্তিতে নিহিত আছে। যাঁহারা বিকাশের পথে এ স্তরে আসেন নাই তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই যে মূলশক্তিকণা ইহাও দৃশ্যকণা, ইহারও গতি আছে কিন্তু ধ্বনি নাই। কণাগুলি হইতে রশ্মি বিকীরণ হয় না, তেজঃশক্তি কণাগুলির মধ্যেই নিহিত। ইহা কোথায় আছে খুঁজিবার চেষ্টা হইবামাত্র সাধক এই স্তর হইতে নামিয়া আসিবেন। (ইহা সর্ব্বত্র আছে, কিন্তু শক্তিস্তর ভিন্ন অন্য কোন স্তরে ইহার অনুভূতি হইবে না)। এই কণা দৃশ্যকণা ; ইহার দ্রষ্টা কে এরূপ প্রশ্ন সাধকের হওয়াই স্বাভাবিক। কণার দ্রষ্টা কে একথা তখনই স্থির হইবে, তখন কণাটির গতি স্তব্ধ হইয়া যাইবার পূর্ব্বাবস্থায় আসিবে, এরূপ অবস্থায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ স্থির হইয়া যাইবে—দৃশ্য বলিয়া কোন পদার্থ কোন যুগেই ছিল না। দৃশ্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহার দ্রষ্টাও এই কণাটি নিজেই, যতক্ষণ কণাটী গতি-

বিশিষ্ট, ততক্ষণ ইহাকে আমরা শক্তিকণা নাম দিব। যতক্ষণ কণাটি গতিবিশিষ্ট ততক্ষণ ইহা দৃশ্যকণা। যখন ইহা স্থির হইবার পূর্ব্বাবস্থায় আসে, তখন ইহা স্পষ্ট স্থির হইয়া যায় যে কণাটি নিজেই দ্রষ্টা, কাজেই আমরা এই কণাকে চিৎকণা বা চিৎঅণুও নাম দিতে পারি।

কণাটী গতিবিশিষ্ট, তাই সৃষ্টি চলিয়াছে। তাই বেদান্তদর্শনে বলা হইয়াছে "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। সৃষ্টির সমস্ত উপাদান ঐ কণাতে রহিয়াছে। কণাটী যখন স্থির হইবার পূর্ব্বাবস্থায় আসে তখন ইহা স্পষ্ট হইয়া যাইবে। "সৃষ্টি কোন যুগেই হয় নাই।" দৃশ্য বলিয়াই কোন বস্তুই নাই। যাঁহারা বিস্তারিত বুঝিতে চাহেন তাঁহারা বেদান্ত-দর্শনের শঙ্কর-ভাষ্য পাঠ করুন। তিনি কেন যে বেদান্তদর্শনের ওরূপ "জগৎ-মিথ্যা" ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিবেন।

তান্ত্রিক সাধক পূর্ণাভিষেক দীক্ষায় যে ব্রহ্মমন্ত্রের দীক্ষা পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্গে এই সৎকণা ও চিদ্-অণুতত্ত্বের সহিত মিলাইয়া লইবেন। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের সেই ব্রহ্মমন্ত্রটী "সচ্চিদেকং ব্রহ্মং" অর্থাৎ " 'সৎ' এবং 'চিৎ' এক ব্রহ্ম"। মিলাইয়া দেখুন গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য, ঋষিবাক্য এবং আপনার অনুভূতি এক কিনা।

আবার তুমি দেখ, তুমি তোমার বাল্যকালে প্রথম বিদ্যারম্ভের সময় তোমার গুরুমহাশয় তোমার জ্ঞান-উন্মেষের প্রথম শিক্ষায় শিখাইয়াছিলেন "অ, আ, ই, ইত্যাদি। জ্ঞানের আরম্ভে যাহা পাইয়াছিলে, যাহার সাহায্যে তুমি জীবনভর জ্ঞান, বিজ্ঞান, রীতি, নীতি, এবং কত কি শিক্ষা করিয়াছিলে, দীক্ষার সময় গুরুদেব সেই বীজ মন্ত্রেরই শক্তি তোমার অন্তরে জাগাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে জ্ঞানের শেষ প্রান্তে এবং পরে তাহারও পরপারে অর্থাৎ বেদান্তের কোলে (বেদ= জ্ঞান; জ্ঞান যেখানে শেষ হইয়া গিয়াছে সেই কোলে) আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। আজ দেখ! আরম্ভে যাহা শেষে তাহাই বিদ্যমান

কিনা! যিনি সমস্ত সৃষ্টির উপাদানমূলক অনাদিশক্তি বা 'সৎ' তিনিই সৃষ্টির পরপারস্থিত চিৎ-অনু। যিনি সৃষ্টির উপাদানমূলক সপ্ত শক্তির সমষ্টি তিনিই সেই শক্তিকে জানিবার উপাদানরূপে ধ্বনির আকারে (অ, আ, ই রূপে) আমাদের কণ্ঠে বাজিয়া উঠিতেছে। ইহার সহিত বেদান্তের তৃতীয় সূত্র "শাস্ত্রযোনীত্বাৎ" মিলাও।

এখন দেখা যাইতেছে "শক্তিই চিৎ"। আবার এই শক্তিই আনন্দ-ময় কোষ, মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও অন্নময় কোষরূপে পরিণত হইয়াছে। এখন আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু চৈতন্যে গড়া। সৃষ্টির প্রতি অণু পরমাণু সৎ কণার পরিণতি! সৎকণাই চিদ্-অণু। তাই ঋষি আনন্দে গাহিয়াছিলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

যতক্ষণ তুমি শক্তিস্তরের শেষ প্রান্তে আসিতে পারিবে না ততক্ষণ এই কথা কথামাত্রই থাকিবে। এই সত্য যাহারা বুঝিতে চাও, তাহাদিগকে শক্তিস্তরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব যে কোন স্তরের অনুভূতি আসিলেই তোমার সাধনা শেষ হইয়া যায় নাই। যদিও তোমার মনে হইবে যে তোমার বেদান্ত বুঝা হইয়া গিয়াছে। শক্তিস্তরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুমি শূন্য-বোধ, ভাব-বোধ (লীলা-বোধ), সুখ-বোধ, শান্তি-বোধ এবং পূর্ণ-বোধ স্তরে আসিবে মাত্র। কিন্তু ঠিক ঠিক বেদান্ত বুঝা তোমার কোন স্তরেই হইবে না। যদি কোনদিন শক্তিস্তরে আসিয়া দাঁড়াইতে পার, তবেই বুঝিবে বেদান্তের ভিত্তি কোথায়।

শক্তিস্তরের পতাকাটা কিরূপ হইবে ইহা জানিবার জন্য হয়ত কর্ম্মিগণ উৎসুক হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের জন্য এ কথা বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন শক্তির পতাকা 'রক্তবর্ণ এবং অসি-চিহ্নিত'। যুদ্ধই শক্তিস্বরূপ, ইহাই রক্তবর্ণের মর্ম্মকথা। অসি ঐ শক্তির অস্ত্র। বিকাশের

পথকে রুদ্ধ করিবার জন্ত যাহারা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া—নিজেদের ভোগের ব্যবস্থায় তৎপর এমন যে নিষ্ঠুর মানুষ সেই অসুর। সেই অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধই শক্তি। অসি সেই যুদ্ধেরই ইঙ্গিত। চণ্ডীর একাদশ মাহাত্ম্যে অষ্টবিংশ শ্লোকে উল্লেখ আছে—অসুরাসৃগ্ বসাপঙ্ক চর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ। শুভায় খড়্গো ভবতু—চণ্ডিকে ত্বাম্ নতা বয়ম্॥ (দেবতাগণ চণ্ডী-স্তোত্রে বলিতেছেন) "হে চণ্ডিকে! অসুরদের রক্তবসাপঙ্কচর্চ্চিত দীপ্তিশালী খড়্গ আমাদের মঙ্গলের কারণ হউক্, আমরা আপনাকে প্রণাম করিতেছি।" আমরা বিস্তারিত আর কিছু বলিতে চাহি না। যুগ যুগান্তর ধরিয়া অসুরের রক্তবসারূপকর্দ্দমে শক্তির খড়্গ চর্চ্চিত হইতে থাকুক, তাহা হইলেই পৃথিবীতে মানুষের আত্মবিকাশের পথ চির-মুক্ত থাকিবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।